মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র

মুনতাসীর মামুন

মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ দুই ॥ ❑ মুনতাসীর মামুন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১। প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক
সুবর্ণ ১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (দোতলা) ঢাকা ১০০০
কম্পোজ : মঞ্জুরী কম্পিউটারস ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

বিক্রয় কেন্দ্র : সুবর্ণ ❑ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তলা)। রুম নং ২৩৫।
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984 70297 0049 5

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

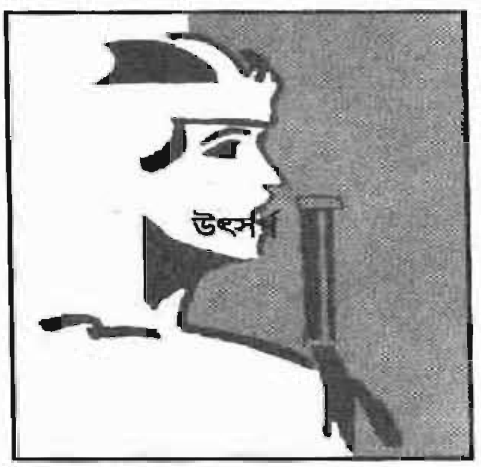

অধ্যাপক শামসুল হুদা
ও
মোরশেদা বাহার জুলিয়া

মুক্তিযোদ্ধা দম্পতিকে
চট্টগ্রাম ও নিউ অর্লিয়েন্সের দিনগুলির স্মরণে

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

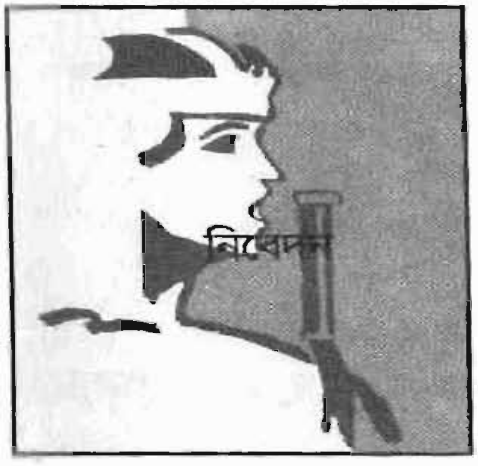

গত বছর ১৪টি প্রবন্ধ ও একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ এক*। এ বছর তারই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ দুই*। বর্তমান সংকলনে আছে ১৮টি প্রবন্ধ ও একটি সাক্ষাৎকার। এগুলি নেয়া হয়েছে আমার প্রকাশিত বই *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* [সহ লেখক জয়ন্তকুমার রায়], *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, ইয়াহিয়া খানের মুক্তিযুদ্ধ* এবং *যে সব হত্যার বিচার হয়নি* থেকে। উল্লেখ্য, *ইয়াহিয়া খানের মুক্তিযুদ্ধ* এবং *যে সব হত্যার বিচার হয়নি* গ্রন্থ দু'টির পুনঃ সংস্করণের সম্ভাবনা নেই। সংকলিত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯৯৫ থেকে ২০১০। স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু প্রবন্ধে ঘটনার/তথ্যের পুনরাবৃত্তি আছে। কোন কোন প্রবন্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যই সেই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল। এখানেও প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধায় তা আর বাদ দেয়া হয়নি।

আমার চার যুগের পুরনো বন্ধু আহমেদ মাহফুজুল হকের আগ্রহেই সংকলনটি প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধ বাছাই থেকে প্রুফ দেখা সব কিছু তিনিই করেছেন। এ সংকলনের যদি কোন প্রশংসা প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে তা তাঁর।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১০

মুনতাসীর মামুন

স্বাধীনতা শুধু চার অক্ষরের শব্দ মাত্র নয় ১১
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি: সিভিল সমাজের সংগ্রামের ২৫ বছর ২৩
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কারচুপি! ৮৬
অবশেষে স্বাধীনতা ঘোষণার 'ড্রামতত্ত্ব' সরকারি পোষকতা পেল! ৮৮
চুকনগরে গণহত্যা ৯০
বাঙালি রমণীর পাকিস্তানী সৈন্যপ্রীতি ৯৮
সাময়িকপত্রে ১৯৭১ : বামপন্থীদের দৃষ্টিতে ১০৮
দৈনিকে একাত্তর ১৪৯
অন্য চোখে দেখা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ১৮৭
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে কি সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়? ২৩৬
মুক্তিযুদ্ধের বই ২৩৯
সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এগিয়ে যাবেই ২৫২
বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম ২৫৬
মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তির অবস্থান ২৬৪
মুক্তির যে গান ২৭০
মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্র আবার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়া ২৭৫
তিন দশকের কালপঞ্জি ২৭৭
মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা :
উচ্চতর আদালত ও সরকারের দায়বদ্ধতা ২৮৪
জেনারেল জে এফ আর জ্যাকবের সাক্ষাৎকার ২৮৯

স্বাধীনতা শুধু চারটি শব্দের সমাহার নয়। অন্তত আমাদের কাছে, যাদের জন্ম ষাট দশকের আগে। স্বাধীনতা হয়ত চারটি অক্ষরের সমাহার হতে পারে তাদের কাছে যাদের জন্ম সত্তরের পরে। আমাদের কাছে নয় এ কারণে যে, এ চারটি অক্ষর আমাদের অর্জন করতে হয়েছে। কিভাবে? যদি স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকে তাহলে মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত বইগুলো পড়তে বলব অন্তত সম্প্রতি প্রকাশিত শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি'। স্বাধীনতা চারটি অক্ষরের সমাহার হতে পারে তাদের কাছে যারা ভুগছে অ্যালঝাইমার রোগে; বা বড় হয়েছে পঁচাত্তরের পর বিটিভি দেখে অথবা পড়াশোনাটা যাদের সীমাবদ্ধ শুধু ক্লাসরুমের মধ্যেই।

আমি কি কোনো অভিযোগ করছি? না, করছি না। স্বাধীনতা যদি কারো কাছে চারটি অক্ষরেরই সমাহার হয়ে থাকে তাহলে তার সেই বোধের জন্য নিজেকেও কমবেশি দোষী মনে করি। আমি দোষী নই, আপনি দোষী নন, অন্য কেউ দোষী ভেবে আর আত্মতৃপ্তি পেতে চাই না। সেই আত্মতৃপ্তি তো অনেক পেলাম। কী লাভ হলো তাতে? আমি বা আমরা অনেকে যখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখি তখন তাতে কোনো ঋণশোধ বা আত্মতৃপ্তির ব্যাপার থাকে না। যেমন, অনেকে মনে করেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে একটি পদক দেয়া হলো, বঞ্চিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়া হলো তাতেই যেন তাদের ঋণ শোধ হয়ে গেল। আমি বা আমরা অনেকে তা মনে করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, আমরা যে বারবার একই কথা লিখি ঘুরেফিরে তা ঋণশোধের জন্য নয়। এসব কিছুই মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণস্বীকারের জন্য। ঋণস্বীকারের কথা যখন এল তখন বলি, বাঙালির রক্তে এ বিষয়টি নেই। বাঙালি ঋণখেলাপি হতে রাজি, কিন্তু ঋণস্বীকারে নয়। ১৯৪৭-এর পর এ দেশের ইতিহাস দেখুন বা গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন, দেখবেন বাঙালির এ ব্যাপারে মনোভাব অনমনীয়। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিচার করুন, ১৯৭১ থেকে '৭৫ সালের কথা ভাবুন এবং তারপরের ঘটনাবলির কথাও স্মরণ করুন, দেখবেন—বাঙালি ঋণস্বীকারে নৈব নৈব চ।

বাঙালি বীরত্বের গাথা ভালোবাসে। এর একটি কারণ বোধহয়, ক্ষুদ্র এক ব-দ্বীপে তার বসবাস। মাত্র কিছুদিন হলো বাইরের জগতের সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে। সবসময় সে দেখেছে আশপাশে নির্যাতিত, গরিব, ক্ষুদ্র সব মানুষ, চিন্তার জগতটাই তার ছোট। তাই সাহসী কাউকে দেখলেই সে চমৎকৃত হয়। সে সবসময় বীরের কথা বলতে চায়, যদি সে বীর হয় 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল'-এর মতোও। এ যাবত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বইপত্র দেখলে এ কথাটি আরো স্পষ্ট হবে। শুধু রণগাথা, বীরত্বের ব্যঞ্জনা। না, নির্যাতন, অত্যাচারের কথা তেমন নেই। এ ইঙ্গিতও নেই কোথাও যে, অত্যাচার ও বীরত্বও এই সূত্রে গাথা। মানুষ অত্যাচারিত হয়, নিপীড়িত

হয়, বিদ্রোহ করে এবং তার পর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে। মুক্তিযুদ্ধ কি তাই নয়? পাকিস্তানের কলোনির অধিবাসী হিসেবে বাঙালি অপমানিত, শোষিত হয়েছে, ১৯৭১-এর শুরু থেকে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা রুখে দাঁড়িয়েছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। লড়াই করেছে বীরের মতো। তাই শুধু বীরত্বই যদি হয় ইতিহাসের **গাথা** তাহলে পটভূমিকা থাকে অস্পষ্ট, অজানা এবং সেই বীরত্বের ব্যঞ্জনাও হারিয়ে **যায়**। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের গাথা কি কম রচিত হয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান **বা** ইতিহাসে। কিন্তু বীরত্বের গাথা কতটুকু মনে রেখেছে বাঙালি? মনে রাখলেও রেখেছে খুব অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে রাখলে তো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজাকার হতো না। 'আলবদর মাওলানা' মান্নান বা গোলাম আযম তো প্রকাশ্যে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারত না। কারণ, এই বীরত্বের পটভূমিকাটি সবসময় স্পষ্ট হয় নি, অনবরত বলা হয় নি দুটি নতুন প্রজন্মের কাছে।

তা ছাড়া বাঙালির কন্ট্রাডিকশনের আরেকটি দিক উল্লেখ্য। **বাঙালি** আবার কোনো **বীরকে** বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। প্রথম সুযোগে তাকে ধুলায় ফেলে দিতে বাঙালি কার্পণ্য করে না। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব কম জাতিরই আছে। কিন্তু বাঙালি যেহেতু মানুষ এবং মানুষ আর কিছু না হলেও অত্যাচার-অপমানের কথাটা মনে **রাখে**। বাঙালিরও তাই আর কিছু না হোক অত্যাচারের কথাটা **মনে থেকেছে**। গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে এ কথাটা টের পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ইউরোপের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে উপন্যাস, **গল্প** থেকে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে গান—সবখানে কি বারবার ঘুরেফিরে আসে না হিটলারের সেই ক্রুর মুখ আর গুলির শব্দ। ইউরোপের শহরে-বন্দরে কি এখনো চোখে পড়ে না ফ্যাসিস্ট বা নাৎসিদের বীভৎসতার স্মারক? এর কারণ, সেখানে বীরত্বের গাথা যেমন রচিত হয়েছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অত্যাচারের গাথাও। এবং তা বর্ণিত হয়েছে প্রবলভাবে, জোরালোভাবে যা এখনো মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়, যে-কারণে এখনো অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অসামান্য সব চলচ্চিত্র। নির্মিত হয় 'গণহত্যা' জাদুঘর। জেনেশুনে ইউরোপ সে-কথা মনে রেখেছিল যে—মানুষ সব ভুলতে পারে কিন্তু অত্যাচার-অপমানের কথা ভোলে না।

আমরা আবার অনেক সময় অত্যাচারকে মনে করি অপমান। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গড়নে এ ধরনের হীনমন্যতা সবসময় ছিল এবং আছে। উদাহরণ দেয়া যাক। একজন শিক্ষককে পাঁচজন ছাত্র এসে পিটিয়ে গেল বা একজন তরুণীকে দু'জন মিলে ধর্ষণ করল, তাতে টিটি পড়ে গেল। সমাজ এসব ঘটনাকে ব্যক্তির অপমান হিসেবে চিহ্নিত করে লুকাতে চায়। ঘটনাটা উল্টো করে দেখি-না কেন? পাঁচজন একজনকে পিটাল, যাকে পিটাল তার অপমান হয় না, বরং ভীরুতা প্রমাণিত হয় পাঁচজনের এবং সেই ভীরুতা হলো অপমান। দু'জন এক তরুণীকে ধর্ষণ করলে তরুণীটি কেন অপমানিত হবে? অপমানিত হবে যারা তাকে রক্ষা করতে পারে নি, অর্থাৎ আশপাশের মানুষ, পাড়াপ্রতিবেশী। সমাজ। কারণ তাদের ভীরুতার কারণেই তরুণীটি ধর্ষিত হয়েছে। অপমানিত **হবে** সেই সব পরিবার **যেসব** পরিবারে তারা বড় হয়েছে, কিন্তু

মানুষ হয় নি। কারণ সেইসব পরিবার তাদের শেখায় নি সভ্যসমাজে কিভাবে বসবাস করতে হয়।

'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' পড়তে পড়তে এসব প্রশ্ন মনে জাগল। আজ অত্যাচারিত অনেকে তাদের কথা বলেছেন যা লিপিবদ্ধ হয়েছে এ গ্রন্থে। এতদিন তাঁরা বলেন নি কারণ, সবসময় তাঁদের মনে হয়েছে এসব বললে সমাজ বলবে তাঁরা অপমানিত হয়েছিল। দু'নম্বর সেক্টরের গেরিলা স্কোয়াড ক্র্যাক প্লাটুনের দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ সাদেক চুল্লু গ্রেফতার হন ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট (তাঁর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে উপর্যুক্ত গ্রন্থে)। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার হয়েছে কিন্তু এতদিন বলি নি। সবাই হয়ত বলত, তোমাকে ধরে পিটিয়েছে, এ তো লজ্জার কথা! ভণ্ড সমাজের ভণ্ড ধারণা। এ কথা বলছি এ কারণে যে, ১৯৭১ সালে সারা পৃথিবী বাংলাদেশের জন্য যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার কারণ এই যে, তারা দেখেছিল অত্যাচারে অত্যাচারে একটি জাতি কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' বা মন্টু খানের 'হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন' পড়লে কি তা মনে হয় না? মনে কি হয় না, একটি জাতি হিসেবে পাকিস্তানিদের বিলুপ্তি কাম্য? এখন যেমন স্লাভরা পরিচিত হয়েছে অচ্ছুৎ জাতি হিসেবে। এসব বিবরণ পড়লে অত্যাচারীর এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বোধ প্রবল হয়।

পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকারদের নিয়ে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় নি তা নয়। হয়েছে, তবে খুবই কম এবং যা হয়েছে তাও আড়ালে পড়ে গেছে। তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'-এর ১৬ খণ্ডের মাত্র একখণ্ড (১৯৭৭) 'গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা' নিয়ে। এর পর যেসব বিবরণ বেরিয়েছে তার অধিকাংশের সূত্র এই অষ্টম খণ্ড, যদিও পরবর্তী প্রায় বিবরণে এই সূত্রের উল্লেখ নেই। আগেই তো বলেছি, ঋণস্বীকারের ব্যাপারে বাঙালি নেই। রশীদ হায়দারের 'একাত্তরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা', আতোয়ার রহমানের 'একাত্তরের কড়চা'—এই ধরনের কয়েকটি বই ছাড়া অত্যাচারের বিবরণ প্রায় নেই।

বর্তমানে মুখের কথার ইতিহাস বা 'ওর‍্যাল হিস্ট্রি'র বিষয়টি স্বীকৃতি পাচ্ছে। এ নিয়ে কিছু কাজও হয়েছে এবং হচ্ছে। হানাদারদের হত্যাযজ্ঞের কাহিনী উদ্ধারে ব্যবহার করা যেতে পারে এই পদ্ধতি। 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি'তে সেই পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে এবং উঠে এসেছে আর্তনাদে ভরা সেই দিনগুলো।

দুই

শুধু অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে দেখেই কি 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' গুরুত্বপূর্ণ? না, তা নয়। সঙ্কলনটি গুরুত্বপূর্ণ অন্য কারণে। অন্যান্য বিবরণে অত্যাচারের নায়ক ব্যক্তি নয়, সমষ্টি। ফলে, যুদ্ধাপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না। যুদ্ধাপরাধ বিচারে কিন্তু এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই সঙ্কলনে এই প্রথম আমরা অনেক নাম পাই। 'যুদ্ধবন্দিদের ভিতর অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা' শীর্ষক পরিশিষ্টে দু'শ' জনের নাম আছে। এ তালিকা আগে কখনো প্রকাশিত হয় নি। এ

ছাড়াও অন্যদের বিবরণে স্পষ্টভাবে কিছু নামের উল্লেখ আছে যাদের অনায়াসে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় যুক্ত করা যায়। এখানেই বইটি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। অবরুদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চল মুক্ত করার অনেক সাহসী বিবরণ অনেক জায়গায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তার কিছু আমাদের মনে আছে, বাকি সব ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেছে। কিন্তু অত্যাচারের কথা মনে থাকে দীর্ঘদিন এবং খুব সম্ভব বংশানুক্রমে শোণিতেও তা প্রবাহিত হয়। উচ্চবর্গ, জমিদার বাংলার নিরন্ন কৃষকদের ওপর চরম অত্যাচার করেছে। সে-জন্যই কি অষ্টাদশ শতক থেকে এ অঞ্চলে থেকে থেকে বিদ্রোহ হয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টি নিপীড়নের কথা মনে রেখে?

পাকিস্তানিরা কিভাবে অত্যাচার করেছিল, কাদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল? এসব বিবরণও কোথাও কোথাও আছে। শাহরিয়ার তাঁর ভূমিকায় এর একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করেছেন। তিনি লিখেছেন "নির্বিচার গণহত্যার ভেতর ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাধিকারেরও একটি বিষয় ছিল। পাকিস্তানিরা তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল—১. আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের; ২. কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের; ৩. মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের; ৪. নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে এবং ৫. ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের।"

তবে সবসময় যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছিল, তা নয়। প্রথমদিকে এবং পরেও প্রথমে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তারপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাড়ি থেকে তুলে এনে হত্যা করা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি হত্যার আগে নির্যাতনের কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তবে সামান্য। শাহরিয়ার নির্যাতনের বিভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন তাঁর চিহ্নিত মাধ্যমগুলো হলো—

"নির্যাতনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-পদ্ধতি পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা গ্রহণ করত তা হচ্ছে—১. অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত শারীরিক প্রহার, ২. পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, তৎসঙ্গে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার, ৩. উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা, ৪. সিগারেটের আগুন দিয়ে সারা শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া, ৫. হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভিতর মোটা সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়া, ৬. মলদ্বারের ভিতর সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া এবং বরফখণ্ড ঢুকিয়ে দেয়া, ৭. চিমটে দিয়ে হাত ও পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, ৮. দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা গরম পানিতে বার বার ডোবানো, ৯. হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখা, ১০. রক্তাক্ত ক্ষতে লবণ ও মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া, ১১. নগ্ন ক্ষতবিক্ষত শরীর বরফের স্ল্যাবের ওপরে ফেলে রাখা, ১২. মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেয়া, ১৩. পানি চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেয়া, ১৪. অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন চোখের ওপর চড়া আলোর বাল্ব জ্বেলে ঘুমোতে না দেয়া, ১৫. শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ প্রভৃতি।

যৌন নির্যাতনের বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই কম পাওয়া গেছে। কারণ নির্যাতিত কোনো মহিলা তার ওপর নির্যাতনের হুবহু বর্ণনা দিতে পারেন? তবুও কোনো কোনো বিবরণে

এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। রাবেয়া খাতুন নামে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এক সুইপার এ রকম একটি বিবরণ দিয়েছেন। তাঁকে ২৬ মার্চই হানাদার সেনারা খুঁজে পায় এবং ধর্ষণ শুরু করে। পুলিশ লাইনের ময়লা পরিষ্কার না হতে পারে বিধায় তাকে আর প্রাণে মারা হয় নি। তিনি বলেছেন, এরপর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিশোরী, তরুণী, মহিলাদের দলে দলে ধরে আনা হতে লাগল পুলিশ লাইনে এবং—

"এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙালি নারীদের ওপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবি সেনারা কুকুরের মতো জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগল। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। ... উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা এই নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই—আমি দেখলাম পাকসেনারা সেই মেয়েদের ওপর পাগলের মতো উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারালো দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্যত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

যে-সকল বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করল দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবি সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দু'জনে দু'পা দু'দিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম। পাঞ্জাবিরা শ্মশানের লাশ যে-কোনো কুকুরের মতো মদ খেয়ে সবসময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল।

শুধু সাধারণ পাঞ্জাবি সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবি সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মতো হয়ে দুই হাত বাঘের মতো নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মহিলাদের ওপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণকাজে লিপ্ত থাকত। কোনো মেয়ে, মহিলা যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্য মেয়েরা আরো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করত।

যে-সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে,

তাদের হাসি-তামাশায় দেহ দান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের ওপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মতো লাথি মারতে মারতে, পশুর মতো পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চারতলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবি সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভিতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যেত। এরপর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়—প্রতিদিন পাঞ্জাবিরা সেখানে যাতায়াত করত। সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের, কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস ব্যাটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোন যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত বক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করত। কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে, শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবি সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত।

প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না একমুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করত—আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতাম।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙালি যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবী সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায়ও সেখানে সেইসকল বন্দি মহিলাদের পুতগন্ধ, প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপরতলা হতে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ

নিরীহ বাঙালি যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবি সেনারা প্রহরা দিত। কোনো বাঙালিকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনো সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।"

বিস্তারিত বিবরণটি উদ্ধৃত করলাম একটি কারণে। যারা সমন্বয়ের রাজনীতি করেন, যেসব যুবক বলেন, ১৯৭১ সালে কী হয়েছিল কে জানে বা যেসব তরুণী স্টেডিয়ামে প্ল্যাকার্ড বহন করে পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে বিয়ে করতে চায় তারা যেন জানুক তাদেরই প্রতিবেশীরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল। বা একটু যেন ভাবে তাদের পরিবারের কেউ এভাবে নির্যাতিত হলে কেমন লাগত।

শাহরিয়ার নির্যাতনের পদ্ধতির যে সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন তার সবটাই কখনো কখনো একজনের ওপর প্রয়োগ করা হতো। '৭০-এর নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমানকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল। হত্যার আগে—"ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাক হানাদারবাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। ... এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যুত করার জন্য নানান ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে আগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাত রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখানো থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। অত্যাচারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনো তাঁর মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমে নি। সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারব না।'

"সত্যিই তিনি তা পারেন নি। হানাদারবাহিনী যখন তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো একটুও কাঁপে নি। প্রতিদিন একে একে হানাদার পশুরা যখন তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনো একটু কেঁপে ওঠে নি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোঁট দুটো।"

তারপরও কি আমাদের বারবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলতে হবে? হানাদার বাহিনীর সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে? সমন্বয়ের রাজনীতিকে স্বাগত জানাতে হবে। মানুষ হলে তা সম্ভব? যদি আপনার পিতা বা ভাইয়ের ওপর এ ধরনের অত্যাচার চালানো হতো তাহলে কি যুদ্ধাপরাধ মেনে নির্বিকার থাকতেন নাকি আমাদের মতো সোচ্চার হতেন।

পাকিস্তানিরা কি কখনো এসব অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছে বা গণহত্যার কথা? না, কখনোই নয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তা স্বীকার করেন, কিন্তু সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনই নয়। তৎকালীন পাকিস্তানি নীতিনির্ধারক বা নীতি প্রয়োগকারী, যেমন জেনারেল নিয়াজী, ফরমান আলী, উমর, রোয়েদাদ খান—অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি—আপনারা কি জানেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছিল? সবাই উত্তর দিয়েছে, না। জিজ্ঞাসা করেছি, কোন বাঙালি কি নিহত হয়েছিল ১৯৭১ সালে? এর উত্তর অনেকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকেছেন অথবা আমতা আমতা করেছেন। এর অর্থ অত্যাচার, হত্যা—সবই হয়েছিল এবং তা তাঁরা জানেন। সাংবাদিক এমএ নকভী

আমাকে বলেছিলেন, টিক্কা খান পাকিস্তান ফিরে বলেছিলেন, মাত্র তিন হাজার বাঙালি নারী ধর্ষিত হয়েছিল। চিন্তা করুন পাষণ্ডদের মনোভাব! এ প্রসঙ্গে এসে যায়, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের কথা। শাহরিয়ারও তাঁর ভূমিকায় এ সংস্থার ভূমিকার কথা লিখেছেন। ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের নীতি নির্ধারণে আইএসআইয়ের ভূমিকা ছিল প্রবল। বাংলাদেশে পরাজিত হওয়ার পর 'হৃতগৌরব' পুনরুদ্ধারের জন্য আইএসআই পাকিস্তানকে নিয়ে যায় আফগানিস্তানে। সেখানে জড়িয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের পরিস্থিতি কী হয়েছে তা পাকিস্তানে গেলেই বোঝা যায়। এখন আবার কাশ্মীর নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে উপমহাদেশে। অন্য কথায় বলা যায়, উপমহাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আইএসআই বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কারণ, তাহলে পাকিস্তানে সামরিকজান্তার (নাকি জন্তু) স্বার্থরক্ষা করা যায়, যথার্থতা প্রমাণিত করা যায়।

ইউরোপ, আমেরিকা কথায় কথায় মানবাধিকারের কথা বলে, সন্ত্রাসী সংস্থাকে দমনের কথা বলে। আইএসআই এখন একটি সন্ত্রাসী সংস্থা। বাংলাদেশেও এখন তারা বিভিন্ন ঘটনা সৃষ্টি করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইউরোপ বা আমেরিকা আইএসআই দমনের কথা বলছে না কেন? উপমহাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষের একটি দাবি হওয়া উচিত, অচিরেই আইএসআই'কে বিলুপ্ত করতে হবে যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির গেস্টাপো বা এসএস সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

তিন

নির্যাতিত নারীরা বাংলাদেশে সবসময় অবমাননার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রহর তাদের কেটেছে আতঙ্কে, যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও নির্যাতিতাদের স্থান হয় নি। ট্র্যাজেডি এখানেই। আমরা নাকি 'মা-বোনদের ইজ্জত' করি। বস্তুত এ ধরনের ভণ্ডামি আছে খুব কম সমাজেই। বঙ্গবন্ধু এদের 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করে সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, সমাজ তাদের গ্রহণ করছে না। প্রিয়ভাষিণীর স্বামী আহসানউল্লাহর সংখ্যা দু'একজনের বেশি নয় যিনি প্রকাশ্যে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আছি। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন।' অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি পিতামাতাও। নীলিমা ইব্রাহিমের বইতে তার বিবরণ আছে। নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন? এ সংখ্যা কখনো নির্দিষ্ট করা যায় নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে-সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এ দেশেও। তাই আমি 'বাংলার বাণী'তে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান মহিলার প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তাঁর নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ঐ সময় সিডনি থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি নির্যাতিত নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয়। এবং সেই হিসেবের তিনি একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন—"ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি

কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিসের মতে এই সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে। ড. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ-কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ-কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ...

ধর্ষিতা মহিলাদের যে হিসেব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসেব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদারবাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসেব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদারবাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে।"

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে দু'খণ্ডে এ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে। যেমন—"আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছেড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা জাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে জলে ভরে উঠত।

শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌল কোনো পরিবর্তন হয় নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না।

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কয়েকজন বীরাঙ্গনাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য এবং যুদ্ধাপরাধ এ মাটিতে কী পর্যায়ে গিয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে। সেই মহিলারা এতদিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর সমাজপতি ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাঁদের প্রায় পরিত্যাগ করে। খুলনায় আমি একজন মহিলাকে পাগলিনি বেশে ঘুরে বেড়াতে

দেখেছি যিনি '৭১ সালে নির্যাতিত হয়েছিলেন। খুলনার অনেকেই তা জানেন, কিন্তু কেউ তার পুনর্বাসনে এগিয়ে আসেন নি। এই হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালির আসল রূপ।

সবাই প্রিয়ভাষিণী নন। প্রিয়ভাষিণীর যা আছে তা হলো চরিত্র, যা আমাদের নেই। থাকলে বাংলাদেশকে পোড়ার বাংলাদেশ বলতাম না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে চলে আসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা দেশের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড, লুট, ধর্ষণ বা বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিল তারাই যুদ্ধাপরাধী। হানাদারবাহিনীর নীতিনির্ধারক বা যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত তারা যুদ্ধাপরাধী। স্থানীয় যেসব অধিবাসী এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারাও যুদ্ধাপরাধী।

এ ধরনের মুক্তিসংগ্রামের পর বা যুদ্ধের পর সবসময়ই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশেও হওয়ার কথা ছিল। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত জানিয়েছেন, হানাদারবাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭২-এর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এ সংখ্যা হ্রাস করে ১৯৫ এবং তারপর তা ১১৮তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি। তাঁর মতে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো গোপন সমঝোতা হয়েছিল কি না কে জানে? নাকি বাংলাদেশ সরকার আসলেই যুদ্ধাপরাধের প্রমাণাদি যোগাড় করতে পারে নি। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিঃসন্দেহ ছিল যে, যুদ্ধাপরাধ হয়েছে।

তবে দীক্ষিত এও জানিয়েছেন যে, যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তা চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে—"The substantative motivation for Mujibs decision might have been his long-term strategy of not doing any thing which would prevent recognition of Bangladesh by Pakistan and other Islami countries. In the larger interest of peace and normally in the sub-continent Mujibur Rahman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে কি প্রার্থিত সেই 'stability' এসেছে? না উপমহাদেশে সামগ্রিকভাবে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরছে? বরং বলা যেতে পারে, যুদ্ধাপরাধের বিচার না হওয়ার কারণে পাকিস্তানি জান্তা সাহসী হয়ে উঠেছে এবং নিজের দেশে নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আফগানিস্তানের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তারপর আবারও কাশ্মীরে। বাংলাদেশেও একইভাবে বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা দেশের শান্তি, স্বাভাবিকতা বিনষ্টে তৎপর হয়েছে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি মিরপুরে দুটি বধ্যভূমি খনন করা হয়েছে এবং তা থেকে নিহত মানুষের হাড়গোড়, মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি আমাদের কাছে আবার নতুনভাবে ফিরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আরো জোরালো হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিক আহমদ বলেছেন, প্রচলিত যে-আইন আছে তা দিয়েই যুদ্ধাপরাধের বিচার হতে পারে। কিন্তু কোনো সরকার তাতে আগ্রহী হবে কিনা সন্দেহ।

ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পিএন হাকসার শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার বাংলাদেশেই করতে হবে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু সে 'নিয়ম' আর এখন নেই। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক ফোরামগুলোর উচিত, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সে-দাবি উত্থাপন। যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশে বসবাস করার কারণে আজ রাজনীতি, সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এর ফলে সমাজের একটি অংশ (মানুষ) যে যুদ্ধাপরাধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে না তার গ্যারান্টি কী? এবং তা হয়ে উঠলে কি দেশ ও জাতির জন্য বিষয়টি মঙ্গলজনক হবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বিচারের অনেক নোশনও চ্যালেঞ্জ করা উচিত। জনসমক্ষে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যার বিবরণ ছাপা হয়েছে তার আবার সাক্ষ্যপ্রমাণ কী? আইন মানুষের সৃষ্টি, মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের ফ্রেমে নিয়ে আসার জন্য। যে আইনে বিচার পাওয়া যায় না সে আইন আবার কিসের আইন?

চার

অনেকে বলেন, কেন আপনারা এখনো এসব বিষয়ে লেখালেখি করেন। এত বছর পর কেন আবার রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করেন? পুরোনো ক্ষত জাগিয়ে লাভ কী? আপনারা ক'জন এগুলো করে নিজেদেরও বিপদাপন্ন করছেন। বিএনপি বা জাপা এসব বিষয়ে কেয়ার করে না জানি। আওয়ামী লীগও কি করে? তাছাড়া রাজনীতির এমন অবস্থা হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের কথা যিনি বলেন, তাঁকেই অভিধা দেয়া হয় আওয়ামী লীগার বলে।

আমি জানি না, রাজনৈতিক দলগুলো এসব বিষয় নিয়ে ভাবে কি না বা কেয়ার করে কি না। আমি তা জানতেও চাই না। কিন্তু আমি কেয়ার করি। আমরা যাঁরা লিখছি তাঁরা কেয়ার করি, যাঁরা এ লেখা পড়ছেন তাঁরা কেয়ার করেন। অজস্র মানুষ আছেন বাংলাদেশে যাঁরা কেয়ার করেন, হয়ত প্রকাশ্যে সে কথা বলেন না বা মিটিং-মিছিলে আসেন না। এ প্রসঙ্গে তারেক ও ক্যাথারিন মাসুদের সদ্যসমাপ্ত চলচ্চিত্র 'মুক্তির কথা' মনে পড়ছে। সেখানে সামান্য এক মানুষের জবানবন্দি বিধৃত হয়েছে। তাঁর গ্রামে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এক রাজাকার। সে মানুষ বলছেন, 'যদি আমরা রাজাকার

নির্বাচিত করে থাকি তাহলে আমরা ৯০ ভাগই তো রাজাকার হয়ে গেছি। কুত্তার মতো হয়ে গেছি, না হলে রাজাকার চেয়ারম্যান বানাই।'

এ ধরনের মনোভাব নিয়ে অজস্র মানুষ বসবাস করছেন। যদি সে সংখ্যা অজস্র নাও হয়, তাহলেও অন্তত আমরা ১০০ জন হলেও কেয়ার করি এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন হিসেবে, ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে, একজন লেখক হিসেবে আমি কেয়ার করি। তাই যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই।

শুধু তাই নয়, আমি এও মনে করি, আমাদের এসব কথা বলে যেতে হবে। আপনাকেও বলতে হবে আপনার সন্তানদের। এসব কথা সোনালি শস্যের মতো বেড়ে উঠবে, ঘিরে ধরবে একসময় নতুন প্রজন্মকে। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, সে স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে তাদের কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

১৯৯৯

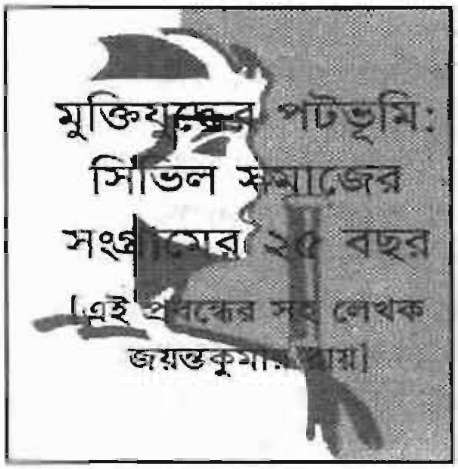

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। পত্তন হয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের। তার দুটি প্রদেশ–পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। কেন্দ্র সেখানেই। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছিল। এরপর বাঙালি আবিষ্কার করে নতুন শাসক পেয়েছে সে, অবাঙালি যার কিছু সহযোগী বাঙালি। এই সময়টাকে উল্লেখ করা যেতে পারে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ। ১৯৭১ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দমন নিপীড়ন শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। এর ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতি নিঃস্ব প্রায় হয়ে পড়ে।

এই সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য, শুরু থেকেই শাসনে আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা দখল যা অব্যাহত ছিল ১৯৭১ পর্যন্ত। এই সময়ের অন্য বৈশিষ্ট্য অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের নিরন্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামের শুরু ১৯৪৮ সাল থেকেই। কখনও তা সফল হয় কখনও ব্যর্থ। কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর এই সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্বে পরিণতি লাভ করে ১৯৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধের মূল কথা ছিল–সমাজের সর্বস্তরে সিভিল সমাজের [শাসনের] কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে কোন সময়টাকে আমরা বিবেচনা করব? কেউ মনে করেন শুরুটা ১৯৪৮ থেকেই হবে, কেউ মনে করেন বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষণার মাধ্যমেই নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের শুরু। দ্বিতীয় সময়কালটির যৌক্তিকতা যথেষ্ট। তবে, ১৯৪৭ সাল থেকে যদি পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গকে কলোনি মনে না করতো তাহলে হয়ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয় দফার প্রয়োজন হতো না। সে পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলিই এখানে বিবৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগ্রামে কখনও পিছু হটে গেছে, কখনও বা এগিয়ে গেছে সামনে। এই অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চাৎগমনের মধ্যে, পশ্চাৎগমন পর্যায়টি একটি দীর্ঘসূত্রী সময়। পশ্চাদগমনের সময়, স্পেস এবং মেয়াদ নির্ণীত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কারকের কর্মকাণ্ডের ওপর। এই কর্মকারকদের তিনভাগে ভাগ করা সম্ভব প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক।

প্রাথমিক কারকের অন্তর্ভুক্ত হলেন–রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী এবং ভূ-স্বামী। এরা সরকার পরিচালনা করছে কিনা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কর্ণধার কিনা তার সঙ্গে জড়িত এদের প্রভাব। প্রাথমিক কারকের উপ-বিভাগ সমূহের প্রভাবও নির্ভর করে দেশটি সামরিক না বেসামরিক কর্তৃত্বাধীন তার ওপর; বা দৃশ্যত বেসামরিক কর্তৃত্ব অথচ ক্ষমতার অধিকারী সামরিক আমলাতন্ত্র, বা দৃশ্যত বেসামরিক কর্তৃত্ব কিন্তু ক্ষমতা একনায়কী আমলাতন্ত্রের (বা টেকনোক্র্যাট)–এসব কিছুর ওপর।

মধ্যবর্তী কারকের অন্তর্ভুক্ত হলো–মূলত : শিক্ষিত পেশাজীবীরা যাদের অন্তর্গত আইনজীবী, ডাক্তার, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি এবং ছাত্র। ছাত্রদের এই বিভাগে

অন্তর্ভুক্তির কারণ তারাও অচিরে সদস্য হয়ে ওঠে শিক্ষিত পেশাজীবী বা প্রাথমিক কারকের।

প্রান্তিক পর্যায়ে আছেন, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, রাস্তার মানুষ, বিশেষ করে শহরের।

এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচ্য। প্রতিটি কারকরা যে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবেন তা'ও নয়। এ পর্যায়গুলি হতে পারে উভমিশ্রও। যেমন, একজন উচ্চপদস্থ আমলা অবসর নিয়ে মধ্যবর্তী কারকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। একজন আইনজীবী বা ডাক্তার বা অধ্যাপক মন্ত্রী হয়ে পরিণত হতে পারেন প্রাথমিক কারকে।

সিভিল সমাজের জন্য অব্যাহত আন্দোলন, প্রাথমিক বা মধ্যবর্তী কারকের রূপান্তর, সিভিল সমাজের কিছু অর্জন করে পিছুহটা–সব কিছু মিলিয়ে বা এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্বিরোধ লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন তাতে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী পালন করেছেন প্রাথমিক কারকে নেতার ভূমিকা। কিন্তু, আবার তাঁদের কিছু পদক্ষেপ, পরবর্তীকালে গেছে সিভিল সমাজের বিপরীতে।

এখানেই চলে আসে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্বাধীনতা পেলেও এর কাঠামোগত কোনও পরিবর্তন হয়নি। ঐ প্রাথমিক কারকরা ঐ কাঠামো দ্বারাই প্রভাবিত বা চালিত হয়েছেন। আবার ঐ কাঠামোর বিপরীতে রাষ্ট্রক্ষমতা হ্রাস করে সিভিল সমাজও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন মধ্যবর্তী কারকরা, পরে তাতে অংশগ্রহণ করেন প্রাথমিক কারকরা। ভাষা আন্দোলন যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পথ উন্মোচন করেছিল কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বিজয়কে সংহত করতে পারেনি প্রাথমিক কারকরা। আবার ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মধ্যবর্তী কারকদের অনেকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন প্রাথমিক কারকে। এর ফলে দেখা গেছে এবং পরবর্তী বিবরণে দেখা যাবে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থান নিচ্ছেন সিভিল সমাজের বিপরীতে। কারণ, তখন আর মধ্যবর্তী কারকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তাদের নিয়ন্ত্রণ করা। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, যে সব রাজনৈতিক কারক সরকারে নেই, এবং নিয়ন্ত্রণ করেন না রাষ্ট্রক্ষমতা তখন তাঁরা সিভিল সমাজের অংশ। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়া মাত্র তাঁরা হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ।

বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনে সব সময় রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের স্থান ছিল পরস্পরের বিপরীতে। এ ক্ষেত্রে বা সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় মধ্যবর্তী কারকরা সব সময় পালন করেছেন মুখ্য ভূমিকা। প্রাথমিক কারকরাও যোগ দিয়েছেন এই আন্দোলনে। কিন্তু, রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে সে ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দেননি সিভিল সমাজে। ফলে, তাদের আবার হটে যেতে হয়েছে। বলা যেতে পারে এ ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের মিল আছে।

প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী কারকদের সামাজিক পটভূমিকা অভিন্ন। অন্যদিকে, প্রান্তিক কারকদের পটভূমিকা ভিন্ন। সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী

কারকদের মধ্যে যেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, সংঘাত হয়েছে তেমনি আবার পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতাও করেছে। তাদের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতে প্রান্তিক কারকরা অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু যখনই মধ্যবর্তী কারকরা সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় বেগবান হয়ে এগিয়ে গেছে তখন কিন্তু প্রান্তিক কারকরা যোগ দিয়েছে তাতে। ১৯৫৬, ১৯৬৯ বা ১৯৭১ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবর্তী রাজনৈতিক কারকরা পাকিস্তানের শাসক চক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করেছে। এই পাকিস্তানি শাসক চক্রের নিয়ন্ত্রণকারী ছিল পাঞ্জাবিরা এবং তারা চেয়েছিল এ অঞ্চলের ওপর আর্থ-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার। সাফল্যজনকভাবে প্রথম প্রতিবাদটি করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। ঐ সময় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এসেছিলেন ঢাকা সফরে এবং ১৯ মার্চ ১৯৪৮ সালে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[১] অখণ্ড পাকিস্তানের জনসংখ্যার হিসেবেও বাংলা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠের মাতৃভাষা, উর্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের স্বল্পসংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং এ ধরনের উক্তি অতি সহজেই প্রতিভাত হয়েছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস হিসেবে। মধ্যবর্তী রাজনৈতিক কারকরা যার প্রধান উপাদান ছিল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশ তারা প্রতিবাদ জানিয়ে সংঘাতে গেলেন পুলিশ ও মুসলিম লীগের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ধরনের নিপীড়নে আন্দোলন দমিত হওয়ার বদলে ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি আরও জোরদার হয়ে উঠলো। প্রান্তিক কারকরাও এতে আকর্ষিত হয়ে সংশ্লিষ্ট হন। দমন নীতি যে ফলপ্রসূ নয়, পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তা অনুভব করে বেছে নিলেন সমঝোতার পথ। তিনি বললেন, প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করবে যাতে বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং গ্রেফতারকৃত রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। পরিস্থিতি তখনকার মতো শান্ত হয়ে ওঠে।[২]

১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে নাজিমউদ্দিন যখন কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী তখন ১৯৪৮ সালের প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ঘোষণা করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্তী রাজনৈতিক কারকরা এর প্রতিবাদ করলেন ১৪৪ ধারা অমান্য, ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে যার পরিণাম পুলিশী নির্যাতন ও গুলি। এতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে প্রথম শহীদ হলেন কয়েকজন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকদের মধ্যে স্থাপিত হলো একটি যোগসূত্র। সরকারি নীতির সমর্থক দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'এ আগুন দেয়া হল। শহীদ তখন শুধু ছাত্রই হননি, হয়েছেন সামান্য রিকশা চালক ও সরকারি কর্মচারীও। যদিও পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাশ করে তবুও আন্দোলনকে স্তিমিত করা যায়নি। এমনকি ঢাকার আদি বাসিন্দা বা কুটিরা যারা আগে অনুগত ছিলেন নওয়াব পরিবারের তারাও সমর্থন করেছিলেন ছাত্রদের। সরকার অবশ্য আন্দোলন দমন করেন গ্রেফতার ও অন্যান্য দমন নীতি চালিয়ে। সিভিল সোসাইটি পশ্চাদগমন করে। তাৎক্ষণিকভাবে

ফলাফল পক্ষে না গেলেও পরবর্তীকালে দেখা যায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সিভিল সমাজকে অগ্রবর্তী করে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যে কারণে দেখি ষাট ও সত্তর দশকের আন্দোলনগুলিতে পঞ্চাশের নেতারা পালন করছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

চল্লিশ দশকের শেষার্ধে ও পঞ্চাশ দশকের শুরুতে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি যে অগ্রগামিতার স্বাক্ষর রেখেছিল পরবর্তী এক দশক আর তা দেখাতে পারেনি। অবশ্য এটা ঠিক যে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক রাজনৈতিক কারকরা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সিভিল সমাজের দীর্ঘ সময়ের পশ্চাদপসারণে তা আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এর একটি কারণ প্রধান কারণও বলা যেতে পারে, তা হলো প্রাথমিক কারকদের সামান্য স্বার্থের কারণে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব অন্তর্কলহ প্রভৃতি। পূর্ববঙ্গের শাসক দল মুসলিম লীগের বাঙালি নেতারা পূর্ববঙ্গের স্বার্থ কখনও দেখেননি। (যেমন ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে)। ভাষা প্রশ্নে আন্দোলনের যে সূত্রপাত যা সংহত করতে পারতো সিভিল সমাজের নেতৃত্ব তা সম্ভব হয়নি প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকদের রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যাওয়ার জন্য। এ সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি পাওয়া যাবে বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থে রাজনৈতিক কারকদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণের উপসংহারে। তিনি লিখেছেন–

"আন্দোলনের মুখে চুক্তি সম্পাদন এবং আন্দোলনের পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগে সেই চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ"।[৩]

রাজনৈতিক কারকদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, খাজা নাজিমউদ্দিনই শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। "পার্লামেন্টারি উপদলের যে সমস্ত নেতারা রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের নেতা হিসাবে নাজিমুদ্দীনের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি পদ আদায়ের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ আলী, তফাজ্জল আলী, ডক্টর মালেক প্রভৃতি এই উপদলভুক্ত নেতৃবৃন্দ পরিষদের ভাষা প্রশ্নের উপর বিতর্ককালে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তাঁদের এই মৌন ভূমিকার কারণ ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রাদেশিক সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিক্রীত হয়েছিলেন।"[৪]

পূর্ববঙ্গের শাসক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে পাঞ্জাবি শাসকচক্র। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার হলেই তারা খুশি থেকেছে এবং পরিণামে বাঙালিদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগের নেতারা যে তা বোঝেন নি তা' নয় বরং এ কারণেই ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন তারা বারবার পিছিয়েছেন। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য ভাষা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে ভাষা আন্দোলনের পক্ষের প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকদের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। "এ ছিল এক মিশ্র শ্রেণীভিত্তি, মিশ্র ভাবাদর্শ এবং মিশ্র রাজনীতির সম্মিলনে গড়ে ওঠা জাতীয় জাগরণ।"[৫]

আগেই উল্লেখ করেছি শাসক মুসলিম লীগ নির্বাচন পিছাচ্ছিল, এমনকি উপনির্বাচনে যেতেও সাহস পাচ্ছিল না। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, একটা সময় দেখা গেল

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে চৌত্রিশটি আসন শূন্য পড়ে আছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের নীতিও ছিল তাই কারণ শাসনের চরিত্র আমলাতান্ত্রিক এবং সর্বজনীন ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল তাদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে এ ভরসাও তারা করতে পারছিল না। এ সমস্যাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণ, পাকিস্তানের শাসক আমলাদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি যাদের কোনোরকম সমর্থন ছিল না পূর্ববঙ্গে অথচ পূর্ববঙ্গবাসীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসকদের মধ্যে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাঞ্জাবিরা যারা সামরিক-বেসামরিক দু'ক্ষেত্রেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, এ সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, যেসব রাজনৈতিক কারকরা সাধারণ নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন তাদের সঙ্গে কোনও যোগ ছিল কিনা লিয়াকত হত্যায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর। ঐ সময় লিয়াকত পরিকল্পনা করছিলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে নির্বাচনের। উচ্চপদস্থ আমলারা কখনই লিয়াকত হত্যা রহস্য উদঘাটনে অগ্রসর হয়নি। বরং বলা যেতে পারে লিয়াকতের মৃত্যু সুযোগ করে দিয়েছিল উচ্চপদস্থ আমলাদের ক্ষমতা সংহতকরণে। যেমন ভারতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য গোলাম মহম্মদ ইতোমধ্যেই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব হিসেবে। লিয়াকত হত্যার পর তিনি হলেন গভর্নর জেনারেল। ঐ একই ক্যাডারের আরেকজন সদস্য চৌধুরী মহম্মদ আলী ১৯৪৭ -এর পর থেকে ছিলেন পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব হিসেবে অতীব ক্ষমতাধর। তিনি হলেন অর্থমন্ত্রী। পূর্ব ও পশ্চিম-উভয় অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারাও যোগ দিলেন এ খেলায় যা সিভিল সোসাইটির পশ্চাদপসরণের ইঙ্গিত বহন করে। ঐ সময় পূর্ববাংলায় তিনজন রাজনীতিকের পক্ষে ছিল জনসমর্থন। তাঁরা হলেন, আবুল কাশেম ফজলুল হক যিনি পরিচিত ছিলেন 'শেরে বাংলা' নামে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।[৭] তাঁরা তখন কিছুই করেননি। ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী ছিলেন ব্যতিক্রমী মেধাবী আইনজ্ঞ। ক্ষমতা ক্ষুধার্ত আমলাদের অবৈধ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের তারা বিরোধিতা করেননি।

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সংকট পথ প্রশস্ত করেছিল দু'টি রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টিতে, যে দু'টি সংগঠন অচিরেই পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। এ দুটি দল হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ যা গঠিত হলো ১৯৪৯ সালে এবং কে এস পি বা কৃষক সমাজ পার্টি যা গঠিত হলো ১৯৫৩ সালে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক। দল গঠনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন জেলে। পরে অবশ্য তিনিই দলের প্রধান হয়ে ওঠেন। সোহরাওয়ার্দী এ দলের সঙ্গে যুক্ত হন পরে এবং ভাসানী এ দল ত্যাগ করলে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কে এস পির নেতা ছিলেন, এ. কে. ফজলুল হক।

নবগঠিত দল দুটি সহজেই পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বৈষম্য তুলে ধরতে পেরেছিল। মূল বিষয়গুলি ছিল শাসন করছে অবাঙালি বিশেষ করে পাঞ্জাবি আমলারা। পূর্ববঙ্গের পাট বিক্রি করে অর্জিত হয় বৈদেশিক মুদ্রা আর তা ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের

শিল্পায়নে। যে ভোগ্যপণ্য আমদানী করা হয় তা প্রথমে আসে করাচিতে তারপর ফের রফতানী করা হয় পূর্বাঞ্চলে। দাম তখন তার বৃদ্ধি পায়। সরকারি নথিপত্রেই এর প্রমাণ ছিল ভূরি ভূরি।

সুতরাং ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল মুসলিম লীগের কপালে কি আছে। গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট যার প্রধান শরিক ছিল আওয়ামী লীগ (মুসলিম শব্দটি তখন বাদ গেছে) ও কে এস পি। ফ্রন্টে আরও ছিল ডানপন্থী নিজাম-ই-ইসলাম ও বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার হলো 'একুশ দফা' যা রচনা করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ এবং যা তাঁর ভাষায় "পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার ছাত্র জনতার জীবন-বাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল"।[৮] যুক্তফ্রন্ট তুলে ধরেছিল বাঙালিদের ওপর পাঞ্জাবিদের আধিপত্যের কথা। বাংলা ভাষার অবমাননার কথা, বৈষম্যের কথা।[৯] সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হলো মুসলিম লীগ। ৩১০ সদস্যের আইন সভায় মুসলিম লীগ পেলো মাত্র ৯টি আসন এবং শতকরা আড়াইভাগ ভোট।[১০] মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের মতো ব্যক্তিত্ব পরাজিত হলেন অচেনা যুবক খালেক নওয়াজের কাছে। এ নির্বাচনে মধ্যবর্তী কারকদের মধ্যে ছাত্ররা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা স্বইচ্ছায় গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল নির্বাচনী প্রচারে। যুক্তফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যেও একটি বড় অংশ ছিল মধ্যবর্তী কারকদের। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ সিভিল সোসাইটির জয় যেখানে প্রাথমিক মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকরা উৎসাহে অংশ নিয়েছিল। বলা যেতে পারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে সিভিল সোসাইটির এত বড় জয় আর কখনও হয়নি। এরকমটি আবার ঘটেছিল আর পরে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে।

১৯৫৪ সালের এই বিজয় ধরে রাখা দূরের কথা সংহতও করতে পারেনি পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক কারকরা। শাসক চক্রের চক্রান্ত তারা রুখতে পারেনি। এই শাসক চক্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল আমলা যারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে তারা অভ্যস্ত ছিল জনসমর্থনহীন মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে। যুক্তফ্রন্টের জনসমর্থনের ভিত্তি ছিল বিরাট সুতরাং পাকিস্তানের শাসক আমলারা বুঝতে পারছিল না একতরফাভাবে ক্ষমতাচ্যুত না করে কিভাবে এর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়। যুক্তফ্রন্টকে অপসারণের অন্য আরেকটি কারণ ছিল। পাকিস্তান তখন অপেক্ষা করছিলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে উপনীত হতে। এ চুক্তি হলে আমলাচক্রের হাতে আসবে প্রচুর সম্পদ এবং যুক্তফ্রন্ট ছিল এ ধরনের চুক্তির বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে, আমলাচক্র চাইলো যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাতে। তারা জানতো, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মতবিরোধের কথা। বিভিন্ন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়েও সৃষ্টি হয়েছিল অসন্তোষের। "এ মনোনয়নের সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে মোহন মিঞার কেবল তিক্ততাই দেখা দেয়নি অন্তত দুটো নির্বাচন কেন্দ্রের মনোনয়ন নিয়ে হাতাহাতি মারামারিও হয়ে গেছে।"[১১] পাকিস্তানি শাসকরা মুসলিম লীগের পরাজয় আসন্ন জেনে ফজলুল হকের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছে নির্বাচন ভণ্ডুল করতে চেয়েছিল। নির্বাচনের পর শাসকরা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনে আহবান জানালো। যদিও

যুক্তফ্রন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল আওয়ামী লীগের। এতে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে সৃষ্টি হলো মনোমালিন্যের, কারণ তখনও ফজলুল হক নেতা নির্বাচিত হননি যুক্তফ্রন্টের। নেতা নির্বাচন হলো ২রা এপ্রিল ১৯৫৪ সালে। ৩রা এপ্রিল মধ্যরাতের মধ্যে গভর্নর বললেন মন্ত্রিসভার নাম দিতে। মধ্যরাতের মধ্যে ফজলুল হক মাত্র তিনজনের নাম স্থির করতে পারলেন যাঁদের একজনও ছিলেন না আওয়ামী লীগের।

১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিলের আগে ও পরে মন্ত্রিসভা নিয়ে নানারকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। আওয়ামী লীগের তরুণরা সোহরাওয়ার্দীকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছিলেন যে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ঝামেলা বাধাতে পারেন কারণ, অতীতে অনেকবার তিনি তাই করেছেন। সোহরাওয়ার্দী তাদের আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু, ফজলুল হক তাই করলেন। ফলে, ভাসানী ও ফজলুল হকের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হলো। বস্তুত মন্ত্রিসভা গঠন নিয়েই বলা যেতে পারে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল। ফজলুল হকের মতো রাজনৈতিক কারকও সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হলেন।[১২]

পাকিস্তানি শাসকরা অন্যভাবেও চাপ সৃষ্টি করলো। ২৩ মার্চ চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে বাঙালি-বিহারী শ্রমিক দাঙ্গা শুরু হলো। এর আগে ঢাকা শহরেও বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা হয়েছে। এর একটি রাজনৈতিক কারণও ছিল। "আদমজি, দাউদ প্রমুখ শিল্পপতি যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেবল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী জয় হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা এটাকে বিবেচনা করেছিল শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে। বাংলাদেশের লোক যে তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে সুতরাং শোষণের দিনও শেষ হয়ে আসছে—এটা তারা ভাবতে পেরেছিল। তাই তারা চেয়েছিল অংকুরেই সেটা বিনষ্ট করতে।"[১৩]

১৫মে ফজলুল হক যেদিন আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রি নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করলেন সেদিনই দাঙ্গা বাধানো হলো আদমজিতে। প্রশাসন তখনও নিয়ন্ত্রণে ছিল না মন্ত্রিসভার। তাই দেখা যায়, যতক্ষণ না বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড হলো ততক্ষণ প্রশাসন নীরব ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এ অজুহাতে যখন অক্ষম হিসেবে মন্ত্রিসভাকে দায়ী করলো কেবল তখনই প্রশাসন হস্তক্ষেপ করলো তাও এমনভাবে যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠলো তারা দমন করতে চাইছে বাঙালি মজুরদের। এ মজুররা ছিলেন ভাসানীর অনুসারী ট্রেড ইউনিয়নের অনুগামী এবং যুক্তফ্রন্টে তারা ভোট দিয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার যে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর তা পরিষ্কার হয়ে উঠলো কয়েকদিনের মধ্যে। আদমজির দাঙ্গার দু'দিন পর প্রতিরক্ষা সচিব ইসকান্দার মীর্জাকে গভর্নর করে পাঠানো হলো পূর্ববঙ্গে। মীর্জা ছিলেন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য। সেনাবাহিনীর পদমর্যাদাও ছিল তাঁর। ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি কাজ করেছেন পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে। এবং গোলাম মহম্মদ ও চৌধুরী মহম্মদ আলীর মতো তিনিও ছিলেন পাকিস্তানি আমলাচক্রের শক্তিশালী সদস্য। মীর্জা ঢাকায় পৌঁছার দু'দিন পর ১৯ মে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করলো। এ চুক্তির একজন স্থপতি ছিলেন মীর্জা নিজে। যুক্তফ্রন্ট যে এর বিরোধী তা তিনি জানতেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পরপরই মাওলানা ভাসানী চুক্তির বিরোধিতা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মীর্জা ও তাঁর অনুসারীরা

ভাবছিলেন, এ চুক্তি বাতিলে যুক্তফ্রন্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজে লাগালো করাচিতে নিযুক্ত নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা জন পি ক্যালাহানকে। ২০ মে ক্যালাহানের নেওয়া ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হলো ঐ কাগজে। রিপোর্টের মূল বিষয় ছিল ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চান কেননা শুধু ভৌগোলিক দিক দিয়েই পাকিস্তানের দুটি অঞ্চল আলাদা নয়, এর অর্থনীতি সংস্কৃতি সব কিছুই আলাদা। ফজলুল হক এ রিপোর্ট মিথ্যার বেসাতি হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি বলেছেন স্বাধীনতার কথা নয়। কিন্তু ক্যালাহান স্বীকারই করলেন না যে তাঁর রিপোর্টে তথ্যগত ভুল আছে।[১৪]

কেন্দ্রীয় সরকার আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্য হক মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নানারকম কটূক্তি করতে লাগলো। বলা হলো এ মন্ত্রিসভা শুধু অক্ষমই নয় বরং জাতীয় সংহতির প্রতি হুমকিস্বরূপ কারণ এ সরকার কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের আশ্রয়দাতা। ৩০মে ১৯৫৪ সালে কেন্দ্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অপসারণ করলো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (যিনি ছিলেন একজন বাঙালি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পুতুল মুসলিম লীগের সদস্য) ঐ দিন এক বেতার ভাষণে ফজলুল হককে চিহ্নিত করলেন একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে যিনি মূলত পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন। মোহাম্মদ আলী অভিযোগ করে বললেন যুক্তফ্রন্ট প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং তা পরিণত হচ্ছিল সে শক্তিতে যা প্রদেশকে বিরুদ্ধাচারী করে তুলছিল কেন্দ্রের এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের বিরুদ্ধে।

যে মন্ত্রিসভা সব নিয়ম-কানুন মেনে ক্ষমতায় এসেছে দু'সপ্তাহের মধ্যে তাকে বাতিল করা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার যে কোনও ভিত্তি ছিল না তা প্রমাণিত হলো তাঁকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগে। যুক্তফ্রন্টের অপসারণ, ফজলুল হককে গৃহবন্দি, দেড়শো রাজনৈতিক কর্মী ও শেখ মুজিব সহ ত্রিশজন সাংসদকে বন্দির ফলে সিভিলসমাজ পুরোপুরি হটে গেল।[১৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, হক মন্ত্রিসভার অপসারণের ফলে জোরালো কোনও প্রতিবাদ হয়নি। বরং অনেক রাজনীতিবিদ নিজ সামান্য স্বার্থে এমন আচরণ করেছেন যা সিভিল সমাজের বদলে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার গঠনে সাহায্য করে। অনেকে আঁতাত করে হতে চেয়েছেন ক্ষমতার অংশীদার। এবং এ ধরনের আচরণই উন্মুক্ত করেছিল ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করতে।

১৯৫৪ সালের এতবড় বিজয় যা ছিল সিভিলসমাজের বিজয় তা কেন রাজনৈতিক কারকরা ধরে রাখতে পারলেন না? কেন হটে আসতে হলো সিভিলসমাজের? এবং এর জন্য কি চরম মূল্য দিতে হয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তরের ইংগিত পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমেদের লেখায়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা তাঁর রচনা এবং যুক্তফ্রন্ট আমলে তিনি ছিলেন মন্ত্রী। তাঁর উদ্ধৃতি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করছি, একজন প্রাথমিক রাজনৈতিক কারক বিষয়টিকে কিভাবে দেখেছেন, তা বিবেচনার জন্য—

"যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ব বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সৌভাগ্য সূর্য উদিত হইয়াছিল, প্রভাতেই এমনি করিয়া তাতে গ্রহণ লাগিল। পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, সে গ্রহণ আজও ছাড়ে নাই। পিছনের দিকে তাকাইয়া এত দিন পরেও আজ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের বিরোধ না হইত, যদি যুক্তফ্রন্টের সর্বসম্মত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত, যদি হক সাহেব ও শহীদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্য জিদ না করিতেন, যদি মাওলানা ভাসানী নিরপেক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, যদি হক সাহেব লিডার নিযুক্ত হইয়াই গণ-পরিষদের মেম্বরগিরি নিজে ছাড়িতেন এবং অন্যান্যদের ছাড়িবার নির্দেশ দিতেন, যদি তিনি ২১ দফা কর্মসূচি রূপায়ণে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা সফরে গিয়া রাজনৈতিক দুশমনদের অজুহাত না দিতেন, তবে পূর্ববাংলার ভাগ্যে কি কি কল্যাণ হইতে পারিত---তা আজ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব বাংলার সরকারের জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার ঐক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে পরাজিত সরকারি দল আমাদের দাবী মানিয়া লইতেন, গণপরিষদে নয়া নির্বাচন হইত, নয়া নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ব বাংলার গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচিত হইত; পাকিস্তানে গণতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপায়িত হইত পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান চরম দুর্ভাগ্যসমূহের একটাও ঘটিতে পারিত না।"[১৬]

পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদে বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু প্রাদেশিক নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ায় ও যুক্তফ্রন্টকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করায় তাদের জনপ্রিয়তা ও সম্মান হ্রাস পেয়েছিল। এবার হঠাৎ তাঁরা সাহস সঞ্চয় করে কিছু একটা করতে চাইলেন যদিও অতীতে তাঁরা সব সময় সমীহ করে এসেছেন কেন্দ্রের আমলাতান্ত্রিক শাসন। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে মুসলিম লীগ সদস্যরা উদ্যোগ নিলেন ১৯৩৫ সালের 'গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' সংশোধন করার। এই 'অ্যাক্ট'-এর একটি ধারা অনুযায়ী যে কোনো মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারতেন গভর্নর জেনারেল। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ তখন রাজধানীর বাইরে। সদস্যরা ধারাটি সংশোধন করতে চাইলেন এভাবে যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকে তবে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না। পাকিস্তানি আমলাচক্রের দলপতি গোলাম মহম্মদ এ ধরনের ঔদ্ধত্য মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি গণপরিষদ বাতিল করে দিলেন। আসলে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভা অন্যায়ভাবে অপসারণের পরও সিভিল সমাজ থেকে প্রতিবাদ না আসায় তিনি আরেকটি অন্যায় করার সাহস পেয়েছিলেন। এবং এ অন্যায় করেও তিনি জিতে গেলেন। কারণ এরও কোনও প্রতিবাদ হলো না। প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের কাছে নতি স্বীকার করলো। অন্যান্য পর্যায়ের কারকদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার আগে ও পরে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক কারকরা অনেক ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করেননি। পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগের একজন নেতা আতাউর রহমান খানকে জেলে নেওয়া হয়নি। হয়তো ধারণা করা হয়েছিল অন্যান্য নেতাদের তুলনায় তিনি নমনীয়। গোলাম

মহম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার আগে তাঁর কাছে সমর্থন চেয়েছিলেন। আতাউর রহমান এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে, অতি শীঘ্র নতুন নির্বাচন দিতে হবে এবং পূর্ববঙ্গে জনসমর্থিত সরকার বসাতে হবে। ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিতে আর যাই হোক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেওয়া কষ্টকর। অন্যদিকে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর যুক্তফ্রন্ট যাতে পুনরুজ্জীবিত করা যায় তার চেষ্টাও চলছিল। গোলাম মহম্মদের তখন পূর্ববঙ্গ সফরের কথা। অনেকের মনে এ ধারণা জন্মেছিল গোলাম মহম্মদকে যে বেশি খুশি করতে পারবেন তিনিই হয়তো মুখ্যমন্ত্রী হবেন। গোলাম মহম্মদ ইতোমধ্যে ঘোষণা করলেন, হক সাহেবকে তিনি রাষ্ট্রের দুশমন মনে করেন না, বন্ধু মনে করেন। এ পটভূমিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতারা বৈঠকে বসলেন গোলাম মহম্মদের অভ্যর্থনার বিষয় আলাপ করতে। বৈঠকে কাদা ছোঁড়াছুড়ি ছাড়া কোনও ব্যাপারে ঐকমত্য হলো না। গোলাম মহম্মদ যেদিন বিমানবন্দরে পা রাখলেন সেদিন দেখা গেল আতাউর রহমান খান ও এ. কে. ফজলুল হকের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেছে কে গভর্নর জেনারেলকে আগে মালা পরাবেন তা নিয়ে।[১৭] কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "এটা শুধু নেতৃবৃন্দের পক্ষেই অবমাননাকর ছিল না, সারা বাংলার আত্মসম্মানে আঘাত করেছিলেন নেতারা, শুধু মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য।"[১৮] পূর্ববঙ্গের দুইজন প্রধান রাজনৈতিক কারক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বিপরীতে সিভিলসমাজের অবমাননা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

এ পর্যায়ে দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদকে ধরাশায়ী ও সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় আমলাদের সঙ্গে আঁতাত করার মতো রাজনীতিবিদদের অভাব হয়নি। কয়েকজন মাত্র নেতা, যেমন, মওলানা ভাসানী ছিলেন ব্যতিক্রম। কিন্তু ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে নিশ্চুপ থাকাটাও ছিল এক ধরনের মৌন সহযোগিতা। যুক্তফ্রন্ট যখন অপসারিত হয় ভাসানী তখন ইউরোপে। এ খবর শুনেই তিনি আর ঢাকা না ফিরে কলকাতায় চলে গেলেন এবং সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কারণ, ইসকান্দার মীর্জা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে গুলি করে হত্যা করবেন।[১৯] পূর্ববঙ্গের তৎকালীন তিনজন নেতা–ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে, ভাসানীরই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিল আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার। (অতীতে তিনি তা করেছিলেন এবং ভবিষ্যতেও তা করে দেখিয়েছিলেন।) কিন্তু ঐ সময় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে ভাসানীর পশ্চাদপসারণ ছিল সিভিল সমাজের পশ্চাদধাবনের প্রতীক। সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমা আমলাদের সঙ্গে যখন একটি অপবিত্র আঁতাত করে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হলেন তখন ভাসানী ফিরলেন কলকাতা থেকে।[২০] সোহরাওয়ার্দী নিজে কলকাতা গিয়ে ভাসানীকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাসানীই ছিলেন একমাত্র নেতা যার ইংরেজ আমল থেকে দীর্ঘকাল আত্মত্যাগের উদাহরণ ছিল। সুতরাং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বৈরাচার ও হুমকি যদি তাঁকে কাবু করতে পারে তা'হলে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত, যে ক্ষেত্রে লাভ ছিল উচ্চপদের মুলাও।

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিলেন গোলাম মহম্মদ। নীতির কারণে রাজনীতিবিদরা আর নির্যাতিত হতে রাজি ছিলেন না বরং চাচ্ছিলেন উচ্চপদ।

গণপরিষদ বাতিলের পর গোলাম মহম্মদ 'মেধা মন্ত্রিসভা' গঠনের একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেন যার অর্থ একই জায়গায় বিভিন্ন দল ও রাজনীতিবিদদের সমাহার এবং একই সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন। এই নতুন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী হলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ইস্কান্দার রাজনীতিবিদদের হেনস্তা করেছেন, তাঁকে করা হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আইয়ুব খান যিনি ছিলেন সেনাধ্যক্ষ, তাঁকে করা হলো প্রতিরক্ষামন্ত্রী। চৌধুরী মহম্মদ আলী ও সোহরাওয়ার্দীকে করা হলো যথাক্রমে অর্থমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী। পরে অবশ্য সোহরাওয়ার্দী দেখলেন যে, তার সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই গোলাম মহম্মদ, ফজলুল হকের অনুগত কে এস পির আবু হোসেন সরকারকে করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এই নিয়োগ পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন নিশ্চিত করলো। কারণ, তা জন্ম দিয়েছিল দু'ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার। একটি হলো, শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্যে আওয়ামী লীগ ও কে এস পির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আরেকটি হলো, লাভজনক পদে যে সব দল বা ব্যক্তি যেতে পারেনি এবং যারা পেরেছে তাদের মধ্যে রেষারেষি। যুক্তফ্রন্টের ঐক্য আর রইলো না। পূর্ববঙ্গে পার্লামেন্টারি সরকার অনেক পদেরও সুযোগ সৃষ্টি করতো। সে কারণে আওয়ামী লীগ ও কে এস পির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছিল। সোহরাওয়ার্দী চাচ্ছিলেন, যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে আতাউর রহমান খান যেন স্বীকৃতি পান তাহলে তিনি হবেন পূর্ববঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। বগুড়ার মহম্মদ আলী ধারণা করছিলেন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে হটিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চান। সুতরাং সোহরাওয়ার্দীর সব উদ্যোগকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখে বিরোধিতা করছিলেন এবং এ কারণে সমর্থন জানাচ্ছিলেন ফজলুল হককে। হয়তো মহম্মদ আলীর হিসাব ভুল ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর অনুগত বিশেষ করে শেখ মুজিব যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে ফজলুল হককে হেয় করার চেষ্টা করছিলেন। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব ঘোষণাও দিয়েছিলেন যে, ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ১৪৪ জন সাংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। আসলে ৮০ জন এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। অন্তিমে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে শেখ মুজিব নিজেই ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি পার্টিতে এ প্রস্তাব পাশ করা নিয়ে কে এস পি-আওয়ামী লীগ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে পড়লো। এভাবে আওয়ামী লীগ-কে এস পি আলাদা হয়ে গেল।

শুধুমাত্র কিছু পার্টির সুবিধার কারণে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল অথচ এর সৃষ্টি এবং জয় হয়েছিল আদর্শ ও নীতির কারণে। পরিণামে আমলাতান্ত্রিক শাসকচক্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শাসনতন্ত্র রচনার সময় এমন সব ধারা রাখা যাতে যুক্তফ্রন্টের স্বায়ত্তশাসনের দাবী উহ্য থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে আইনসভায় পূর্ববঙ্গের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কথা তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী তৈরি করলেন শাসনতন্ত্রের খসড়া (১৯৫৬ সালে যা গৃহীত হয় পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রূপে) এবং সে খসড়ায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কোনও উৎসাহই দেখালেন না অথচ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তা ছিল একটি দাবি। বরং গোলাম মহম্মদ ও তাঁর অনুচরদের খুশি করার জন্য সমর্থন করলেন পশ্চিম

পাকিস্তানকে এক 'ইউনিট' করার প্রস্তাবে। এক ইউনিটের অর্থ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আসন সংখ্যা সমান করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, আইনমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন অথচ ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্ট তা জোরালোভাবে বিরোধিতা করেছিল।[২১]

বগুড়ার মহম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণ ও পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা-কোনোটাই সোহরাওয়ার্দী করতে পারেননি। বরং জুন ১৯৫৫ সালে যখন সোহরাওয়ার্দী ও গোলাম মহম্মদ দেশের বাইরে তখন মহম্মদ আলী ফজলুল হকের অনুসারী আবু হোসেন সরকারকে দিয়ে পূর্ববঙ্গ পার্লামেন্টারি সরকার পুনরুজ্জীবিত করলেন। গোলাম মহম্মদও চাননি সোহরাওয়ার্দীর প্রভাব বাড়ুক। ১৯৫৫ সালের আগস্টে মহম্মদ আলী সোহরাওয়ার্দীকে বাধ্য করলেন মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে। এভাবে ফজলুল হক ও মহম্মদ আলী আঁতাত ফলবান হয়ে উঠলো।

নতুন গণপরিষদ আহবানে গোলাম মহম্মদ মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ফেডারেল কোর্ট পরামর্শ না দিলে তিনি হয়তো দ্বিতীয়বার গণপরিষদ আহবানও করতেন না।[২২] ৭ জুলাই, ১৯৫৫ সালে গোলাম মহম্মদ দ্বিতীয় গণপরিষদ আহবান করলেন। পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য এতে যোগ দিলেন এবং এভাবে পূর্ববঙ্গের প্রাথমিক কারকরা আবার পশ্চিমা শাসকচক্রের ডিকটাট মেনে নিলেন। প্রতিরোধ করলে তারা যে পরিষদে পেতেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেখানে তারা মেনে নিলেন সংখ্যা সাম্য। শুধু তাই নয়, নতুন পরিষদে পূর্ববঙ্গের অনেক রাজনৈতিক নেতা আমলাতান্ত্রিক নির্দেশ মেনে সমর্থন করলেন এক ইউনিট। ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর "এস্টাবলিশমেন্ট অফ ওয়েস্ট পাকিস্তান বিল" পাশ হল। অনেকে আশা করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি যেমন, সিন্ধু বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এর বিরোধিতা করবে। এক ইউনিটে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে পাঞ্জাবি আমলাচক্রের হাতে। এটি আশংকা করে পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক আমলাচক্র এ দুটি অঞ্চলে দমন-নিপীড়নের আশ্রয় নিলো। আর ফজলুল হকও তাঁর অনুসারীরা আমলাচক্রের সঙ্গে হাত মেলালে অবস্থা আমলাদেরই অনুকূলে গেল। সোহরাওয়ার্দী যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে এক ইউনিট সমর্থন করেছিলেন এখন তার বিরোধিতা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে গোলাম মহম্মদ অসুস্থতার কারণে ছুটি নিলেন; তিনি আর সুস্থ হলেন না। এবং ইসকান্দার মীর্জা হলেন গভর্নর। মীর্জা ও গোলাম মহম্মদের মধ্যে মৌলিক মিলটি ছিল এই যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দু'জনেরই ছিল অপছন্দ এবং ছলেবলে তাঁরা রাজনীতিবিদদের বিভক্ত ও মনোবলহীন করে তোলায় ছিলেন দক্ষ। এক্ষেত্রে প্রধান কৌশল ছিল পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। চৌধুরী মহম্মদ আলীকে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। এবং আওয়ামী লীগ, ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করলো। এর বদলে এক ইউনিটকে সমর্থন করতে হল। অবশ্য, ফজলুল হক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, ফজলুল হক অবাঙালি শাসকচক্রের পুতুল হয়ে খেলছেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যা ছিল যুক্তফ্রন্টের একুশ

দফার অন্যতম তার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। এবং এর পরিণাম পূর্ববঙ্গের সিভিল সমাজের অপমানজনক পশ্চাদপসারণ।

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ও গণপরিষদ সংখ্যা সাম্যের কারণে শাসক আমলাদের বাংলাভীতি আর রইলো না। ফলে, একটি শাসনতন্ত্র রচনাতেও আর দেরি হলো না। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান চালু হলো। সংবিধানে পূর্ববঙ্গের নাম বদলে রাখা হলো পূর্ব পাকিস্তান। কয়েক মাসের মধ্যে চৌধুরী মহম্মদ আলীও ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে মীর্জার সমর্থনে সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হলেন অথচ এর বছরখানেক আগেই মীর্জা চৌধুরী মহম্মদ আলীর সমর্থনে সোহরাওয়ার্দীকে হেনস্থা করেছিলেন। গণপরিষদে আশিজন সদস্যের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল তেরো জন। ফলে, ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া ছিল অনুকূল। এছাড়া ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিন ছিলেন তিনি দেশের বাইরে। সোহরাওয়ার্দীও শাসক আমলাদের সন্তুষ্টি বিধানে পিছপা হননি। ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন ঢাকায় এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন, পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন দাবীর ৯৮ ভাগ পেয়েছে। মীর্জা সোহরাওয়ার্দীকে এরই মধ্যে বদল করতে চাইলেন। সোহরাওয়ার্দী চাইলেন, আইনসভায় তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে কিন্তু মীর্জা এতে রাজি হলেন না কারণ তাতে গণপরিষদ হয়ে ওঠে নীতিনির্ধারক। তিনি বললেন, সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে হবে অথবা তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করলেন। আই আই চুন্দ্রিগড় হলেন প্রধানমন্ত্রী; ৫৯ দিন পর প্রধানমন্ত্রী হলেন মালিক ফিরোজ খান নুন। ১৯৫৮ সালে শুধু ফিরোজ খান নুন কেন, স্বয়ং ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে দিয়ে গদি দখল করলেন আইয়ুব খান।

এখানে লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রে যখন এসব ঘটনা ঘটেছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা আলাদা কোন ভূমিকা নেননি। বরং তাঁদের কর্মকাণ্ডের কারণে সিভিল সমাজকে পিছু হটতে হয়েছে।[২৩] ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রবর্তিত হলে ফজলুল হক হলেন গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর অনুগত আবু হোসেন সরকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন এখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। প্রাদেশিক সভায় আবু হোসেন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে হবে তাই সিভিল সমাজের নৈতিকতা ভঙ্গ করে তারা বিরত থাকলো আইনসভা আহবানে। এবার শুধু স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের জন্য ডাকা হয়েছিল সভা। ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্যে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির সংখ্যা উপনীত করলেন চল্লিশে।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে খাদ্য সংকটের সময় আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার অদক্ষতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সামরিক বাহিনীকে খাদ্য সমস্যা ও সরবরাহের মোকাবিলার জন্য নিয়োগ করা হলো যা ছিল সামরিক বাহিনীর জন্য আর্শীবাদস্বরূপ। ১৯৫৬ সালের ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হলো ভূখা মিছিল। পুলিশ গুলিবর্ষণ করলো। নিহত হলেন কয়েকজন। যে সংবিধির বলে সামরিক বাহিনীকে খাদ্য বিতরণ ও খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য ম্যাজিস্ট্রিয়াল ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল

হাইকোর্ট সে সংবিধিটিকে সংবিধানবিরোধী ও কার্যকরহীন বলে ঘোষণা করলো। সরকার তা অমান্য করে নতুন নির্বাহী আদেশ জারী করে খাদ্য বিতরণে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব পুনস্থাপন করলো।

আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে তখন কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ চাইলো নতুন কৌশল অবলম্বন করতে। ইতোমধ্যে তাদের কাছে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সুতরাং মীর্জা ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা বাতিল করে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসালেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ইস্কান্দার মীর্জা 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে এক নতুন দল গঠন করলেন। ডা. খান সাহেব হলেন এর নেতা। চৌধুরী মহম্মদ আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ মুসলিম লীগরা এতে যোগ দিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন করে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করলো। আর যত দিন যেতে লাগলো আওয়ামী লীগে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের মধ্যে ফাটল তত জোরদার হতে লাগলো। ভাসানী অনুসারীদের দাবী ছিল এবং যাতে তারা দীর্ঘদিন ধরে ছিল সোচ্চার তা হলো–পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সত্যিকার স্বায়ত্তশাসন এবং পাশ্চাত্যের সামরিক চুক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ এ নীতি মানতে রাজি ছিল না। সোহরাওয়ার্দী ও আতাউরের নিয়ন্ত্রণে তখন ছিল পৃষ্ঠপোষকতার আধার–লাইসেন্স, পারমিট, সরকারি-আধাসরকারি পদে চাকরি। আর এসব তাঁরা এমনভাবে বিতরণ করতে লাগলেন যাতে দলে তাদের অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় ভাসানীর অনুসারী সংখ্যা।

১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই ভাসানী আওয়ামী লীগের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে (২৫ ও ২৬ তারিখে) ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। এখানে কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, এ অঞ্চলের প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা বা রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা দেখাননি এবং অধিকাংশ সময় এর বিপরীতে গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী স্বার্থকে। বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাসমূহও তাই প্রমাণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার জন্য তারা আমলাতন্ত্রের সাহায্য নিতে গররাজি ছিলেন না এবং আমলাতন্ত্রও নিজেদের আধিপত্য ও ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করতো এ সুযোগ। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ, ভাসানী অনুসারীদের কনভেনশনের আগে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। শুধু তাই নয়, মফস্বলেও একই ঘটনা ঘটে। হতে পারে মীর্জার ষড়যন্ত্র, খান সাহেবের শত্রুতা সব কিছু সোহরাওয়ার্দীকে মরিয়া করে তুলেছিল। এ সময় পদের অপব্যবহার যে হয়নি তা নয়। আওয়ামী মন্ত্রীরা যাতে ঘন ঘন বিদেশ যেতে পারেন সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সবই যাচ্ছিল খান সাহেবের অনুকূলে। ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বললেন। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রতিবাদে হরতাল ডাকলো কিন্তু হরতাল ব্যর্থ

হলো। কারণ সোহরাওয়ার্দীর জন্য তেমন সহানুভূতি আর অবশিষ্ট ছিল না। এভাবে কি সে সময় সিভিল সমাজও প্রতিশোধ নিল সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে যিনি প্রায় সময় অনুগত থাকেননি ঐ সমাজের প্রতি।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার চোরাচালান রোধে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করলো যার নাম 'অপারেশন ক্লোজড ডোর' (ওসিডি)। এ কর্মসূচি অন্তিমে সহায়তা করলো সামরিক শাসন প্রয়োগে। আমলাতান্ত্রিক শাসকচক্র এ সুযোগ ছাড়লো না। তারা রাজনীতিবিদদের হেয় করে তুলতে লাগলো জনসমক্ষে। চেষ্টা করলো প্রদেশে আওয়ামী লীগ শাসনকে দুর্বল করতে। শুধু তাই নয়, এ সুযোগে তারা চাইলো বেসামরিক প্রশাসনের ওপর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করতে এবং সামরিক শাসনের জন্য মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে। আবু হোসেন সরকার যখন খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য সামরিক বাহিনী নিয়োগ করেছিলেন তখন আওয়ামী লীগ এর সমালোচনা করেছিল। এখন চোরাচালান রোধে আওয়ামী লীগই নিয়োগ করলো সামরিক বাহিনী।[২৪] চোরাচালান হ্রাসের নামে সামরিক বাহিনী মাঝে মাঝে নিছক ত্রাসের সৃষ্টি করতো, বিশেষ করে অমুসলিমদের প্রতি। কখনও কখনও আতাউর বিরোধী রাজনীতিবিদও এর শিকার হতেন। এক কথায় 'ওসিডি'; এই সরকারের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিলো এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা যে অঘটনে কত পটু 'ওসিডি'র পরবর্তী কার্যকলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ, বাজেট তখনও পাশ হয়নি এবং প্রাদেশিক আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অধিবেশন চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত, তখন আতাউর রহমান গভর্নরকে অনুরোধ জানালেন সভা স্থগিত রাখতে। গভর্নর ফজলুল হক এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে বললেন পরিষদে আতাউরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন গভর্নরকে বরখাস্ত করতে। ফজলুল হক পাল্টা শোধ হিসেবে আতাউর রহমানকে বরখাস্ত করে ৩১ মার্চ আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। শুধু তাই নয়, স্পিকারের পরামর্শে সভা মুলতুবি করলেন। সোহরাওয়ার্দী তখন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সেই রাতেই প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে ফোন করে জানালেন, গভর্নরকে বরখাস্ত না করলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী তখুনি ফজলুল হক-কে বরখাস্ত করে মুখ্য সচিব হামিদ আলীকে পূর্ব পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্নর নিয়োগ করলেন। ১ এপ্রিল অবাঙালি সিএসপি হামিদ আলী আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করলেন। বারো ঘণ্টার মধ্যে মুখ্য মন্ত্রিত্ব হারালেন সরকার। হামিদ আলী গভর্নর হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আতাউর রহমানকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৮ জুন প্রাদেশিক আইনসভায় আতাউর সরকার পরাজিত হয়ে ১৯ জুন পদত্যাগ করলো। ২০ জুন আবু হোসেন সরকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ জুন তাঁর সরকার মুখোমুখি হলো অনাস্থা প্রস্তাবের। সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশন কক্ষে উদ্ভব হলো এক অভাবনীয় পরিস্থিতির। শেখ মুজিব উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলো, পদত্যাগ করেন আবু হোসেন সরকার। ২৫ জুন প্রেসিডেন্টের আদেশে স্থগিত হলো অধিবেশন। আওয়ামী লীগ অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নুনকে চাপ দিতে লাগলো আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা

নিয়োগে। এই চাপ সফল হলো এবং ১৯৫৮ সালের ২৫ জুলাই ক্ষমতা গ্রহণ করলেন আতাউর রহমান। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পক্ষে ও মীর্জার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেছে। শেখ মুজিব এমন বললেন যে, মীর্জা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে তিনি না থাকলে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো।

স্পিকার আবদুল হাকিম ছিলেন কে এস পির। আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল তাঁকে হটাতে, কারণ তাদের সন্দেহ ছিল স্পিকারের প্রশ্রয়ে বিরোধী দল শক্তি সঞ্চয় করে পতন ঘটাতে পারে আওয়ামী লীগের। অন্যদিকে স্পিকার ও বিরোধী দলও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। আওয়ামী লীগ সে সময় দলীয় ছয়জন সাংসদকে সরকারি উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটারের পদ দিয়েছিল যা ছিল পার্লামেন্টারি প্রথার চরম অবমাননা। এ কারণে, নির্বাচন কমিশন এক রায়ে জানালো যে ঐ ছয়জনের আসন শূন্য হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে ফিরোজ খান নুন কেন্দ্রীয় এক অনুজ্ঞা বলে নির্বাচন কমিশনের রায় কার্যকর করলেন না। ২০ সেপ্টেম্বর অধিবেশন শুরু হলে, বিরোধী দল এটিকেই আলোচনার প্রধান বিষয় করে তুললো। তারা দাবী তুললো ঐ ছয়জনের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে। স্পিকার জানালেন ২০ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর রুলিং দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল আইনসভার পরিস্থিতি। সভা যেন পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। স্পিকার সভা ত্যাগ করলেন। পরে, তাঁর বিরুদ্ধে পাশ হলো একটি অনাস্থা প্রস্তাব। শুধু তাই নয়, আরেকটি প্রস্তাবও পাশ হলো তাঁর বিরুদ্ধে যার মূল বক্তব্য ছিল, স্পিকার পাগল। ২৩ সেপ্টেম্বর অধিবেশন বসলে দেখা গেল, বিরোধী দলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে কারণ, আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে কিনে নিয়েছে কয়েকজন কে এস পি সদস্য। সরকার পক্ষ দাবী তুললো, ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী কাজ চালাবেন। বিরোধীদল তা হতে দেবে না। সরকার পক্ষ ইতোমধ্যে বিডিআর ও সার্জেন্ট অ্যাট আর্মসের সাহায্যে এমন অবস্থা করলো যাতে স্পিকার সভা কক্ষে প্রবেশ করতে না পারেন। শাহেদ আলী বসলেন স্পিকারের আসনে। বিরোধী দল ক্ষিপ্ত হয়ে শুরু করলো ভাংচুর। শাহেদ আলী আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। ২৪ সেপ্টেম্বর স্থগিত হলো আইনসভা। ২৬ তারিখ শাহেদ আলী পরলোকগমন করলেন।[২৫] সীমিত হয়ে এল পাকিস্তানে পার্লামেন্টের গণতন্ত্রের দিন। ভারসাম্য ও নিজের পক্ষ ঠিক রাখার জন্য কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুনকে প্রায়ই রদবদল করতে হচ্ছিল মন্ত্রিসভা। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়নি যেহেতু সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি। তবে, ২ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যোগ দিলো মন্ত্রিসভায়। মন্ত্রী হলেন ছয়জন, এর মধ্যে তিনজন পূর্ণমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নুন মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। এক সময় দেখা গেল, পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী দু'জন—আমজাদ হোসেন ও হামিদুল হক চৌধুরী। ৭ তারিখের এ বিশৃঙ্খলা দূর করে হামিদুল হক চৌধুরীকে দেয়া হলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। হামিদুল হক ছিলেন কে এস পি'র। এখন মিত্র হলেন সোহরাওয়ার্দীর। ৮ অক্টোবর সকালে পত্রিকা মারফত জানা

গেল প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানে জারী করেছেন সামরিক আইন। তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করলেন আইয়ুব খানকে। তিন সপ্তাহ পর মীর্জা নিজেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। জেনারেল আইয়ুব খান হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার লোভে কিছু পাওয়ার লোভে তারাও ইচ্ছেমতো ব্যবহৃত হয়েছেন। অথচ সময় সময় এরা সিভিল সমাজও গড়তে চেয়েছেন। কেন তারা ছিলেন এই বৈপরীত্যের শিকার সে কথা এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই ব্যাখ্যা করেছি।[২৬] যখন শাসনতন্ত্রে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তখন আঘাত হেনেছিলেন গোলাম মহম্মদ। আর যখন নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছিল সিভিল সমাজের ভিত্তি স্থাপনে তখন আঘাত হেনেছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক কারকদের ভূমিকা ছিল এরকম। ১৯৫৬-৫৮ সালে তাদের ভূমিকা সিভিলসমাজ স্থাপনে তাদের ব্যর্থতা স্পষ্ট করে তুলছিল। অথচ, একই সময় মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকরা সব সময় সহযোগিতা করতে চেয়েছেন প্রাথমিক কারকদের। ইস্কান্দার মীর্জা ও পাকিস্তানের আমলাচক্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক কারকদের অক্ষম করে দিতে পেরেছিল একটি কারণে। তা হলো, আওয়ামী লীগ ও কে এস পি সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যূনতম ঐক্যে পৌছতে পারেনি।[২৭] লক্ষণীয় যে, একজন প্রাথমিক রাজনৈতিক কারক যিনি ১৯৭২-৭৫ সালে বাংলাদেশে ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সেই শেখ মুজিবুর রহমান, ঐ সময় আওয়ামী লীগ-কে এস পি ঐক্য সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকি, আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান খানের ভিত্তিও দুর্বল করেছিলেন। সামরিক আইন জারীর পর সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে পিছু হটে যায় এবং তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দূরের কথা প্রতিবাদও হয়নি। অন্য কথায় বলা যেতে পারে প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকদের আত্মমর্যাদাহীন আচরণে সিভিল সমাজের নৈতিক বল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল।

দুই

রাজনীতির মুখ্য কারক বা প্রাথমিক বা প্রাথমিক কারকদের সামান্য স্বার্থ নিয়ে বিভেদ, সমষ্টিগত স্বার্থ দেখতে ব্যর্থতা, ষড়যন্ত্র—সব মিলিয়ে রাজনীতি সম্পর্কে যে মানুষের মনে একটি অনীহার সৃষ্টি হয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই দেখি, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি বা জেনারেল আইয়ুব খান কথিত 'বিপ্লব' মানুষকে যেমন ভীত করে তুলেছিল তেমনি আবার খানিকটা আনন্দিতও করেছিল। আনন্দটা ছিল এ জন্য যে, তারা আসলেই জানতো না সামরিক শাসন কি এবং তাদের ধারণা ছিল, এই শাসনের ফলে, দেশের রাজনীতি পরিচ্ছন্ন হবে, স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে এবং শুরু হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আইয়ুব খান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, 'বিপ্লবের পর' তিনি ঢাকা যেতে চাইলেন। ইস্কান্দার মীর্জা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, সেখানে তোমাকে নাজেহাল করা হবে। আইয়ুব বললেন, না, পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেছে। এবং

ঢাকা স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় আইয়ুব খান বক্তৃতা দিলেন।[২৮] সুতরাং বলা যেতে পারে, সামরিক শাসনকে প্রাথমিকভাবে মানুষ ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। কিন্তু এও লক্ষ করি, অচিরেই এর প্রকৃতি অনুধাবন করে বাংলাদেশের মানুষই প্রথম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শুরু করেছে আন্দোলন।

আইয়ুব খানের জারীকৃত সামরিক শাসনের ৪৪ মাসে, বাংলাদেশের সিভিল সমাজ মনে হলো আবার পিছু হটে গেছে। তবে, এ সময়টুকুতে মর্যাদাকর ভূমিকা পালন করেছে মধ্যবর্তী কারকরা, বিশেষ করে সাংবাদিক ও ছাত্ররা। মাঝে মাঝে কিছু রাজনৈতিক কারকদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য, কারণ, তা সহায়তা করেছে সিভিল সমাজকে।

সামরিক শাসন প্রথমেই আঘাত হেনেছে সংবাদপত্রের ওপর। বাঙালিরা দেখলো, দেখে মর্মাহত হলো যে, সাংবাদিকরা সামরিক শাসনবিরোধী উচ্চারণ বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে কী ভাবে বন্দি হচ্ছেন, দমিত হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় রীট জারি করে সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য বিচার বিভাগও এগিয়ে আসেনি। বরং, সামরিক শাসনকে বৈধতা প্রদান করে প্রচার করা হয় একটি তত্ত্ব। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ মুনীর বললেন, বিপ্লব সফল হলে তা বৈধতা পায়। তখন বাতিলকৃত সংবিধানের আলোকে তার বৈধতা বিচার্য নয়।[২৯]

সামরিক শাসনবিরোধী সাংবাদিকদের বিদেশ গমনে বাধা দেয়া হতে লাগলো। পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি সংবাদপত্র–*ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজার্ভারকে* কালো তালিকাভুক্ত করা হলো যাতে তারা সরকারি ও আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হয়। এ তিনটি পত্রিকা মাসে চল্লিশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন পেতো মাত্র। অন্যদিকে, এমন পত্রিকাও ছিল, প্রচারসংখ্যা যার দু'হাজার বা তার ওপর, পেতে লাগলো সরকারি বিজ্ঞাপন। কেননা, সামরিক সরকারের নির্দেশাবলী তারা মানতো অক্ষরে অক্ষরে। *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* বা *অবজার্ভার* খুব একটা নতি স্বীকার করেনি বরং নানাভাবে তুলে ধরেছে বাঙালিদের অসন্তোষ এবং দু' অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য। এর পরিণামও ভোগ করতে হয়েছে তাদের।

পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবর্তী কারক বিশেষ করে ছাত্ররা যে কোনো সময় সেনা শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে-এ বিষয়ে যে সামরিক শাসকরা সচেতন ছিলেন না তা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর আজম খান (যিনি মীর্জাকে সরাবার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন আইয়ুব খানকে) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতে লাগলেন এ বলে যে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের এড়িয়ে চলা উচিত। কিছুদিনের মধ্যেই সুর বদলে গেল জেনারেলের। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে তিনি ছাত্রদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে লাগলেন, যে সব ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হবে তাদের লাথি মেরে বের করে দেয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, কারণ তাদের ওপর ভর করেছে শয়তান। সামরিক শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউনিয়নের কর্মচাঞ্চল্য খানিকটা থমকে গিয়েছিল যদিও ইউনিয়ন স্থাপনে সরকার বাধা দেয়নি। ছাত্ররা তখনও সরাসরি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নামেনি। কিন্তু যখনই সুযোগ এসেছে তা যত সীমিতই হোক তা সদ্ব্যবহার করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

পূর্ববর্তী আমলের মতো মধ্যবর্তী কারকরা, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যারা জড়িত, তাঁরাই প্রথম আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। আইয়ুব খান ক্ষমতা সংহত করার পর সেই পুরনো শাসকদের মতো ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে চাইলেন। তাঁর যুক্তি হল, দু' অঞ্চলের সংহতি বৃদ্ধি করতে হলে একটি ভাষা দরকার। প্রচলিত বাংলা বা উর্দু ভাষা দিয়ে সে অভাব পূরণ করা যাবে না। সুতরাং ভাষার সমন্বয় করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রস্তাব করা হয় রোমান হরফে বাংলা লেখার।[৩০] 'শিক্ষা কমিশন' ও বাংলা একাডেমী থেকে এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে। বাংলা ভাষাকে সংস্কার করে মুসলমানিত্ব প্রদানের প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়। যেমন—কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা "চল চল চল"-এর একটি লাইনে ছিল "নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশশ্মান।" পাঠ্য বইয়ে তা সংশোধন করে লেখা হলো "সজীব করিব গোরস্থান।" প্রচলিত কবিতা—

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।"-এর সংশোধন করা হলো এ ভাবে—

"ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
সারাদিন আমি যেন নেক হয়ে চলি।"

ছাত্রীদের কপালে টিপ দেয়ার ওপর অলিখিত বিধিনিষেধ জারী করা হলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিপ দিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাদের হেনস্থা করতে লাগলো।

মধ্যবর্তী কারক, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং পত্রপত্রিকা এর প্রতিবাদ শুরু করলো। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। ১৯৫৯ সালে ছাত্রদের একুশে ফেব্রুয়ারির এক অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা সংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ জানান।[৩১] ছাত্ররাও ঘোষণা করে এ প্রচেষ্টা তারা প্রতিরোধ করবে। ১৯৬০ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি ও ১৯৬২ -এর ছাত্র আন্দোলনের সময় ভাষা ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর আবেদন ছিল এক প্রধান স্লোগান।[৩২]

এর সঙ্গে যুক্ত হয় রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রশ্নটি। ১৯৬১ সাল ছিল কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী। সামরিক সরকার প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা না করলেও আকারে ইঙ্গিতে এ কথা স্পষ্ট করে তোলে যে রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী। পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা লেখালেখি শুরু করেন এ বিষয়ে। সামরিক সরকার গ্রেফতার করে কে, জি, মোস্তফা ও আলাউদ্দিন আল আজাদের মতো সাংবাদিক ও সাহিত্যিককে। তারা হয়তো ভেবেছিল, এর ফলে বুদ্ধিজীবীরা ভয় পেয়ে নিশ্চুপ থাকবে। কিন্তু বছরের শুরুতেই দেখা গেল, মফস্বলে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটি গঠিত হচ্ছে। ডাকসু দুই দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কার্জন হলে, যেখানে সভাপতিত্ব করেন সুফিয়া কামাল। ঢাকা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি আয়োজন করে ছয় দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানমালার। তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা অনুষ্ঠান করেন প্রেসক্লাবে। এসব ঘটনা সাংস্কৃতিক মহলে প্রবল উৎসাহ যোগায়। মেয়েরা

প্রতিবাদ হিসেবে কপালে টিপ পরা শুরু করেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সনজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হকের উদ্যোগে গঠিত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র 'ছায়ানট'। এবং এ পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ছায়ানটের গৌরবজনক ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঐ সময় 'ছায়ানট' এর শিল্পীরা একটি গান গাইতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যা আলোড়িত করতো শ্রোতাদের, তাহলো–'আবার তোরা মানুষ হ' অনুকরণ খোলস ভেদি কায় মনে বাঙালী হ।'[৩৩]

সামরিক শাসনামলের প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিবাদ হিসেবে আরও দু'টি ঘটনা জড়িত। একটি হলো, ১৯৬৩ সালের ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদযাপন। এর লক্ষ্য ছিল "বাংলা ভাষায় যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতাও দেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন।" তাই, "দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্খার রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণ"-এ সহায়তা করা বাঞ্ছনীয়। প্রতিদিন অজস্র মানুষ আলোচনা ও প্রদর্শনী শুনতে ও দেখতে আসতে থাকেন। এর সঙ্গে ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হিসেবে পহেলা বৈশাখ পালনও শুরু হয়।[৩৪]

এ সব কর্মকাণ্ডের মৌল বক্তব্যটি ছিল জাতি হিসেবে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ও সংহতকরণ এবং এর দ্বারা জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ যা অন্তিমে সহায়তা করবে সামরিক শাসন উৎখাত ও গণতন্ত্র আনয়নে যার অন্য অর্থ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সংস্কৃতিসেবীরা যখন ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করছিলেন তখন রাজনীতিবিদরাও পারস্পরিক আলোচনা শুরু করেন। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া এবং মণি সিংহ ও খোকা রায়ের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব এও বলেন যে, "ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ঐ দাবী রাখতে হবে।" সে দাবী অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তা সময়োপযোগী মনে করেনি এবং শেখ মুজিবও তা মেনে নেন।[৩৫]

এ বৈঠকে ঠিক হয়, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে কাজ করবে। এরপরই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নকে কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নিজ ছাত্র সংগঠন হিসেবে সংশ্লিষ্টতা প্রদান করে।

১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্ররা ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আর অপেক্ষা না করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সোহরাওয়ার্দী কেন ঐ সময় গ্রেফতার হলেন তা অনেকের কাছে রহস্যময় ঠেকার কথা। সামরিক আইন জারীর পর পর তিনি গ্রেফতার হলে ঐ প্রশ্ন জাগতো না। প্রশ্নটি উঠছে এ কারণে যে, সামরিক শাসন জারীর চার বছর পর তাঁকে গ্রেফতার করা হলো।

সোহরাওয়ার্দী যখন গ্রেফতার হন তখন কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে। অন্যদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর রাউনট্রি ঠিক করেছেন পাকিস্তান ত্যাগ করবেন। কারণ, এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিল। সামরিক শাসনের সময়টা সোহরাওয়ার্দী সব সময় মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন। তাদের প্রায় সব আমন্ত্রণে অংশ নিয়েছেন। রাউনট্রি পাকিস্তান ত্যাগের প্রাক্কালে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দী তাঁর সম্মানে একটি বিদায় ভোজেরও আয়োজন করেছিলেন এবং এ কথা জানার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।[৩৬]
৩০ জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দী কেন গ্রেফতার হলেন তার একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। আইয়ুব হয়তো এ ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে, সোহরাওয়ার্দী আইয়ুব প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন; কেননা ঐ শাসনতন্ত্রে এমন সব বিষয় ছিল যা বাঙালিদের পছন্দ করার কথা নয়। সোহরাওয়ার্দী নিজের আত্মজীবনীতেও একই কারণ উল্লেখ করেছেন।[৩৭] আসলে, মুজিব-মণি সিংহ বৈঠকে (পূর্বোল্লিখিত) ঠিক হয়েছিল, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হবে সোহরাওয়ার্দীর একটি ঘোষণার মাধ্যমে যেখানে সামরিক শাসন বাতিল করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের দাবী করা হবে। গ্রেফতারের আগে ঢাকা থেকে করাচী ফেরার আগে মানিক মিয়াকে এ সম্পর্কে একটি খসড়া লেখাও দিয়ে গিয়েছিলেন।[৩৮] আইয়ুব নিশ্চয় সামরিক শাসন প্রত্যাহারে ভয় পাচ্ছিলেন, যে কারণে প্রায় ডজনখানেকবার সামরিক শাসন বাতিল করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে বাতিল করেছিলেন। এ ছাড়া, এ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রতিক্রিয়া হবে এ সম্ভাবনাও বাতিল করতে পারেননি। জানুয়ারির শেষের দিকে আইয়ুব খান ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা বৈঠক করলেন ঢাকায়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হলেন আর ৩১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে ঘোষণা করা হলো যে, সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছেন। তবে, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই বলা হলো না। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে ভুল করলেন আইয়ুব, কারণ তাঁর গ্রেফতারের পরপরই ছাত্ররা তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিলো।
আইয়ুব খান যখন ঢাকায় পদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠক করছেন তখন, ১ ফেব্রুয়ারি, সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করলো। সরকারি নির্দেশে পরদিন ধর্মঘটের খবর ছাপা হলো না পত্রিকায়। দেয়ালে পোস্টার পড়লো—'সামরিক শাসন নিপাত যাক।' সরকারি পত্রিকায় আগুন দেয়া হল, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রকাশ্যে রাস্তায় অনুষ্ঠিত হলো বিক্ষোভ। ৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের উপচার্যের সঙ্গে এলেন কলা ভবনে বক্তৃতা দেয়ার জন্য। বক্তৃতা করার আগেই ছাত্ররা আঞ্চলিক বৈষম্য, মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন শুরু করলো এবং মন্ত্রী মাইকের সামনে দাঁড়াতেই লাঞ্ছিত হলেন। ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। একদিনের ধর্মঘট চললো পাঁচ দিন।
৫ ফেব্রুয়ারি রাতে, সরকারি নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। ৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কার্জন হলে কয়েক

হাজার ছাত্র জমায়েত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নিন্দা করে রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান। ছাত্ররা ধাওয়া করে সেনাবাহিনীর জিওসি-কে।

৭ তারিখ আইয়ুব খানকে ঘেরাও করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সাধারণ মানুষ যোগ দেয় ছাত্রদের সঙ্গে, অনুষ্ঠিত হয় বিশাল গণজমায়েত। পোড়ানো হয় আইয়ুব খানের ছবি। সরকার রাজনৈতিক নেতা, যেমন–শেখ মুজিব এবং সাংবাদিক, যেমন-মানিক মিয়া ও ছাত্রদের গ্রেফতার করে। টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে জমায়েত মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী টহল দিতে থাকে রাস্তায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়লো মফস্বলে। ফলে, মফস্বলেও শুরু হলো সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হল, আইয়ুব খান শক্তি প্রদর্শন করে সফল হলেন ফেব্রুয়ারি অসন্তোষ দমনে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, সামরিক শাসনামলের ইতিহাসে ঘটনাটি অসাধারণ।[৩৯] এ ঘটনার পর মোচন হলো রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের এবং এভাবে মধ্যবর্তী কারকরা, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ছাত্ররা এগিয়ে এল সিভিল সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা দৃঢ়তার সঙ্গে ছাত্রদের প্রকাশ্যে সমর্থন দেয়নি। ফলে, ফেব্রুয়ারি অসন্তোষের সাফল্য ছিল সীমিত। তবে, সামরিক শাসনের ভিত্তিতে অভিঘাত হেনেছিল এ ঘটনা এবং তখন থেকে সামরিক শাসকদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক থেকে হয়ে উঠলো রক্ষণাত্মক। আরও লক্ষণীয় যে, ছাত্রদের যখন হল ত্যাগ করতে বলা হয় তখন সাধারণ মানুষ বেদনা বোধ করেছিল। তবে, এর সুফল ছিল যা আগে উল্লেখ করেছি। ছাত্ররা নিজেদের বাড়িঘর অর্থাৎ গ্রামেগঞ্জে, মফস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়লো। শুরু হলো সামরিক শাসনবিরোধী প্রচারণা এবং এভাবে প্রস্তুত হলো বৃহত্তর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের।

ইতোমধ্যে, ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারী করে আইয়ুব খান দাবি করেছিলেন যে, সামরিক শাসকরা জনসাধারণের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।[৪০] ব্রিটিশ ভারতে জারীকৃত সতেরোটি প্রাদেশিক আইনের ধ্বংসাবশেষের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এ আদেশ। ১৮৯১ সালে 'বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ড। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে এর নাম হলো ইউনিয়ন কাউন্সিল। ১৯২০ সালের দিকে গঠিত হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ এবং এর প্রধানকে বলা হতো প্রেসিডেন্ট। মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি আদেশে তা হলো চেয়ারম্যান। প্রথমদিকে সীমিত ভোটাধিকার এবং পরবর্তীকালে অবাধ ভোটে নির্বাচিত হতেন প্রেসিডেন্ট। এবং সে সময়, ইউনিয়ন বোর্ড সদস্যদের অব্যাহতি প্রদানের প্রক্রিয়া এত জটিল করা হয়েছিল যে সরকারি কর্মচারীদের কলমের এক খোঁচায় তাদের অব্যাহতি দেয়া যেত না। আইয়ুবী আইনে স্বৈরাচারী প্রশাসকের বিরুদ্ধে এই রক্ষাকারক বিধি আর থাকলো না। সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার কারণ দর্শিয়ে সরকারি কর্মচারী কাউন্সিলের সদস্য বা চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দিতে

পারতো। ১৯২০ সালে, সাধারণ মানুষের অধিকার ছিল সরকারি কর্মচারী ব্যতিরেকে যে কাউকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের। বিডি আদেশে এ অধিকার কেড়ে নেয়া হলো এবং একজন সরকারি কর্মচারীকে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগের বিধান করা হলো।

সামরিক শাসনের প্রতি যে মানুষের সমর্থন আছে তা আইয়ুব দেখাতে চাইলেন নির্বাচনের মাধ্যমে। ১৯৬০ সালের মধ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সমাপ্ত করলেন এবং আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর প্রদত্ত ভোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৯৫.৬ শতাংশ। তারা আইয়ুবকে কর্তৃত্ব প্রদান করলো একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে।[৪১] এ লক্ষ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আইয়ুব খান গঠন করলেন একটি কমিশন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনের আগে আইয়ুব দু'টি বিধান জারী করেছিলেন। এর একটি হলো 'পাবলিক অফিসেস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (পোডো) এবং অপরটি 'ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (এবডো) এ দু'টি বিধানের বলে, আইয়ুবের সম্ভাব্য বিরোধীদের নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হল। মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল অফিসাররা নির্বাচন পরিচালনা করলেন অতি যত্নের সঙ্গে। এর অর্থ, আইয়ুবের পক্ষে যাতে ভোট পড়ে তার জন্য প্রশাসনকে ব্যবহার করা।

জনমত বোঝার জন্য আইয়ুব গঠিত শাসনতন্ত্র কমিশন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর করলো। এ কারণে বিলি করা হলো প্রশ্নপত্র এবং সাক্ষাৎকার নেয়া হলো রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। শাসনতন্ত্র কমিশনের সামনে দেয়া সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংবাদপত্রে আসা মাত্র সামরিক শাসকদের টনক নড়লো। এ সব সাক্ষাৎকারের মূল বিষয় ছিল বা সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের প্রধান বক্তব্য ছিল-সামরিক শাসনের বিলুপ্তি ও সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন। পত্রপত্রিকাগুলিও এ বক্তব্য প্রচার করছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্বে আইয়ুব সাংবাদিকদের থাকার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিলেন। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে আইয়ুববিরোধী কোনও কিছু যাতে প্রকাশিত না হয় সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। শাসনতন্ত্র কমিশনের সদস্যরা তা সত্ত্বেও অনুভব করলেন, গণতন্ত্রের প্রতি পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের আকুতি। শুধু তাই নয়, তারা এটিও অনুধাবন করলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষরা স্বায়ত্তশাসন চান। শাসনতন্ত্র কমিশনের সদস্যরা আইয়ুব খান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ১৯৬১ সালে প্রদত্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হল—পাকিস্তানের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয়।

আইয়ুব শাসনতন্ত্র কমিশনের সুপারিশ মেনে নিতে রাজি হলেন না। সুতরাং, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়টি পিছিয়ে গেল। আইয়ুব এমন শাসনতন্ত্র চাচ্ছিলেন যেখানে তাঁর ক্ষমতা হবে সর্বোচ্চ এবং জাতীয় পরিষদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। নিজের ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে তিনি নিজেই শাসনতন্ত্র নির্মাণ করলেন। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুবী শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল।[৪২] সামরিক শাসনের আওতায় মৌলিক গণতন্ত্রীরা জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইয়ুব নিজের মন্ত্রিসভা

গঠন করলেন। এ মন্ত্রিসভা দায়ী থাকবে জাতীয় পরিষদের কাছে নয়, প্রেসিডেন্টের কাছে। তবে লক্ষণীয় যে, সামরিক অনুশাসন, পোডো, এবডো এবং বিডি আইন সত্ত্বেও বেশ কিছু বাঙালি সামরিক শাসনের চরিত্র তুলে ধরার জন্য এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা হতাশ হলেন। কারণ, জাতীয় পরিষদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, বাজেটের ওপর সদস্যদের ভোট দেয়ার ক্ষমতা ছিল না। এ ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যই ছিল শেষ কথা। অর্থমন্ত্রী ছিলেন আবার প্রেসিডেন্টের তাঁবেদার।[৪৩]

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের আগে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হলো, বিশেষ করে ছাত্রদের। ছাত্ররা বদ্ধপরিকর ছিল আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এপ্রিলের মাঝামাঝি ছাত্ররা এ পরিপ্রেক্ষিতে 'শপথ দিবস' পালন করে।[৪৪] রাজনৈতিক নেতারা সামরিক আইনে এত ভীত ছিল যে, মাত্র কয়েকজন গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করে বিবৃতি দেন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর সরকার মুক্তি দেন ছাত্রদের। সরকার যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা হলো, ছাত্রনেতাদের জেলের বাইরে রেখে নির্বাচনে গেলে সুবিধা হবে না। কারণ, তারা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যা আবার অন্তিমে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে আইয়ুব খানের। সরকারি এ ধারণা যে ভুল ছিল না তা প্রমাণিত হলো অচিরেই। ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হলো। ছাত্ররা আন্দোলনের পথ বেছে নিল। সংসদ সদস্যদের কাছে গিয়ে তারা দাবি জানালো যে, সংসদে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের কথা বলতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের কেউ যেন মন্ত্রী না হন। ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত সদস্য মোনেম খাঁ আইয়ুব খানের পক্ষে বিবৃতি দেয়ায় ছাত্ররা তাঁকে নাজেহাল করে। অবশ্য, মোনেম খাঁ তাতে বিচলিত হননি এবং এ কারণে প্রথমে তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং তারপর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ফজলুল কাদের চৌধুরী যোগ দিয়েছিলেন আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায়। তারপর তিনি চাঁটগায় ফেরত এলে ছাত্ররা কালো পতাকা, আক্রমণাত্মক শ্লোগান এবং পচা ডিম ছুঁড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। ছাত্রদের এই আন্দোলন হয়তো বেগবান হতো যদি রাজনৈতিক কারকরা এতে যোগ দিতেন। কিন্তু, আশ্চর্য এই যে, সিভিল সমাজ এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে গিয়েও একেবারে দমিত হয়নি। আইয়ুব খান তাঁর মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে মন্ত্রিসভায় নিতে পারেননি। তাঁর মন্ত্রিসভায় তারাই যোগ দিয়েছিলেন যারা পরাজিত হয়েছিলেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে।

আইয়ুব খান শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিরূপ সব মন্তব্য করছিলেন এবং তা ব্যাপক প্রচারের বন্দোবস্তও করা হয়েছিল। এসব বক্তব্যের মূল সুর ছিল—পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও ছাত্ররা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা। যেমন ১৯৬২ সালের ২২ মার্চ লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, কলকাতা ও আগরতলার কমিউনিস্টরা পূর্ব পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর ষড়যন্ত্র করছে।[৪৫] বলাই বাহুল্য, ইঙ্গিতটা ছিল ভারতই এসব করাচ্ছে। ১৯৬২ সালে

২৮ মার্চ পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বললেন, কলকাতা এবং কাবুলে বসে ষড়যন্ত্রকারীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করছে।[৪৬] ১৯৬২ সালের ১ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সে বৈঠকে আইয়ুব বললেন, ছাত্র অসন্তোষ পুরনো আমলের ঐতিহ্য। ঐ সময় নিজেদের স্বার্থে রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের ব্যবহার করেছে। ছাত্ররা মানসিকভাবে পরিপক্ক নয় এবং জীবনের কোনো উদ্দেশ্য না থাকায় তারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বললেন, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের কোনও ধারণা নেই এবং সে কারণে, শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ না করাই বিধেয়।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তানি বা বাঙালি ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতার কথা সর্বজনবিদিত। ছাত্রদের প্রতি আইয়ুবের বিষোদগারের যোগ্য প্রত্যুত্তরও তারা দিলো। ১৯৬২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ছাত্ররা আবার শুরু করলো আইয়ুববিরোধী আন্দোলন। উপলক্ষ শরীফ কমিশন। অধিকাংশ লেখক, গবেষক, এমনকি ছাত্রনেতারাও এই আন্দোলনকে হামুদুর রহমান কমিশনবিরোধী আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়।

ক্ষমতায় এসেই আইয়ুব খান ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালের একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরের বছর, ৫ জানুয়ারি, আইয়ুবের প্রাক্তন শিক্ষক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস, এম, শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১০ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট কমিশন তার সুপারিশ পেশ করে। রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।[৪৮]

কমিশনের মূল বক্তব্য ছিল শিক্ষা বিনিয়োগ। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষা বাধ্যতামূলক এবং "উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায়" পরিণত করার সুপারিশ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা এ কমিশন প্রত্যাখ্যান করে[৪৯] এবং ঢাকা কলেজ থেকে আন্দোলন শুরু হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন মিছিল-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্ররা আহ্বান করে হরতাল। ছাত্রলীগ-ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এই আন্দোলন চলছিল। ইতোমধ্যে ১০ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর আসেন ঢাকায়। ছাত্ররা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে যদিও তখন গুজব রটেছিল যে আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। তৎকালীন ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহ্ সিরাজুল আলম খান বা পংকজ ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিযোগ করেছেন যে, সোহরাওয়ার্দী ছাত্রলীগ নেতাদের বুঝিয়েছিলেন যে, আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র ইউনিয়নের হাতে চলে যাবে।[৫০] এ অভিযোগ সঠিক কিনা তা বিচার করা দুরূহ। তবে, এটা ঠিক যে, সোহরাওয়ার্দীর আগমনের পরই ছাত্রঐক্য বিনষ্ট হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্র-জনতা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বাবুল, বাস কন্ডাক্টার গোলাম মোস্তফা এবং গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ (১৭ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ, ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যু) আহত হয় প্রায় আড়াইশো জন। যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা শহরেও ব্যাপক প্রতিরোধ হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে নিহত হয়

একজন ছাত্র। ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সরকার শরীফ কমিশনের বাস্তবায়ন স্থগিত করেন। পুলিশী নির্যাতন ও গুলিবর্ষণ তদন্ত করার জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। কমিশন ছয় মাসের মধ্যে একটি রিপোর্টও পেশ করে যা কখনও প্রকাশিত হয়নি। ১৭ সেপ্টেম্বরের ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা।

ছাত্রদের এই আন্দোলনের সাফল্য ছিল সীমিত। তারা আবেদন জানিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা সাড়া দেননি সে আবেদনে। সামরিক শাসন জারির পর রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এতেই বোধ হয় রাজনীতিবিদরা ভীত ছিলেন। শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত রেখেছিলেন সরকার, হয়তো, এটিই আন্দোলনের সাফল্য। স্বৈরাচারবিরোধী যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন ছাত্ররা, রাজনৈতিক কারকরা তখন তা ছড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু করেননি। আন্দোলনের আগে সোহরাওয়ার্দীর মুক্তিলাভই কি এর কারণ? ১৯৫২ সালের আন্দোলনে রাজনৈতিক কারকরা যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬২ তে দেননি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ১৯৬২ সালের আন্দোলনের রাজনৈতিক অভিঘাত বেশি। এ সময় ছাত্ররা অস্বীকার করেছেন সামরিক আইন। যে সিভিল সমাজ ঐ সময় উত্থানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারকদের জন্য তাকে পিছু হটে যেতে হলো।

তবে, একেবারে পিছু হটে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক কারকরা, তা বলাও বোধহয় ঠিক হবে না। তারা প্রত্যক্ষ সংঘাতের বদলে পরোক্ষ পথ বেছে নিয়েছিলেন। আইয়ুব খানের জাতীয় সংসদে পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সীমিত ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ শুরু করলেন।[৫১] সামরিক শাসন এবং মৌলিক গণতন্ত্র এই দুইয়ের পেষণ সত্ত্বেও আইয়ুবের সংসদে প্রতিবাদ হতে লাগলো। সংসদে পুরনো রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিরা। আইয়ুব খান অনেককে নির্বাচনে অংশ নিতে দেননি। কিন্তু, তাতেও আটকানো যায়নি তাদের। ফলে, বাইরে গণতান্ত্রিক ভাব বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে ক্ষমতায় থাকা-এ দুটি কাজ এক সঙ্গেই আইয়ুব খানকে করতে হল। আইয়ুব মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। যার পাঁচজন পূর্ব পাকিস্তানের এবং মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন সংসদ সদস্য। আইয়ুব খানকে মন্ত্রিসভার সদস্য সংসদ থেকে নিতে হবে এমন কোনো কথা ছিল না, কিন্তু তিনি তা করেছিলেন কৌশলগত কারণে। সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইলেন যাতে সংসদে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ গড়ে না ওঠে। তিনি প্রাক্তন মুসলিম লীগারদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করলেন। বগুড়ার মোহম্মদ আলী যিনি ছিলেন এক সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে করা হলো বিদেশমন্ত্রী। সাংসদদের হাতে রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় হারে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ করা হলো। এভাবে, ঠিক পুরনো কায়দায় রাজনীতিকদের বিভক্ত করা হলো। যেমন-এ কারণে খান এ সবুরকে কেন্দ্রের যোগাযোগমন্ত্রী করলেন, যাকে কয়েকদিন আগে সামরিক আইনের বলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

বলা যেতে পারে, এত কলাকৌশল আইয়ুবের দরকার ছিল না। কিন্তু, প্রতিটি দেশের সামরিক ব্যক্তি ক্ষমতায় গিয়ে যে কাজটি করেন আইয়ুবও তা করতে চেয়েছেন। ক্ষমতার উৎস যদিও ছিল তাঁর সেনাবাহিনী কিন্তু বাইরে বজায় রাখতে চেয়েছেন গণতান্ত্রিক ভাব। আবার সঙ্গে সঙ্গে এও চেয়েছেন, সেই "গণতন্ত্রে"র যাতে কেউ বিরোধিতা না করে। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানি প্রতিনিধিরা সুযোগ পেলেই নানা ধরনের অভিযোগ ও শর্ত আরোপ করেছিলেন। যেমন–বগুড়ার মোহাম্মদ আলী জানালেন, তিনি মন্ত্রী হতে রাজি কিন্তু সংসদ সদস্যপদ হারাতে রাজি নন। আইন করা হয়েছিল, সংসদ সদস্য কেউ মন্ত্রী হলে তাকে সদস্যপদ ত্যাগ করতে হবে। আইয়ুব শাসনতন্ত্র জারির চারদিন পর একটি সংশোধনী আনলেন যাতে বলা হলো সংসদ সদস্য কেউ মন্ত্রী হলে সদস্যপদ হারাতে হবে না। যেদিন, আইয়ুবী মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচজন সদস্য যোগ দিলেন, সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ সদস্য (৭২ জনের মধ্যে ৬৮ জন) তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করলেন। কারণ, তারা তাঁদের সতীর্থদের না জানিয়ে যোগ দিয়েছিলেন মন্ত্রিসভায়। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের দাবিগুলি কেন্দ্রীয় সরকার মানবে কিনা সে ধরনের কোনও নিশ্চয়তাও তারা চাননি। এই নিন্দা প্রস্তাব ছিল আইয়ুব খানের জন্য এক ধরনের পরাজয়। এটা ঠিক, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কারকদের মধ্যে আইয়ুব বিভেদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু এটাও ঠিক, আইয়ুব খানের বিরোধিতা করার ক্ষমতাও তারা রাখতেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সমাজের এটিও যে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি তা বলাই বাহুল্য।

সতর্কতার সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করে এবং প্রয়োজনে হুমকি দিয়ে জাতীয় পরিষদে আইয়ুব খান তার মন্ত্রিসভার বিরোধিতা ও অনাস্থা ঠেকাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও দেখি, অন্তিমে তাঁকে সরকার কাঠামো ও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে আরও সংশোধনী আনতে হয়েছে। সামরিক শাসনের পুরোটা সময় তিনি বিষোদগার করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে। শাসনতন্ত্রে তিনি ব্যবস্থা রেখেছিলেন যে, রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চালালে তাদের শাস্তির জন্য যেন আইন প্রণয়ন করা হয়। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের কয়েকদিন আগে আইয়ুব এক নির্দেশের মাধ্যমে জানান, জাতীয় সংসদের সম্মতির ভিত্তিতে পুরনো রাজনৈতিক দলগুলি পুনরুজ্জীবন ও নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে। ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুবের এই মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী ভাষণে। তিনি ঘোষণা করেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাজনৈতিক দলসমূহ পছন্দ করেন না। কেননা, তাদের অনবরত আনুগত্য বদল সংসদীয় ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নষ্ট করে।[৫২] তা সত্ত্বেও দেখি, সামরিক শাসন প্রত্যাহারের এক মাসের মধ্যে সংসদে একটি বিল আনা হলো যার মূল কথা হলো–শর্তযুক্তভাবে রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবন করা যাবে। আইয়ুব যেভাবে তাঁর ক্ষমতা সংহত ও প্রয়োগ করতে চাচ্ছিলেন সে পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠলো। শুধু দল নয়, সে দলের অধিপতিও হতে হবে তাঁকে; সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থাকবে তাঁর সঙ্গে। আবার বন্ধনহীন

রাজনৈতিক দল তাঁর জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং আইয়ুবী আইনে বলা হল, এবডো বা নিরাপত্তা আইনে দণ্ডিত রাজনৈতিক দলের নেতারা রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, এবডোর এমন ধারাও ছিল, অর্থ বিলের বিরোধিতা করলে তাও গণ্য হবে অপরাধ হিসেবে।

১৯৬২-৬৩ সাল থেকেই আইয়ুব খান আবার মধ্যবর্তী পর্যায়ের কারক, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ছাত্র সমাজ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এই সময় প্রাথমিক কারকরা একবার মাত্র জোট বাঁধার সাহস দেখিয়ে আবার পিছু হটে গিয়েছিলেন।

১৯৬২ সালের ২৫ জুন নয়জন রাজনৈতিক নেতা এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার একমাত্র গণপ্রতিনিধিদের। আইয়ুব খান অবশ্য এ দাবী গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু এই বিবৃতি রাজনৈতিক মহলে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেয়ে নয় নেতার বিবৃতি সমর্থন করলেন। এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৫৪ জন নেতাকে নিয়ে দলহীন একটি জোট বাঁধলেন যার নাম দেয়া হলো "এনডিএফ" বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট)[৫৩] কিন্তু, তাঁদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেননি। আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের ঘোষণা দিলে জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী পুনরুজ্জীবিত করা হলো। আইয়ুব খান মুসলিম লীগ ভেঙ্গে সৃষ্টি করলেন কনভেনশন মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের বাকি অংশ পরিচিত হলো কাউন্সিল মুসলিম লীগ নামে যার সভাপতি হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভাসানী বরং আইয়ুব খানের প্রতি নমিত ব্যবহার করলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে মৃত্যুবরণ করলে পরের বছর ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করলেন। এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। এভাবে নেতারা নিজ নিজ দল নিয়ে মেতে উঠলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বিলুপ্ত হয় এবং যে যার পথ বেছে নেয়। যখন এনডিএফ হয়েছিল তখন সাধারণ মানুষরা উজ্জীবিত হয়েছিলেন। এর ভাঙ্গনেও তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন খানিকটা। এ সময় সিভিল সমাজ হয়তো সম্পূর্ণ পিছু হটে যেতো এ কারণে যদি না ছাত্ররা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখতো। রাজনৈতিক নেতাদের এহেন ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে আতাউর রহমান খান যে মন্তব্য করেছেন তা দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করছি এ কারণে যে তা প্রণিধানযোগ্য।–

"শহীদ সাহেবের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্বের দৈহিক মৌনতার প্রথম চোটেই তাঁর নিজের পার্টিসহ রাজনৈতিক দলসমূহ রিভাইভ হইয়া গিয়াছে--- এনডিএফ বলে পার্টির চেয়ে দেশ বড়, পার্টি সংস্থার আগে গণঐক্য চাই। পার্টি যাঁরা রিভাইভ করিয়াছেন তাঁহারা দেখাইয়াছেন তাঁদের কাছে দেশের চেয়ে পার্টি বড়।------ তারা (জনগণ) মনে করিয়াছিল, আমাদের জ্ঞানোদয়ের জন্য এটা (মার্শাল ল') দরকার ছিল। আশা করিয়াছিল, পাঁচ বছর মার্শাল ল'র বেত্রাঘাতে আমাদের শিক্ষা হইয়াছে। এবার আমরা সত্যিকার গণতন্ত্রীর মতো জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য অতীতের

তিক্ততা ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিব। যতদিন তা সফল না হয় দলাদলির নামও মুখে আনিব না।

কিন্তু জনগণ দেখিয়া তাজ্জব ও নিরাশ ও হতাশ হইয়াছে। আমাদের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আসে নাই। মার্শাল ল' উঠামাত্র পার্টি করিবার প্রথম সুযোগেই আমরা নেতৃত্ব লইয়া কামড়াকামড়ি শুরু করিয়াছি। গাছে কাঁঠাল ধরিবার অনেক আগেই আমরা শুধু গোঁফে তেল দিতে নয়, একে অন্যের গোঁফ ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়াছি....।"[৫৪]

১৯৬২-৬৩ সাল থেকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের বিক্ষোভ জোরদার হতে থাকে। ছাত্রদের মিটিং-মিছিল প্রতিরোধ করা হতে থাকে লাঠিচার্জ, গুলি অথবা শাসক আমলাচক্রের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের সাহায্যে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুবের মন্ত্রী খান এ সবুর রংপুরে একটি জনসভা করতে গেলে ছাত্ররা বাধা দেয়। খান এ সবুর তখন তাঁর গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেন ছাত্রদের ওপর। তারা ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছড়ি হাতে।

১৯৬২ সালের জুন মাসে আইয়ুব খান "পাকিস্তান পিনাল কোড (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬২" জারী করলেন। সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করলে এই আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্ররা এতে ক্ষুব্ধ হয়। ছাত্ররা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যখন আইয়ুব প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ অক্টোবর ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত আবদুল মোনায়েম খানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গভর্নর হয়ে মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ড. এম. ও. গনিকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের দমনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে একটি পেশাদার বাহিনী গঠন করেন যা পরিচিত হয়ে ওঠে এন. এস. এফ. (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রন্ট) নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের শুরু করে এই এন. এস. এফ.। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় এন. এস. এফ. সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর বার বার আক্রমণ করেও ছাত্র আন্দোলন দমাতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক কারকদের অনাগ্রহ ও সরকারি আক্রমণ উপেক্ষা করেও যে সিভিল সমাজ টিকে থাকতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ ১৯৬২ সালের ছাত্রদের আন্দোলন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আত্মসমালোচনা করে কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায় যা লিখেছিলেন তা যুক্তিযুক্ত। তিনি ঐ সময় লিখেছিলেন যে, "রাজনৈতিক নেতাদের" সমস্ত কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, "তাঁহারা আপোষমুখী, সংস্কারবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গণশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া উপরতলার ষড়যন্ত্র ও বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করাই তাঁহাদের চরিত্র। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, কিছুটা জন-জমায়েত অনুষ্ঠান করিয়া তাহার জোরে তাঁহারা আইয়ুব খানকে একটা আপোষে সম্মত করাইতে পারিবেন। কিন্তু ইহা যখন সম্ভব হইল না তখন তাঁহারা অনেকটা হতাশ হইয়া যান এবং ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন।....বস্তুত আন্দোলন গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং তাহাদের ঐক্যবিরোধী মনোভাবের দরুন আজ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। ছাত্র সমাজ তীব্র দমন নীতি অগ্রাহ্য করিয়া

১৯৬২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের দুর্বলতার জন্য সে আন্দোলনে আজ ভাটা আসিয়াছে।"[৫৫] আইয়ুব খান নিজের আত্মজীবনীতেও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে মোটামুটি একই ধরনের মূল্যায়ন করেছেন।

এ পরিস্থিতিতেও ছাত্ররাই এগিয়ে এলেন। ছাত্রদের আন্দোলনে প্রধান দল দু'টি ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সুসংবদ্ধ করার জন্য ১৯৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মধুর ক্যান্টিনে ছাত্র সংগঠনসমূহের এক যৌথ সভায় বাইশ দফা রচনা করা হয় এবং এর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা করে। বাইশ দফা ছিল মূলত শিক্ষার সমস্যাকেন্দ্রিক। এর প্রধান কয়েকটি দাবী ছিল বাংলা হবে শিক্ষার মাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন পুরোপুরি বাতিল করতে হবে, প্রশাসনিক ও সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে তা শতকরা পঁচিশ ভাগে আনতে হবে।[৫৬] ষাটের দশকে, ছাত্রনেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের কথাও চিন্তাভাবনা শুরু করেন বলে জানা গেছে এবং এ কারণে গোপন সেল ও সংগঠন করা হয়েছিল।[৫৭]

ইতোমধ্যে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে (৪-৫) আইয়ুব খানের দল কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পুনরুজ্জীবত করা হলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং একই বছর ৫ মার্চ পুনরুজ্জীবিত হলো আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক দলসমূহ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে শুরু হলো বিভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ সুযোগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটাধিকার সীমিত করে ১৭ এপ্রিল (১৯৬৪) আইয়ুব খান পাশ করালেন 'ইলেকটোরাল কলেজ বিল।'[৫৮] এ বিল অনুসারে ঠিক হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে। পরের বছরই ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা।

এ পরিপ্রেক্ষিতেও, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তথা সিভিল সমাজের পক্ষে ছাত্ররাই আবার উদ্যোগ নিলেন। ১১ মার্চ ১৯৬৪ সালে গঠিত হলো 'অল পার্টিজ অ্যাকশান কমিটি'। ১৫ মার্চ থেকে ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক কর্মীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবীতে মিছিল সমাবেশ শুরু করলো। সরকার তার চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে এদের দমনের জন্য গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিলো। গ্রেফতার চলতে থাকলো। তা সত্ত্বেও ১৯ মার্চ পালিত হলো হরতাল এবং হরতাল শেষে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল সমাবেশ।

রাজশাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে, সরকার এবং ছাত্রদের সম্পর্ক কতটা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ১৬ মার্চ ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন। সেখানে প্যান্ডেলে কালো পতাকা টাঙ্গানো হলো এবং ডিগ্রি হাতে ছাত্ররা আচার্য মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে লাগল। ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। কিন্তু ছাত্ররা আইয়ুব খানের 'দালাল' হিসেবে আখ্যায়িত মোনায়েম খান থেকে ডিগ্রি নিতে অস্বীকার করায় তা

বাতিল করা হয়। ১৯৬৪ সালে ২২ মার্চ আবার অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। মোনায়েম খান প্যান্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র আইয়ুব ও মোনায়েম বিরোধী স্লোগান দিতে লাগলেন ছাত্ররা। পুরো প্যান্ডেল জুড়ে পুলিশ ও ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মোনায়েম খানের পক্ষে ডিগ্রি প্রদান আর সম্ভব হলো না। সরকার ছাত্রকর্মীদের গ্রেফতার করা ছাড়াও ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করে এবং অনেকের ডিগ্রি কেড়ে নেয়। সরকারের দমননীতিতে ছাত্র আন্দোলন দমিত না হয়ে বরং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। *দৈনিক আজাদের* এক হিসেবে জানা যায়, ঐ পূর্ব পাকিস্তানে ৭৪টি কলেজ ও ১৪০০ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়।[৫৯] গ্রেফতার করা হয় ১২০০ জনকে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম প্রদত্ত উপাত্তে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২২ জুনের মধ্যে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১ জন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার করা হয়েছিল।[৬০]

শুধু ছাত্রদের ওপর নয়, সংবাদপত্রের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। জামানত তলব করা হয় *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *আজাদের*। প্রতিবাদে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি শূন্যভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ছাত্র বহিষ্কারের বিরুদ্ধে ছাত্ররা হাইকোর্টে রিট করেন। এ সময়, সিভিল বা নাগরিক সমাজের পক্ষে এগিয়ে আসে হাইকোর্ট। বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ৮ জুলাই এক রায়ে প্রধান বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের বহিষ্কারের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করেন। ছাত্ররা রায়ের পর বিজয় মিছিল বের করলে পুলিশ আবার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ছাত্র ও রাজনীতিবিদরা বা প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী কারকরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হবে।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সম্মিলিত বিরোধী দলের বা 'কপ' (কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি) প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে শহর থেকে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করেছেন। সাধারণ মানুষ ছাত্রদের এ কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৯৯.৬২ ভাগ। আইয়ুব খান বিজয়ী হয়েছিলেন ৬৩ ভাগ পেয়ে আর ফাতেমা জিন্নাহ পেয়েছিলেন ৩৬ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মধ্যে ১৩টিতে জিতেছিলেন আইয়ুব খান। এতদসত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, আইয়ুবের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রবল চাপ থাকা সত্ত্বেও ৪৬.৬০ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী এখানে আইয়ুবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল ২৬.০৭ ভাগ। মৌলিক গণতন্ত্রীর তাদের এতসব সুযোগ -সুবিধা হাতছাড়া করে আইয়ুব খানকে ভোট দেবেন এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ, ফাতেমা জিন্নাহ্ জিতলে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মৌলিক গণতন্ত্র থাকবে না। তবুও, আইয়ুববিরোধী ভোটের সংখ্যা অর্ধেক হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের

সিভিল সমাজ হটে যায়নি। মধ্যবর্তী কারক বা ছাত্রদের কৃতিত্ব এই যে, তারা আইয়ুববিরোধী নির্বাচনী প্রচারণা ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের বিষয়টি এক করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে, এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে পরিচিত রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানীর নিশ্চুপ থাকা তুলে ধরেছে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক সমাজের দুর্বলতা।

ন্যাপ পুনরুজ্জীবনের আগেই ভাসানী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী করছিলেন। তিনি এমন হুমকিও দিয়েছিলেন যে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালের মধ্যে তাঁর দাবী পূরণ না হলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। কিন্তু একই সঙ্গে আইয়ুবের সঙ্গে একটি সমঝোতায়ও পৌঁছুতে চাচ্ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২২ আগস্ট রাওয়ালপিণ্ডিতে ভাসানী দেখা করলেন আইয়ুব খানের সঙ্গে। ২৯ সেপ্টেম্বর ভাসানীকে চীন সফরকারী একটি প্রতিনিধিদলের নেতা মনোনয়ন করা হয়। হঠাৎ আইন অমান্য আন্দোলনের কথা তিনি ভুলে গেলেন, যদিও তাঁর আসল উদ্দেশ্য কি তা কেউ কখনও অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু, এটা পরিষ্কার যে, আইয়ুবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নির্বাচনে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোট ফাতেমা জিন্নাহ্‌র খানিকটা কম পাওয়ার এটিও একটি কারণ। ছয় দফারও বিরোধিতা করেছিলেন ভাসানী যা পরবর্তীতে আলোচ্য।

ইতোমধ্যে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় এবং পাকিস্তান পরাজিত হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হয় তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তান একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং ভারতীয় বাহিনী ইচ্ছা করলে বিনা আয়াসেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারতো। পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের এহেন অবহেলা তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল বাঙালিদের মনে। এ পটভূমিকায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নেজাম-ই-ইসলামী নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে বিরোধী দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব। সেখানে তিনি ছয় দফা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে বাধা আসে। শেখ মুজিব বৈঠক ত্যাগ করে ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছয় দফা ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাও এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। ফলে, ছয় দফা নিয়ে আওয়ামী লীগেও অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক সমাজকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ছয় দফা এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো কাজ করেছিলো। আওয়ামী লীগের প্রবীণ কিছু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করলেও তরুণরা তা লুফে নেয়। পোস্টারে লেখা হতে থাকে 'বাঙালীর দাবী ৬ দফা', 'বাঁচার দাবী ৬ দফা।' স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ভিত্তি ছয় দফা আন্দোলন। ছয় দফা বহুদিন পর বাঙালিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং সে কারণে দেখি ক্রমেই শেখ মুজিব সবাইকে ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায়।

মার্চ, ১৯৬৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুটি পুস্তিকা ছয় দফাকে ভিত্তি প্রদান করে। একটি শেখ মুজিবুর রহমান রচিত "আমাদের বাঁচবার দাবী'। অন্যটির নাম

'পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য' (ছাত্রলীগ কর্তৃক প্রকাশিত), লেখক আবুল কালাম আজাদ।[৬১]

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখেছেন–

"ভারতের সাথে বিগত সতেরো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নূতনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই অখণ্ডিত জরুরি অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে। এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দু'টি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতেহারটির লক্ষ্য তা-ই।" এক কথায় ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী।[৬২]

২০ মার্চ (১৯৬৬) পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ছয়দফার রূপরেখা বর্ণনা করে বলেন,-"৬ দফা নতুন কিছু নয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবী আমরা জানিয়ে আসছি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। প্রদেশের জন্য অধিকতর ক্ষমতা কেন্দ্রকে দুর্বল করে ফেলবে–একথা যাঁরা বলেন, তাঁরাই আসলে পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। পাকিস্তান সেদিনই উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যেদিন উভয় অংশ সমান শক্তিশালী এবং উন্নত হবে।.....আমরা সবদিকে দিয়েই অরক্ষিত।.....পাটাচাষিরা তাদের পাটের ন্যায্যমূল্য পায় না।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে কি আয় হচ্ছে, আমরা সঠিকভাবে সেটাও জানি না। আমরা এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে, পাকিস্তানের উন্নতি বলতে বোঝায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি নয়। আমাদের ভাষার ওপর কেন হামলা হয়েছিল? হয়েছিল বাঙালি জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। বর্তমানে বাংলা ভাষা উর্দু হরফে কিংবা আরবি হরফে লেখার ষড়যন্ত্র হচ্ছে কেন তাও আমরা জানি।...বাঙালি জাতির অস্তিত্বের জন্যই আমরা ৬ দফা প্রণয়ন করেছি।....ভাবতে চেষ্টা করুন বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে আমরা কেমন ছিলাম, আমরা পুরোপুরি অরক্ষিত এবং অসহায় ছিলাম।...আমি নিশ্চিত ৬ দফা বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রাণের দাবী হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।...বাঙালি আজ সচেতন জাতি। মার খেয়ে খেয়ে ধারালো হয়ে উঠেছে...আন্দোলন চায়...৬ দফা আন্দোলনই এখন থেকে বাঙালির একমাত্র আন্দোলন।"[৬৩]

এরপরই সরকার খড়গহস্ত হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের ওপর। শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। কিন্তু শেখ মুজিবের কথাই সত্য হয়ে ওঠে। বাঙালি সিভিল সমাজের একমাত্র আন্দোলন হয়ে ওঠে ৬ দফা আন্দোলন।

শেখ মুজিব যখন ছয় দফার কথা ঘোষণা করেন তখনই ভাসানীর আইয়ুবী ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ভাসানীকে সমর্থন জানান ছাত্র

ইউনিয়নের চীনাপন্থী গ্রুপের নেতা রাশেদ খান মেনন। এই গ্রুপ এমনকি আইয়ুব খানকে প্রগতিশীল মনে করতেন যেহেতু তিনি চীনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ৭ জুন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের আহবানে ছয় দফার পক্ষে হরতাল ডাকা হয়। সেদিন তেজগাঁ শিল্পাঞ্চল ও নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। উল্লেখ্য যে, এ দু'অঞ্চলে ছয় দফার জন্য প্রান্তিক পর্যায়ের যারা অর্থাৎ শ্রমিকরা এগিয়ে এসেছিলেন। পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও একজন ও নারায়ণগঞ্জে ছয়জন নিহত হন। সমস্ত শহর উত্তাল হয়ে ওঠে। তখনও ভাসানী ৭ জুনের হরতালকে সিআইএর ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপও এর বিরোধিতা করে।

পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি যে তখনও বিদ্যমান এর প্রমাণ সংবাদপত্র। অধিকাংশ সংবাদপত্র সিভিল সমাজের পক্ষেই থাকতে চেয়েছে এবং 'ইত্তেফাক' 'আজাদ' ও 'সংবাদ' ষাটের দশক থেকেই সিভিল সমাজের পক্ষে সোচ্চার ছিল। এসব কাগজে স্বৈরাচারবিরোধী সংবাদসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য জারী করা হয় 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স।' ১৯৬৪ সালের মার্চে ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশের জন্য এই তিনটি পত্রিকা থেকে ২৫ হাজার টাকা জামানত দাবী করা হয়। 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' তাদের সাহস শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রেখেছিল। বিশেষ করে মানিক মিয়া সম্পাদিত 'ইত্তেফাক' হয়ে ওঠে ছয় দফার প্রবক্তা। সেই সময় থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে 'ইত্তেফাক' সবচেয়ে কাছের পত্রিকা। কারণ, সিভিল সমাজের স্বপ্নগুলি প্রতিফলিত হতো ইত্তেফাকে। ১৫ জুন সরকার 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ করে, নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। সম্পাদক মানিক মিয়াকেও গ্রেফতার করা হয়।

৭ জুন মানুষ রাস্তায় নেমে আসার একটি কারণ ৭ মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার। আইয়ুব সরকার ঘোষণা করলো, পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছেন শেখ মুজিব। কিন্তু এর মাঝে আবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সিভিল সমাজের দুর্বলতার। ৭ জুন সাধারণ মানুষ যখন পল্টনে যাচ্ছিলেন জনসভার জন্য তখন জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নেতৃস্থানীয় কোনও আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন না। তবে, এ কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। আগস্টের মধ্যে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ২৩ জনের মধ্যে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৬৪]

রাজনৈতিক ফ্রন্টের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা পূর্ব বঙ্গবাসীর বাঙালিবোধকে তীব্র ও সংহত করে তোলে এবং এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সব সময় একটি আদর্শগত লড়াই চলেছে। গত ৪৬ বছরে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় ছিল যে সব সরকার তারা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সিভিল সমাজকে দমিত করতে চেয়েছে। অন্যদিকে, মধ্যবর্তী কারকরা সব সময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে যাতে সায় দিয়েছে সাধারণ মানুষ। এ লড়াইয়ে প্রগতির ধারা জয়ী হয়েছে এবং বাঙালিবোধকে সব সময় বাঁচিয়ে রেখে রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

১৯৬৫ সালে, পাক-ভারত যুদ্ধের সময়, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মনে যে ভারতবিরোধী একটি মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। বহুদিন পর, দু'অঞ্চলের মধ্যে আবার সংহতিবোধ জেগে উঠেছিল। সৃষ্টিশীল সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সংবাদপত্রে–সর্বক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এতে সায় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রেডিও পালন করেছিল এক বিশেষ ভূমিকা। এই পাকিস্তানি বোধকে সরকার জাগ্রত রাখতে চেয়েছিলেন যার মূলকথা ছিল–

"ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের আকাঙ্খাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূলকথা।"[৬৫]

সরকার অতি উৎসাহী হয়ে এরপর যে মনোভাব প্রদর্শন করে তার সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির প্রতি যে মনোভাব দেখানো হয়েছিল তার সঙ্গে তেমন তফাত ছিল না, ফলে, সিভিল সমাজ আবার প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি সরকারি মনোভাবের কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গন আবার হয়ে ওঠে তপ্ত।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে বাজেট অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। মুসলিম লীগের খান এ সবুর কথা প্রসঙ্গে ১লা বৈশাখ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনকে বিদেশী (অর্থাৎ ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু) সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বলে উল্লেখ করেন। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার রেডিও থেকে প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। খাজা শাহাবুদ্দিনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বুদ্ধিজীবী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এদের মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে *দৈনিক আজাদ* -এ-

"রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল"[৬৬]

সংসদে বিতর্ক ও খাজা শাহাবুদ্দিনের মন্তব্য সৃষ্টি করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। ১৯৬৫ সালে যে পাকিস্তানি ভাব জেগেছিল তা উবে যায়। ঢাকার দু'টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ক্রান্তি' ও 'অপূর্ব সংসদ' সূচনা করে আন্দোলনের।[৬৭] এবং তা পরিব্যাপ্ত হয়। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় ঘটা করে। "অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল অদৃষ্টপূর্ব।"

একই সময়, বাংলা ভাষা সংস্কার করে "জাতীয় ভাষা" প্রচারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শাসকদের এ ধরনের মনোভাব চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং এখনও তা বলবৎ। যেমন–কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এক ভাষণে বলেছেন, বাংলাদেশী ভাষা সৃষ্টি করতে হবে। এ যেন এক নিয়তিবাদী চক্র। এটি অবশ্য একটি বিষয় প্রমাণ করে, তাহলো পাকিস্তান আমলে শাসক গোষ্ঠী যেমন মুসলমানত্ব বা ধর্মকে ব্যবহার করে অখণ্ডতা ও প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের পরও সেই মনোভাব দূর হয়নি। এ ধারা এখনও বহমান।

১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল। আইয়ুব খানও এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যার মূল কথা, "সকল

আঞ্চলিক ভাষা একত্রিত করে যৌথভাবে একটি মহান পাকিস্তানি ভাষা উদ্ভাবন"[৬৮] করা। এবারও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবীসহ অন্যান্যরা প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। সিভিল সমাজের প্রতিবাদে এবারও পিছু হটে যায় সরকার। এ পটভূমিতে ১৯৬৮ সালে, লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ, মীর্জা গালিব, ইকবাল, মাইকেল মধুসূধন ও কাজী নজরুলের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আবুল হাশিম বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন-"যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানি আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। তাঁহারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধীতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।"[৬৯]

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্যবর্তী কারকরা, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের প্রতিবাদী ভূমিকার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। সিভিল সমাজের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিয়ে তাকে পিছু হটে যাওয়া থেকে তারা প্রতিরোধ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের দুটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছে-কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে। প্রাথমিক কারক থেকে এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভূমিকা কম নয়। এ পর্বে একটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী কারকরা আন্দোলনের সময় উভয়ে পরস্পরকে একই সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে একইভাবে অগ্রসর হয়েছে। এবং এ কারণেই বোধহয় সম্ভব হয়েছে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের।

১৯৬৭ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮-১৯৬৮-আইয়ুব খানের শাসনামলকে "উন্নয়ন দশক" বা "ডিকেড অফ ডেভেলপমেন্ট" হিসেবে পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় এক নজিরবিহীন প্রচারণা। এ প্রচারের মাধ্যমে এ ধারণাই সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয় যে, আইয়ুব খানের সময় পাকিস্তান ও বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এবং তাঁকে হটানো মুশকিল। খুব সম্ভব, আইয়ুব খান ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এ প্রচারণা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। দুটি ঘটনা এর ভিত্তি স্থাপন করে। পূর্ব পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে লান্ডিকোটালে চোরাকারবারী পণ্য নিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ।

১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি সংবাদপত্রে "পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র" সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হল, জানানো হলো এ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৮ জনকে। গ্রেফতারের সংখ্যা পরবর্তীতে দাঁড়ায় ৩৫ জনে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত এ মামলার মূল বক্তব্য ছিল, ভারতীয় সাহায্যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কিছু কর্মচারী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে তিনজন ছিলেন সিএসপি অফিসার, সামরিক বাহিনীর নিম্নপদস্থ কিছু কর্মচারী ও অন্যান্য পেশার কয়েকজন। গ্রেফতারকৃতদের প্রথম তালিকায় শেখ মুজিবের নাম ছিল না। তাঁকে পরবর্তীকালে প্রধান আসামী করা হয়। এ

ষড়যন্ত্র মামলার খবর প্রথমে বাঙালিদের বিমূঢ় করেছিল। স্পষ্টত তারা এটি বিশ্বাস করেনি। বরং এ বিশ্বাসই দৃঢ়ভূত হয়েছে যে, যেহেতু ছয় দফা কর্মসূচি বা স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে সেহেতু শেখ মুজিব ও বাঙালিদের দমনের জন্যই এ মামলা রুজু করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, সিভিল সমাজ নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যখন সংহত হচ্ছে তখন এটি ছিল সিভিল সমাজের প্রতি আক্রমণ যাতে সিভিল সমাজ পিছু হটে যায়।[৭০]

পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো অভিযুক্তদের বিচারের জন্য। সরকার ভেবেছিল, এ ধরনের মামলায় শেখ মুজিবের ইমেজ বা জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। কিন্তু ভুল হয়েছিল সরকারী হিসেবে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন তাঁর জবানবন্দিতে-

"কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।"[৭১]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বরং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্রনেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয় দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরও কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তপ্ত করে তোলে। মওলানা ভাসানী হরতালের আহ্বান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও কর্মসূচি' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু এ চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচী।[৭২] ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুববিরোধী এ মোর্চার নাম দেয়া হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' বা 'ডাক'।

ন্যাপ ভাসানী ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। 'ডাক' ও ঘোষণা দেয় ৮ দফার। তারা দেশে "(ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল (ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দি,

রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার (চ) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (জ) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ... দাবি করেন।"[৭৩] মওলানা ভাসানী ১৪ জানুয়ারি হাতিরদিয়ায় এক সভায় ঘোষণা করেন "জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।"

১৭ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের ওপর। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশী নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় সরকারি ছাত্রদল এন.এস.এফ. দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০ জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আসাদের শহীদ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পালটে যায়। বিকালে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল।[৭৪] লিখলেন কবি শামসুর রাহমান–

> "আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিনই মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কি করতে পারে তার উদাহরণ ২৪ মার্চ। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র মতিয়ুর, শ্রমিক রুস্তম। তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ুরের বাবা সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন "এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুর পেয়েছি।" পরদিনও ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব ও গুলিবর্ষণে এক মহিলা নিহত হন।

আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দীদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। তাঁর কুশপুত্তলিকা ও বই পোড়ানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দিদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খাঁরও পদত্যাগ দাবী করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু স্থানের নামকরণে। আইয়ুব নগরের নাম হয়ে যায় শেরে বাংলানগর, আইয়ুব গেটের

নাম রাখা হয় আসাদগেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নামকরণ করা হয় মতিয়ুর শিশুপার্ক।

১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে 'ডাক' ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে। সে মুহূর্তে নতুন এক স্লোগানের জন্ম নেয়, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস, এ, রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে। সন্ধ্যায় জারী করা হয় কার্ফ্যু।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কার্ফ্যু ভেঙ্গে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। সরকারি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দিদেরও। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। লক্ষ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ১১ দফা তিনি সমর্থন করেন কারণ এর মধ্যে অন্তর্গত ৬ দফাও। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানেও। লান্ডিকোটাল থেকে কিছু ছাত্র চোরাপথে আনীত কিছু পণ্য কিনে ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে জুলফিকার আলী ভুট্টো দৃশ্যপটে আসেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের মতো একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে, তা পূর্ব পাকিস্তানের মাত্রায় পৌছেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, উনসত্তরের ঘটনাবলী বা উনসত্তরের গণআন্দোলন নামে খ্যাত তা শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা গ্রহণ করেছিল সহিংস রূপ। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মত এর বিপক্ষে ছিল। মুক্তি পাবার পর শেখ মুজিবকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব সম্মত হলেন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। এবং 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে বসলেন। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে এতে যোগ দেননি। অন্তিমে

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ঢাকা ফিরে এসে ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পেলে তিনি ৬ দফা আদায় করে আসতে পারতেন। তা পারেননি বলেই বৈঠক ত্যাগ করেছেন। অসহযোগী যে কজন নেতাকে তিনি কুচক্রী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন–হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, ফরিদ আহমদ ও মাহমুদ আলী।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মোনায়েম খানের অপসারণের দাবীতে হরতাল আহবান করা হয়। ২১ মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর আগের রাতে সপরিবারে মোনায়েম খান পালিয়ে যান। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারী করা হয় সামরিক আইন।[৭৬]

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজের সফল উত্থান হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবী শাসন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ মাঝে মাঝে পিছু হটেছে বটে কিন্তু পর্যুদস্ত হয়নি। প্রাথমিক কারকরা প্রথম পর্যায়ে দোদুল্যমানতা, ভয় ও স্বার্থদ্বন্দ্বে মনপ্রাণ দিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হননি। কিন্তু বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে যা প্রবাহিত হয় ফল্গুধারার মতো। এ ফল্গুধারার উৎস মধ্যবর্তী কারকের অগ্রসরমান অংশ সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা যারা সব সময় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং কখনও পিছু হটেনি। গোটা উনসত্তরের আন্দোলন ছাত্ররাই সংগঠন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্য করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে। অন্তিমে, মধ্যবর্তী কারক ও প্রান্তিক কারকদের চাপে পড়ে রাজনৈতিক নেতারা তাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা বা বাংলাদেশ গঠনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ভার যাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান যিনি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠলেন বাংলার বন্ধু বা 'বঙ্গবন্ধু' নামে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের প্রতীক হয়ে উঠলেন তিনি।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কতজন আত্মহুতি দিয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ হান্নান বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এই এক দশকে নিহত হয়েছেন ১২১ জন। এবং এর মধ্যে ৬৯ সালেই ৬১জন। ৬১ জনের পেশাওয়ারী ভাগ এ রকম -

শ্রমিক	২৯	চাকুরিজীবী	৩
ছাত্র	২১	সৈনিক	১
কৃষক	৩	গৃহবধূ	১
শিক্ষক	২	অজ্ঞাত	৭৬

লক্ষণীয় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রান্তিক কারকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অনেক সময় তা সহিংস রূপ ধারণ করেছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের ভীত ধ্বংস করার জন্য ছাত্রনেতারা আন্দোলনের সময় মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে, অনেক জায়গায় মৌলিক গণতন্ত্রীরা পদত্যাগে রাজি না হলে মানুষ তাদের

বাধ্য করেছিল পদত্যাগ করতে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সুনজরে দেখার কোনো কারণ ছিল না। অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজনৈতিক শক্তিরও অধিকারী হয়েছিল। এবং এ দুটির মিলিত শিকার ছিল বঞ্চিত গ্রামবাসীরা। এ ছাড়া, চোর, ডাকাত, গরুচোর, টাউট এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের দালালদের অনেক ক্ষেত্রে গণআদালতে বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে, স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি এ সুযোগে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লুটপাটে অংশ নিচ্ছিল। ছাত্র বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল ঘটনাবলী এবং এতে তারা হয়ে উঠেছিলেন উদ্বিগ্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রায় দশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা ছিল ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্র।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সূচনা ছাত্ররা করলেও মওলানা ভাসানী ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি ছিলেন আইয়ুবের প্রচ্ছন্ন সমর্থক। হয়তো তাঁর ধারণা হয়েছিল, চীনের সঙ্গে আইয়ুব খান বন্ধুত্ব করছেন, সুতরাং হয়তো পাকিস্তানেও সমাজতন্ত্রের উপাদানবলীর ওপর গুরুত্ব দেবেন। ১৯৬৯ সালেই এ ধারণা তিনি পাল্টে ফেললেন এমনকি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানেরও বিরোধিতা করলেন। মফস্বলে মওলানা ভাসানী ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যা আন্দোলনকে এক ধরনের বিপ্লবী ভাব দিয়েছিল। 'ঘেরাও'র অর্থ দাবী আদায়ের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা ভূস্বামীর বাসগৃহ ঘেরাও এবং তাকে দাবী মানতে বাধ্য করা। ভাসানী সব সময় সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের কথা বলতেন, কিন্তু ঐ ধরনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা, বৈপ্লবিক সুসংগঠিত সংগঠন ও নীতি লাগে, লাগে স্থিরতা ও স্থৈর্য্য তা তাঁর ছিল না। ফলে, ঘেরাও হয়ে দাঁড়ালো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করার হাতিয়ার যা এক সময় ভাসানীর নিয়ন্ত্রণেও রইলো না। আর ভাসানীর সমাজতন্ত্র ছিল ইসলামী সমাজতন্ত্র। ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ মিশ্রণ হলে সমাজতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভাসানীর সারাটা রাজনৈতিক জীবন এ রকম বৈপরীত্যে ভরা। ১৯৫৬ সালের দিকেই ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। আবার ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরোধিতা করেছিলেন যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবী। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান যখন সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন তখন ভাসানী নির্বাচনে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন। হয়তো ভোটের থেকে সে মুহূর্তে তাঁর কাছে ভাতের দাবী বড় মনে হয়েছিল বা সংসদীয় শান্তির বদলে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চেয়েছিলেন। এ দিক বিবেচনা করলে ভাসানীর মধ্যে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতার দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতীকের মতো। সেগুলি হলো-প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকের দোদুল্যমানতা, বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা। ভাসানী তাঁর এই বৈপরীত্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ন্যাপের ছাত্র সংগঠনে যা ১৯৭০ সালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছাত্রলীগ। জাতীয়তাবাদী ধারা বেগবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং ১৯৭০ সাল থেকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা শুরু করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে তখন, যখন সমাজের তিনটি পর্যায়ের দাবী ও ক্ষোভ একই মোহনায় মিশেছে। এবং এতে মধ্যবর্তী কারকরা, বিশেষ করে ছাত্ররা পালন করেছে সংযোগকারীর ভূমিকা। তবে, প্রান্তিক পর্যায়কে আন্দোলনে সংযুক্ত না করা পর্যন্ত সিভিল সমাজের স্বপ্ন সে ভাবে পূরণ হয়নি। বাংলাদেশে এখনও যখন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা ওঠে, তখনই সবার মনে ভেসে ওঠে উনসত্তরের গণআন্দোলনের কথা।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে জারী করেন সামরিক আইন। এবং ২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন-জনপ্রিতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে নির্বাচন ছিল প্রথম। শুধু তাই নয়, তিনি অধিকতর স্বায়ত্তশাসনেরও প্রতিশ্রুতি দেন।[৭৭]

ইয়াহিয়া খানের এই বক্তৃতায় রাজনৈতিক নেতারা সন্তুষ্ট হলেও ছাত্ররা হয়নি। লক্ষণীয় যে, এই বক্তৃতার পরপরই ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়। তাঁরা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে যা বলছেন তাতে "এই সকল প্রশ্নে গণসংগ্রাম ও গণতন্ত্রকামী স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের বিজয় সূচিত হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।" কিন্তু "জনগণের দাবী হইল এই যে, দেশ হইতে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হউক এবং পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হউক। একই সঙ্গে বিনা বিচারে আটক দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ জননেতা মণি সিংহ সহ সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হউক এবং রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা সামরিক আইনের মামলা, ঘোষিত সাজা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক।" ছাত্ররা মূল বিষয়টি ঠিকই অনুধাবন করেছিল। সামরিক শাসনই যদি থাকে তাহলে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে কিভাবে? বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছয়জন স্বাক্ষরিত এই প্রতিবাদলিপিতে সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়–"কাজেই আমরা জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আহবান জানাইতেছি যে, দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও উগ্র দক্ষিণ এবং উগ্রবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হউন এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বর্তমানে অগ্রসর করিবার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ শাসন উচ্ছেদ করুন।"[৭৮]

মার্চ মাসের ৩০ তারিখে ইয়াহিয়া "শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো" বা "লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার, ১৯৭০" ঘোষণা করলেন।[৭৯] এই কাঠামোর আওতায় নির্বাচন ও সংসদ গঠিত হওয়ার কথা। এবং এ কাঠামো যে গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল তা বলাই বাহুল্য। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ছাত্ররাই নয়, রাজনৈতিক নেতারাও এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে এটি "জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা বানচালের" প্রচেষ্টা।[৮০] মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, "এই নির্দেশ মানলে শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোনো কথা বলার অধিকার

থাকবে না।"[৮১] ছাত্ররাও তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ জানালো। ছাত্রলীগ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলো-"দীর্ঘ বারো বছরের আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সরকারের মূল উচ্ছেদ করিয়া সারা দেশে যে মুহূর্তে শর্তবিহীন নিরংকুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবার সমান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল গত ২৮শে মার্চের ইয়াহিয়ার ভাষণ ও ৩০ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়ার ঘোষিত "শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো" ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় জনজীবনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে যে-"তাহা হইলে বাংলার ও বাঙালিদের কি দশা হইবে।" ছাত্র ইউনিয়নও একই বক্তব্য রাখে। এখানে উল্লেখ্য যে, দুটি ছাত্র সংগঠনই সামরিক আইন বাতিলের দাবী জানায়। দাবী জানায় ১১ দফা প্রতিষ্ঠার। ছাত্রলীগ ৭ ও ছাত্র ইউনিয়ন ১৩ এপ্রিল দাবী দিবস ঘোষণা করে।[৮২] রাজনৈতিক নেতারা "শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো"র প্রতিবাদ জানালেও নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ২৮ জুলাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আহবান জানান।

আওয়ামী লীগ সত্তর সালের গোড়াতেই এককভাবে এবং ছয়দফার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নেয়। কারণ, গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে কেউ সমর্থন জানাননি। বিভাগীয় কর্মীদের এক সভায় শেখ মুজিব বলেছিলেন-"আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। এই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্মান জড়িত। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই পালন করতে হবে।"[৮৩]

১৯৭০ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সে এক বিশাল জনসভার মাধ্যমে শেখ মুজিব নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন।[৮৪] এ সময় জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক দিক থেকে আওয়ামী লীগই ছিল অগ্রগামী। শেখ মুজিবের ওজস্বিনী বক্তৃতা ও দৃঢ়তা ক্রমেই তাঁকে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের একচ্ছত্র নায়ক করে তুললো। কিন্তু, এ পরিপ্রেক্ষিতেই আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতার আরেক দিক। প্রায়, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল শেখ মুজিবের সমালোচনা শুরু করেন। সংবাদপত্রের একাংশও একই ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিবই হচ্ছেন রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার মুখ্য রাজনৈতিক কারক। এক অর্থে সিভিল সমাজ ও শেখ মুজিব সমার্থক হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে ৮ জুন এক বক্তৃতায় তিনি প্রথম উচ্চারণ করেন "জয়বাংলা"। এই "জয়বাংলা" ধ্বনি পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি বা বাংলাদেশের সমার্থক। নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে ভয়ংকর এক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। অনেকেই নির্বাচন পিছানোর দাবী জানান। নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয় ডিসেম্বর মাসে। ১২ নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসে মারা যায় দশ লক্ষ মানুষ। সারা পৃথিবী সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নামমাত্র সফর করে যান। কেন্দ্রীয় কোন মন্ত্রীও তখন এসে দাঁড়ায়নি ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত দুর্গতদের পাশে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচণ্ড অবহেলা বাঙালি মাত্রকেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই ক্ষোভ এক হিসেবে বলা যেতে পারে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। কারণ, বাংলাদেশ যে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মওলানা ভাসানী এ সময় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার আন্দোলনের আহবান জানান। এক প্রচারপত্রে তিনি "পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ার" আহবান জানান। তিনি ঘোষণা করেন-" আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন : আমরা সাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল এবং শৃংখলমুক্ত হইতে চাই।" এ প্রচারপত্রে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" এর বদলে ঘোষণা করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ"।[৮৫] এ সময় পল্টনে এক জনসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের লক্ষ করে তিনি তার বিখ্যাত উক্তি করেন-"ওরা কেউ আসেনি।" শামসুর রাহমান রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবি'—

"বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তার হাত বার বার,
অতিদ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয়, মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।"

৪ ডিসেম্বর পল্টনের এক বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা দেন-"স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ"।[৮৬] শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন-"মুজিব তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর' ৭০ সালে অনিবার্য।"[৮৭]

অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারপত্রে শেখ মুজিব আবেগময় ভাষায় ঘোষণা করেন-

"কোনও নেতা নয়, কোনও দলপতি নয়, আপনারা-বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম জহুর, দোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাইনি, জীবনে কোনোদিন ভুলবো না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেইমানী করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।"[৮৮]

৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৩টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ১৫১ টি আসনে। ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার ৯টি আসনে নির্বাচন হয়। আওয়ামী লীগ ৯টি আসনেই জয়ী হয়। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩১০ টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ২৯৮ টিতে। এ ধরনের নিরংকুশ বিজয় শাসকদের হতবাক করে দেয়। বাঙালিরা রায় জানায় আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি।[৮৯]

সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাঙালিদের একতা ও সাহস অভূতপূর্ব। বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে এই অতীতে প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা প্রায় ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতার শিকার হতেন। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ, যিনি নিজেও ছিলেন এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রথম সারির কারক, তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য—

"...বহুদিন ধরিয়া রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ভোটারদের সাধারণ ও কমন অভিযোগ ছিল এই যে, নির্বাচনের আগে নির্বাচন-প্রার্থী নেতারা যা বলেন, নির্বাচনের পরে তাঁরা তা ভুলিয়া যান। এক কথায় তাঁরা নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করেন। ভোটারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও তঞ্চকতা করেন।"[৯০]

তা সত্ত্বেও ভোটাররা শেখ মুজিবকে বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ, আবুল মনসুরের ভাষায়, শেখ মুজিব দু'দিক থেকে এই দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। "প্রথমত, নির্বাচনের আগে তিনি ছয় দফাকে সাধারণ ওয়াদা না বলিয়া রেফারেন্ডাম বলিলেন। তাঁর কথার তাৎপর্য ছিল এই যে, হয় তাঁর পক্ষে "হাঁ" বলিবেন, নয় 'না' বলিবেন। শুধু নির্বাচনে নয়, তিনি রেফারেন্ডামেও জিতিলেন। শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের একক মুখপাত্র হইলেন।" ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারিতে তৎকালীন রমনা রেসকোর্সে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ালেন এবং ঘোষণা করলেন-"ছয় দফা নির্বাচনী ওয়াদা আপনাদের নিকট আমাদের দেওয়া পবিত্র ওয়াদা। এ ওয়াদা যদি আমরা খেলাফ করি, তবে আপনারা আমাদের ক্ষমা করিবেন না।....আমি নিজেও যদি এই ওয়াদা খেলাফ করি, তবে আপনারা আমাদের ক্ষমা করিবেন না।.....আমি নিজেও যদি এই ওয়াদা খেলাফ করি, তবে আপনারা নিজ হাতে আমাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবেন।" আবুল মনসুর আহমদের এ পর্যবেক্ষণ যুক্তিযুক্ত যে, শেখ মুজিব এ শপথ করিয়েছিলেন এ কারণে, যাতে কেউ কোনও প্রলোভন পড়ে দলত্যাগ না করেন।[৯১]

এ ঘটনার পর বাঙালি তার বিশ্বাস অর্পণ করেছিল শেখ মুজিবের কাছে। লক্ষণীয় যে, সিভিল সমাজ আশ্বাস পেয়েছিল যে এই নেতা বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না। এবং সিভিল সমাজের বিশ্বাস যদি দৃঢ়মূল হয় তা'হলে সে তার নেতার জন্য কী করতে পারে পরবর্তী ঘটনাবলি তার প্রমাণ। নির্বাচনী ফলাফল ছিল ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের কাছে অপ্রত্যাশিত। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ইয়াহিয়া দিয়েছিলেন বটে কিন্তু বোধহয় ভেবেছিলেন, কোনও একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সেক্ষেত্রে শাসক আমলাচক্রের প্রধান হিসাবে একটি দলকে খেলাতে পারবেন আরেকটি দলের বিরুদ্ধে, যেমনটি গোলাম মহম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জা করেছিলেন ১৯৫৮ সালের আগে। আওয়ামী লীগ যে শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো তাই নয়, ঐ সময় আওয়ামী এমপিদের ঐক্যও ছিল দৃঢ়। এবং তা পার্থক্য সূচিত করেছিল প্রাক ১৯৫৮ পর্বের সঙ্গে। ঐ পর্বে এই ঐক্য ছিল না দেখেই আমলাচক্র ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এবং বোধহয় এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফল নস্যাতের জন্য সামরিক সমাধান বেছে নেয়। কিন্তু, পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রেরণের জন্য প্রয়োজন ছিল সময়ের।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩রা মার্চ। কিন্তু ১ মার্চ ১৯৭১ সালে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য।[৯২] এবং এ কারণে শুরু হলো অহিংস আন্দোলন যা আধুনিক ইতিহাসে বলা যেতে পারে অভূতপূর্ব। এ আন্দোলন তুলে ধরেছে এ অঞ্চলের সিভিল সমাজের অভূতপূর্ব সাহস,

প্রয়োজনে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকদের একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা। এবং এ আন্দোলন আরও তুলে ধরেছে সিভিল সমাজের অগ্রপথিক হিসেবে ছাত্রদের সামর্থ্য।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা শোনার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো মিছিল, যেতে থাকলো সেগুলি হোটেল পূর্বাণী অভিমুখে; সেখানে আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক কমিটি দেশের জন্য নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করছিল যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বায়ত্তশাসন। শেখ মুজিব ছয় দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করলেন যার মধ্যে ২ তারিখ ঢাকায় ধর্মঘট ও তিন তারিখ সারা দেশব্যাপী ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হলো। বলা হলো, ৭ তারিখ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় বাদবাকি কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে। শেখ মুজিব এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি ও আমার দলীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে পেশ করার লক্ষ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা সংহত রেখেও কি ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপায় আমরা নির্ধারণ করেছি। কিছুক্ষণ আগে প্রস্তাবিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার ঘোষণা আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি বলে মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকল বাঙালি এই ষড়যন্ত্রকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে।"[৯৩]

ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করেন। ধরে নেয়া হতো তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল। ৪ মার্চ, বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে খ্যাত টিক্কা খানকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। মিছিলে মিছিলে ভরে ওঠে রাজপথ। ৪ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয় হরতাল। ইপিআর, পুলিশের গুলিতেও নিহত হয় বেশ কয়েকজন ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ। সিভিল সমাজের সাহস প্রতিভাত হয়ে ওঠে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকীর গভর্নর হিসাবে টিক্কাখানের শপথ পড়ানোর অস্বীকৃতিতে। ইয়াহিয়া খান ৫ মার্চ এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং এর আগে ১০ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে গোলটেবিল বৈঠক। শেখ মুজিবের ওপর ছাত্র-জনতার চাপ বাড়ছিল চরম কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের। ছাত্রলীগ ৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করে।[৯৪] ৬ মার্চ সাপ্তাহিক 'স্বরাজে' এক সপ্তাহে নিহতের সংখ্যা দেয়া হলো এভাবে—

"...ফার্মগেট, রাজারবাগ, রামপুরা, গভর্নর ভবনের সম্মুখে, নবাবপুর, সদরঘাট, নিউ মার্কেট প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বীর বাঙালি বুলেটের মুখোমুখি হল। ঢাকায় ২৬ জন নিহত হল। .....চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট, রেলওয়ে কলোনি, টাইগারপাস মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠলো।.....নিহতের সংখ্যা ১২০ এ উপনীত হল। ....এরপরেই খুলনা আর রংপুরের বীর সংগ্রামের সংবাদ এসে পৌঁছাল।.....ন'জন নিহত হল।.....যশোরে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করলো। .....ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, খালিশপুরে শুধু কারফিউ আর কারফিউ।"[৯৫] ইতোমধ্যে ৩রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন শীর্ষে উত্তোলিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এক কথায় এই প্রথম

বাংলাদেশের সিভিল সমাজের প্রতিটি পর্যায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার দাবী জানালো। এবং সিভিল সমাজের স্বাধীনতা আদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হলো আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে টানটান উত্তেজনার মাঝে ৭ মার্চ অপরাহ্নে রমনা রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত হলো জনসভা। এর আগে বাংলাদেশে এতবড় জনসভা আর হয়নি। সভা শুরুর আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হল, যার মূল বক্তব্য ছিল—

১। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (২) ১ মার্চ হতে আন্দোলনে যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করে সে ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে, (৩) সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং (৪) অবিলম্বে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।"[৯৬]

রেসকোর্সের সেই অবিস্মরণীয় ভাষণে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন"... আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত- ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।".....আরও কিছু নির্দেশ দেওয়ার পর সবশেষে ঘোষণা করলেন—"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

লে জেঃ টিক্কা খান মুজিবের ভাষণ রেডিও থেকে প্রচার করতে চাননি। কিন্তু সিভিল সমাজের শক্তি প্রদর্শন করলেন রেডিও-র কর্মচারীরা। তারা বেরিয়ে এলেন কাজ ছেড়ে। টিক্কা খান বাধ্য হলেন সেই ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিতে। ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনোবল জাগ্রত রাখার জন্যে দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানসমূহের প্রচার করেছে। সিভিল সমাজে রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা যা হওয়া উচিত তা ঐ এক সময়ই পালিত হয়েছিল। বস্তুত ৭ মার্চের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। দুই পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার তখন একটি মাত্রই পথ খোলা ছিল, তাহলো বাংলাদেশের সিভিল সমাজের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

৯ মার্চ পল্টন ময়দানের এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন-"...প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হয়েছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নেই। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) -এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিবো। খামোকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।"[৯৭]

মধ্য মার্চের মধ্যে দেখা গেল সরকারি কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে সেনানিবাস ও বিমানবন্দরের মধ্যে। তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্তারা ভাবতো, যথাযথ কর্তৃত্ব পেলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের তারা দমন করতে

প্রয়োজনে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকদের একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা। এবং এ আন্দোলন আরও তুলে ধরেছে সিভিল সমাজের অগ্রপথিক হিসেবে ছাত্রদের সামর্থ্য।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা শোনার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো মিছিল, যেতে থাকলো সেগুলি হোটেল পূর্বাণী অভিমুখে; সেখানে আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক কমিটি দেশের জন্য নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করছিল যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বায়ত্তশাসন। শেখ মুজিব ছয় দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করলেন যার মধ্যে ২ তারিখ ঢাকায় ধর্মঘট ও তিন তারিখ সারা দেশব্যাপী ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হলো। বলা হলো, ৭ তারিখ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় বাদবাকি কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে। শেখ মুজিব এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি ও আমার দলীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে পেশ করার লক্ষ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা সংহত রেখেও কি ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপায় আমরা নির্ধারণ করেছি। কিছুক্ষণ আগে প্রস্তাবিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার ঘোষণা আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি বলে মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকল বাঙালি এই ষড়যন্ত্রকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে।"[৯৩]

ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করেন। ধরে নেয়া হতো তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল। ৪ মার্চ, বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে খ্যাত টিক্কা খানকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। মিছিলে মিছিলে ভরে ওঠে রাজপথ। ৪ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয় হরতাল। ইপিআর, পুলিশের গুলিতেও নিহত হয় বেশ কয়েকজন ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ। সিভিল সমাজের সাহস প্রতিভাত হয়ে ওঠে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকীর গভর্নর হিসাবে টিক্কাখানের শপথ পড়ানোর অস্বীকৃতিতে। ইয়াহিয়া খান ৫ মার্চ এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং এর আগে ১০ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে গোলটেবিল বৈঠক। শেখ মুজিবের ওপর ছাত্র-জনতার চাপ বাড়ছিল চরম কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের। ছাত্রলীগ ৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করে।[৯৪] ৬ মার্চ সাপ্তাহিক 'স্বরাজে' এক সপ্তাহে নিহতের সংখ্যা দেয়া হলো এভাবে—

"...ফার্মগেট, রাজারবাগ, রামপুরা, গভর্নর ভবনের সম্মুখে, নবাবপুর, সদরঘাট, নিউ মার্কেট প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বীর বাঙালি বুলেটের মুখোমুখি হল। ঢাকায় ২৬ জন নিহত হল। .....চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট, রেলওয়ে কলোনি, টাইগারপাস মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠলো।.....নিহতের সংখ্যা ১২০ এ উপনীত হল। ....এরপরেই খুলনা আর রংপুরের বীর সংগ্রামের সংবাদ এসে পৌঁছাল।.....ন'জন নিহত হল।.....যশোরে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করলো। .....ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, খালিশপুরে শুধু কারফিউ আর কারফিউ।"[৯৫] ইতোমধ্যে ৩রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন শীর্ষে উত্তোলিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এক কথায় এই প্রথম

বাংলাদেশের সিভিল সমাজের প্রতিটি পর্যায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার দাবী জানালো। এবং সিভিল সমাজের স্বাধীনতা আদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হলো আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে টানটান উত্তেজনার মাঝে ৭ মার্চ অপরাহ্নে রমনা রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত হলো জনসভা। এর আগে বাংলাদেশে এতবড় জনসভা আর হয়নি। সভা শুরুর আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হল, যার মূল বক্তব্য ছিল—

১। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (২) ১ মার্চ হতে আন্দোলনে যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করে সে ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে, (৩) সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং (৪) অবিলম্বে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।"[৯৬]

রেসকোর্সের সেই অবিস্মরণীয় ভাষণে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন"... আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত- ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।".....আরও কিছু নির্দেশ দেওয়ার পর সবশেষে ঘোষণা করলেন—"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

লে জেঃ টিক্কা খান মুজিবের ভাষণ রেডিও থেকে প্রচার করতে চাননি। কিন্তু সিভিল সমাজের শক্তি প্রদর্শন করলেন রেডিও-র কর্মচারীরা। তারা বেরিয়ে এলেন কাজ ছেড়ে। টিক্কা খান বাধ্য হলেন সেই ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিতে। ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনোবল জাগ্রত রাখার জন্যে দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানসমূহের প্রচার করেছে। সিভিল সমাজে রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা যা হওয়া উচিত তা ঐ এক সময়ই পালিত হয়েছিল। বস্তুত ৭ মার্চের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। দুই পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার তখন একটি মাত্রই পথ খোলা ছিল, তাহলো বাংলাদেশের সিভিল সমাজের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

৯ মার্চ পল্টন ময়দানের এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন-"...প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হয়েছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নেই। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) -এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিবো। খামোকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।"[৯৭]

মধ্য মার্চের মধ্যে দেখা গেল সরকারি কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে সেনানিবাস ও বিমানবন্দরের মধ্যে। তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্তারা ভাবতো, যথাযথ কর্তৃত্ব পেলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের তারা দমন করতে

পারবে। সেনানিবাসে খাদ্য সরবরাহকারী ঠিকাদাররাও সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। একই ভাবে, সেনানিবাসে প্রকৌশলী শাখার বেসামরিক কর্মচারীরাও কাজে যাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। পাকিস্তানের দুই অংশে বাণিজ্য বন্ধ রইলো। কিন্তু চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দরে জাহাজ ভর্তি সেনা এসে নামলো। বার্মা, চীন ও শ্রীলংকার ওপর দিয়ে বিমানে করে বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে নামতে লাগলো ঢাকা বিমানবন্দরে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর কূটচাল চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৫ মার্চ ঢাকায় এলেন তিনি। মনে হলো তিনি এসেছেন মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে। আসলে এসেছিলেন পাকিস্তানি সেনাদের সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে যারা পরবর্তীকালে গণহত্যা চালাবে। নতুন একটি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার জন্যে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা শেখ মুজিবের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনা মনে হচ্ছিল সফল হবে। ২২ মার্চ শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন "যদি কোনো অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কেন আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।"[৯৮] শেখ মুজিবের ওপর জনগণের চাপ যে প্রচণ্ড তা স্পষ্ট হয় ২৩ মার্চ, পাকিস্তান দিবসে, যেদিন, সেনানিবাস ছাড়া বাংলাদেশের কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি। উড়েছে শুধু সবুজ পটভূমিকায় লাল বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা ও কালো পতাকা।[৯৯] রাজপথ ছিল মিছিল আর স্লোগানে ভরপুর- "ভুট্টোর মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা", "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।" ২৫ তারিখ সকালে হঠাৎ দেখা গেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা না জানিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। ২৫ তারিখ রাতে নিহতের ঢল ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মার্চের শুরুতে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল অচিরেই তা রূপান্তরিত হয় দেশব্যাপী জোরালো অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এবং ২৫ মার্চের পর তা রূপ নেয় মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামে। এই অসহযোগ আন্দোলনের অন্য আরেকটি গুরুত্ব আছে। মার্চ মাসের এই আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়, পরবর্তীকালে স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল 'ফর্মাল ডিক্লারেশন' মাত্র। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিব ৩৫টি নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সামরিক-বেসামরিক কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।[১০০] এ ভাবে বাঙালির স্বপ্ন একটি সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মার্চ ১৯৭১ সালে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

".....বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে পাকিস্তান প্রবর্তিত উপনিবেশিক গণতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা থেকে তৈরি হয়েছে ১৯৭১ এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধ উদ্ভূত অনিবার্যতা, যে অনিবার্যতা তৈরি করেছে মুক্তিযুদ্ধের অপ্রতিরোধ্যতা এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কার্যক্রম।

১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যান।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখানের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিরোধের সূত্রপাত। শেখ মুজিবুর রহমান একটি সামরিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে এই প্রতিরোধকে একটি রাষ্ট্র গঠনে বদলে দেন। একপক্ষে অসহযোগের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যান, অন্যপক্ষে অসহযোগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রবর্তনার সম্ভাবনা জনমনে সত্য করে তোলা এই রণকৌশল শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নির্দেশের মধ্যে দিয়ে বাস্তব করে তোলেন।"

তিনি আরও লিখেছেন "এই বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার নির্দেশনা দেন। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জনসাধারণ, এই কর্তৃত্বের স্বরূপ সিভিল এবং সিভিল কর্তৃত্বের পুলিশ এবং মিলিটারি। শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনকে রূপান্তরিত হয়ে যান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এ ক্ষেত্রেই।"[১০১]

তথ্যপঞ্জি

১. কায়েদে আজম বা মহম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ ও ২৪ মার্চ যথাক্রমে রমনা রেসকোর্সে এক নাগরিক সংবর্ধনায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তনে বক্তৃতা করেন। রেসকোর্সের সভায় তিনি স্পষ্ট বলেন—"আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনও ভাষা নয়।" বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা করেন-"রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু অন্য কোনও ভাষা নয়।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভোস্ট অধ্যাপক পি.সি. চক্রবর্তী মঞ্চে বসেছিলেন জিন্নাহর পাশে। তিনি বলেছেন, জিন্নাহর উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিন ধরনের শ্লোগান দেয়া হয় যা, "reiterated their faith in the unity of Pakistan, the leadership of Jinnah, and their determination to have Bengali as a state language." Jayanta Kumar Ray, *Democracy and Nationalism on Trial : A Study of East Pakistan*, IIAS, Simla, 1968, pp 12-13.

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম পরিচ্ছেদ। ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উমরের উপরোল্লিখিত গ্রন্থের *দ্বিতীয়* খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫ ও তৃতীয় খণ্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫। আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমির জন্য দেখুন আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০; আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০; এম এম আকাশ, *ভাষা আন্দোলন : শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০; আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী, *ভাষা আন্দোলন, অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০; হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন, অংশ গ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০; হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০। আরও দেখুন, বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।

২. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩ বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮।

৪. *ঐ*, পৃঃ ১৫৯।

৫. এম এম আকাশ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬২। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণমূলক কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে যা দেখা যেতে পারে আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য–আবদুল মতিন, *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*, নন্দন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬; আবুল কাসেম সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, ১৯৬৯; আহমদ রফিক, *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮; গাজীউল হক ও এম, আর, আখতার মুকুল, *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯১; বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, *বায়ান্নর একুশ : ত্রিশ বছর পর*, ঢাকা ১৯৮৩

৬. পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের ইতিহাসের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দর মহল : বাংলাদেশ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৭, ভূমিকা।

৭. ফজলুল হকের জীবন ও কর্মসম্পর্কে এখনও উল্লেখযোগ্য কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ভাসানীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও ভাসানী সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে–সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা ভাসানী*, সৈঃ সাঃ মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬; শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, *মওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৮; শাহ আহমদ রেজা, *ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬। সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কেও কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিকথা, দেখুন, Mohammad H.R. Talukdar (ed). *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*. UPL. Dhaka. 1987.

৮. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫. পৃঃ ৩২৩-৩২৫। যুক্তফ্রন্ট উত্থাপিত একুশ দফার জন্য দেখুন, আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা : ২১ দফা থেকে ৫ দফা*, সমাজ বিজ্ঞান পবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭ পৃঃ ১২৭-১২৯।

৯. যুক্তফ্রন্টের নেতা কামরুদ্দীন আহমদ নির্বাচন কৌশল সম্পর্কে লিখেছেন -"কেবল প্রয়োজন ছিল, বাংলার লোকদের বোঝান যে, বাংলার মুসলিম লীগ পাঞ্জাবিদেরই প্রতিষ্ঠান এবং এখানকার মুসলিম লীগরা পাঞ্জাবীদের লেজুড় ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর শাসক ও শাসিত, শোষক-শোষিত, উৎপীড়িতের ছবি জনসমক্ষে উপস্থিত করা। ... মওলানা ভাসানী সমস্ত ফেব্রুয়ারি মাসটা অর্থাৎ পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের শহীদদের জন্যে প্রভাতফেরি প্রতি গ্রামে বার করার ব্যবস্থা করলেন। ... কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*, প্রকাশক : জোবেদা খানম, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ১১। বিদেশী পত্র-পত্রিকায়ও একইভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছিল। যেমন, ফার ইস্টার্ন সার্ভেতে ঐ সময় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

"Gradually East Pakistanis have been impressed that their economic and developmental interests were being subordinated to those of west; that East Bengal was being treated as a colony by the central Government. This feeling has been intensified by the language issue in the longstanding attempt of the Pakistan government to popularise Urdu as the national language, to the detriment of Bengali. These grievances against the Muslim League Government at the centre were compounded by the

alleged corruption and inefficiency of the provincial Muslim League Government."
Richard L. Park and Richard S. Wheeler, East Bengal under Governor's Rule, Far Eastern Survey, 23 (1954), P. 129 quoted in Kamal uddin Ahmed, "1954 Elections : Issues of Autonomy," in Sirajul Islam (ed) *History of Bangladesh 1704-1971*, vol. 1, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, P. 463.

১০. যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলমান আসনেই নির্বাচন করেছিল এবং ২৩৭ টি মুসলিম সিটের মধ্যে পেয়েছিল ২২৮টি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৩ টি, কে এস পি ৪৮টি, নেজাম-ই-ইসলাম ২২টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১৩টি ও খিলাফত রাব্বানী ২টি। দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২৩ ও ৩৩৩। ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য দেখুন- [পৃঃ ১৭]

সারণি ১ ঃ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর সারসংক্ষেপ

নির্বাচনী এলাকা	মোট আসন	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসন সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	মোট ভোটারের সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী এলাকার মোট ভোটার	প্রদত্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। মুসলমান	২২৮	-	৯৮৬	১,৫১,৫৯,৮২৫	১,৫১,৮২৫	৫৬,৯৯,৪২৭	৩৭.৬০
২। সাধারণ	৩০	২	১০১	২০,৯৫,৩৫৫	২০,৯৫,৩৫৫	৫৬,৯৯,৪২৭	৩৯.১৯
৩। তফসিলী হিন্দু	৩৬	-	১৫১	২৩,০৩,৫৭৮	২৩,০৩,৫৭৮	৭,৭৬,৭২৬	৩৩.২০
৪। মহিলা	-	-	-	-	-	৭,৬৬,২৪৫	-
(ক) মুসলমান	৯		৩২	১,৬১,৯৬৬	১,৬১,৯৬৬		৩৭.৩১
(খ) সাধারণ	১		-	২৫,৭২৬	-	৬০,৭৫২	প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন
(গ) তফসিলী হিন্দু	২		৩	১৪,৭৮৫	৫,০১৪	-	৩৫.৪৮
৫। পাকিস্তানি খৃষ্টান	১		-	৪৩,৯১১	-	১,৭৭৯	প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন
৬। বৌদ্ধ	২২	-	১২	১,৩৪,৪১৭	১,৩৬,৪১৭	৩৯,২৮-৭	২৮.৮০
মোট	৩০৯	৫	১,২৮৫	১,৯৯,৪১,৫৬৩	১,৯৭,৪৮,৫৬৮	৭৩,৪৪,২১৬	৩৭.১৯

উৎস ঃ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর উপর প্রণীত রিপোর্ট থেকে সারণিকৃত। কামালউদ্দিন আহমদের *পূর্বোক্ত প্রবন্ধ*।

১১. কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫।

১২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৭।

১৩. কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩।

১৪. ৩০ মে কলকাতার নেতাজী ভবনে ফজলুল হক বলেছিলেন—
"বাঙালি এক অখণ্ড জাতি। আর তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সুসংহত দেশে বাস করে। তাদের আদর্শও এক, জীবন ধারণের প্রণালী এক।---আজ আমাকে ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমি ভারত বলতে পাকিস্তান ও ভারত দুটোই বুঝি। কারণ ঐ বিভাগ আমি কৃত্রিম বিভাগ বলে মনে করি।" *ঐ*, পৃঃ ২৫।

১৫. পাকিস্তানের আমলা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে সিভিল সমাজের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতো তা বিশ্লেষণ করে কে. বি. সাঈদ মন্তব্য করেছেন—
"The same pattern of Central intervention had taken place in East Bengal as in Punjab, the difference being that it was the

Muslim League politicians who could not control the situation arising out of religious disturbances in Punjab who had been removed. In East Bengal, politicians of the United Front, who had won an overwhelming majority in the provincial elections --- were dismissed. In both cases there was military intervention except that Martial Law was imposed in Punjab, whereas a defence official was put in charge of the civil administration in East Bengal. "Khalid B. Sayeed, Politics in *Pakistan : The Name and Direction of Change*, Praeger, New York, 1980, p.4]

১৬. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৩।

১৭. আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "হক সাহেবকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশদ্রোহী ঘোষণা করায় এবং তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই আশা হইয়াছিল যে প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁদের হাতেই আসিবে। মন্ত্রীত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদই সর্বময় কর্তা, এটা ছিল জানা কথা। অতএব যুক্তফ্রন্টের পক্ষ হইতে যিনি গভর্নর জেনারেলের গলায় মালা দিবেন, কার্যত যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবেই তিনিই মন্ত্রীসভা গঠনে আহুত হইবেন। এই ধারণায় নেতাদের পাইয়া বসিল।-----কিন্তু এই মাল্যদানের তাও কোনও ফল হইল না। পূর্ব-বাংলায় পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না।" *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬।

১৮. কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬-৩৭।

১৯. *ঐ*।

২০. আওয়ামী লীগের এক বৈঠকে সোহরাওয়ার্দীকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন মন্ত্রীসভায় যোগদান না করেন। সোহরাওয়ার্দী জানালেন, গোলাম মহম্মদ তাঁকে গণতন্ত্রের আশ্বাস দিয়েছেন এ বলে যে, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করে শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হবে। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন এবং পরে অনুধাবন করলেন যে তাঁকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮-৪১। এ পরিপ্রেক্ষিতে, মধ্যবর্তী কারকরা কেন এগিয়ে এসেছিলেন তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় লেখকের মন্তব্যে-"বাংলার নেতৃত্বে হক সাহেব ও শহীদ সাহেব দুজনই উচ্চ-মধ্যবিত্ত বলে দাবী করতে পারেন। বাকি সবাই সাধারণ মধ্যবিত্ত অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত। ঐ দু'জনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, পাঞ্জাবি নেতৃত্ব বাংলাকে মুঠোর ভেতর নিয়েছে বলে যখন ভাবছিল, ঠিক তখনই বোধ হয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, তথাকথিত উচ্চ মধ্যবিত্ত বাংলার স্বার্থ সংরক্ষণে সম্পূর্ণ অপারগ। তাই সাধারণ মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাদের ন্যায্য স্থান পেতে সংকল্পবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টকে নিয়ে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতারা যে খেলায় মাতলেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদই যে রাজনৈতিক মুক্তির একমাত্র পথ তাতে সাধারণ ও নিম্নমধ্যবিত্তের কোনো সন্দেহ থাকল না।" পৃঃ ৪১।

২১. এ প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী লিখেছেন, পাশ্চাত্যের সঙ্গেও এ ধরনের চুক্তিসমূহ পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য পেতে সাহায্য করেছিল।

"I have little doubt that all this flood of assistance was prompted, by the much derided Baghdad pact (later called CENTO after the withdrawl of Iraq) and the SEATO, which gave practical demon-

stration of the ability of the noncommunist states to meet in a defensive alliance and save themselves from communist infiltration."

তিনি আরও লিখেছেন,

"I warned the people to be careful and not be carried away be sentiment. The opposition knew little of the needs and requirements of Pakistan, and we are scarcely in a position to criticize foreign policy since it had never been bipartisan and the country had never been taken into confidence. *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*. pp. 115, 177.

২২. গোলাম মহম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ায় স্পিকার তমিজউদ্দিন খান নভেম্বর ১৯৫৪ সালে আদালতে রিট পিটিশন করেন ও জয়লাভ করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Tamizuddin Khan, *The Test of Time*, UPL, Dhaka, 1989, pp 151-157.

২৩. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যে সভায় অনাস্থা প্রস্তাব করা হয়েছিল "সেদিন বত্রিশ জন আওয়ামী লীগ সদস্য দল ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ লঙ্ঘন করে অন্য দলে যোগদান করেন।

পরবর্তীকালে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভায় এদের কয়েকজন মন্ত্রী হয়েছিলেন।

"এরা চলে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় কিন্তু আমরা দুঃখিত হই না। বারবার নড়াচড়া করে বড় দুঃখ দিয়েছে এরা।"

আতাউর রহমান খান, *ওজারতির দুই বছর*, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৩৭১, পৃঃ ৯৭।

২৪. আতাউর রহমান খান লিখেছেন, তিনি নিজেই ছিলেন এ প্রস্তাবের উদ্যোক্তা। বরং আইয়ুব খান সেনাবাহিনী ব্যবহারের বিরোধীতা করেছিলেন। এবং স্বীকার করেছেন যে, "স্বভাবতই সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ ও কড়াকড়িতে অনেক লোকের দারুণ অসুবিধা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। হবারই কথা।" আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫৯।

২৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *ঐ*, পৃঃ ২৯৫-২৯৭।

২৬. প্রতিষ্ঠানের প্রভুত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খানকে বলেছিলেন "কোনও দেশেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে নাই সরকারের উপর। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে গেলে অনেক অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হবে উভয়েরই।" ঐ, পৃঃ ২৬৫।

২৭. এ প্রসঙ্গে ঐ সময় [১৯৫৬-৫৮] আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলাপ হয়।

এবং তাঁরা যে সিভিল সমাজের ক্ষতি করেছেন তাও প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়। "যে কোনও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা আমাদের দলীয় ঐক্য বজায় রাখিতে এবং আতাউর রহমান-মন্ত্রীসভাকে পদে বহাল রাখিতে হইবে। ইতোমধ্যে দুই তিনবার মন্ত্রীসভার ওলট-পালট হইয়াছে। আমাদের মন্ত্রীসভা কায়েম করিবার জন্য হক সাহেবকে গভর্নরের পদ হইতে সরাইয়া বুড়া বয়সে তাঁকে অপমান করিতে হইয়াছে। বন্ধু সুলতান উদ্দিন আহ্মদকে হক সাহেবের স্থলে গভর্নর করিয়া আনিতে হইয়াছে। বামপন্থী আদর্শব্যাপী ন্যাপ-পার্টি তিন তিনবার পক্ষ পরিবর্তন করিয়াছে। এর কোনোটাই আমাদের জন্য প্রশংসার কথা নয়।"

আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫৪।

২৮. আইয়ুব খান লিখেছেন–

"There was a big public meeting in Dacca which I addressed. I think after that Iskander Mirza became rather apprehensive. But I had told him myself beforehand. Look, circumstances have changed. A revolution has taken place. You have ushered it in and you have made me responsible for running the country. It is not just an ordinary routine revolution; there is going to be a real, basic change in this country. This is my policy...I am determined to carry out certain basic reforms, and please try not to get involved in any intrigue or anything like that." Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, OUP, Karachi, 1967, P. 73.

২৯. বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন এ সম্পর্কে—

"A revolution that has succeeded is a legalised illegality. Since no constitution is known to contain a provision for its own overthrow by violence, a revolution in its inception and conception is an avowed illegality, and the situation resulting there from is beyond the cognisance of law and law courts. Existing authorities may either vacate, or accept the change, there being no middle course for them. Courts, prone to look at everything from a legal angle when, on being confronted with a *fait accompli*, make academic declarations of the continued illegality of what has come about, convert what is essentially a pattern metamorphosis into a legal wrong and thus indirectly tend to produce vain discontent with a past political event which if it directly comes before them for adjudication involves them into further difficulties."

Muhammad Munir. *Highways and Bye-ways of Life*, Economic Front, New Delhi, 1988. P. 216.

৩০. "It is quite clear to me that two national languages we cannot become a one-nation state; we shall continue to remain a multination state. I am not necessarily arguing against this; I am just stating a fact of life which has to be recognized. For it is the case that one language cannot be imposed on the whole country; neither Bengali nor Urdu can become the language of the whole of Pakistan. It is equally true that if the people-both in East and West Pakistan want to develop choesion they must have a medium to communicate with each other. And this medium must be a national medium. To evolve such a medium we have to identify common elements in Bengali and Urdu and allow them to grow together through a common script."

সাঈদ -উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৬-৭৮।

৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫
৩২. *সাঈদ-উর রহমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৭।
৩৩. *ঐ*, পৃঃ ৮১-৮২।
৩৪. *ঐ*, পৃঃ ৮২-৮৫।
৩৫. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিনদশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬, পৃঃ ১৮২ এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৫৪-৫৬। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের যে রূপরেখা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিল তা হলো—
"পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন ২. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন, ৩. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন ৪. রাজবন্দিদের মুক্তি ৫. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ৬. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, ৭. কৃষকের খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস ৮. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন শীর্ষক নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন....।" *ঐ*।
৩৬. *Dawn* 31. 1 1962; *Hindu*. 31.1.1962.
৩৭. "He understood from this that I would obstruct his constitution and accordingly arrested me in Karachi where I had gone .....He was advised that my alleged popularity was a myth and that if I was arrested there would be no commotion, particularly if he announced at the same time that under the second five-year plan unprecedented financial resources, such as had never been dreamt of by previous governments had been allotted to East Pakistan. This would certainly, according to his way of thinking, prove his own bonafides and concern for East Pakistan, and in short, would act as a bribe which would prevent any movement in my favour." *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, p. 167.
৩৮. আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ১৬৩।
৩৯. There is a close connection," observed K.J. Newman, "between the new Pakistan constitution, promised by President Ayub Khan's cabinet for to-day (i.e. 1 March 1962).
Mr. Suhrawardys arrest, and the recent Dacca riots."
K.J. Newman, 'Pakistan's Rulers fear a Political revival,' *The Guardian* (Manchester). 1.3. 1962
৪০. মৌলিক গণতন্ত্র কেন করেছিলেন সে সম্পর্কে আইয়ুব খানের ভাষ্য হলো—
"I formulated the following Principles to govern the future role of Basic Democracies first, they should reflect the representation of the people obtained in the most direct manner secondly, they should become the nerve centres of their areas where all local problems of development and civic responsibility could be studied at close range and their solutions discovered and applied with concentrated attention, thirdly, they should in course of time absorb the official agencies and begin to function as people's bodies; and finally, they should be operated to generate

vigour and enthusiasm and liberate those moral and intellectual forces which are essential to the development of a "dynamic and dedicated leadership in the country."

Mohammad Ayub Khan, *op cit.* p. 209

৪১. শাসনতন্ত্র কমিশনের সভাপতি ছিলেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিলেন পাঁচজন করে সদস্য। কমিশনের শর্ত ছিল—

"(1) To examine the progressive failure of parliamentary government in Pakistan leading to the abrogation of the constitution of 1956, and to recommend how a recurrence of similar causes can be prevented.

(2) To submit proposals for a constitution, taking into consideration the genius of the people, the general standard of education and political judgement in the country, the present state of nationhood, the need for sustained development, and the effect of constitutional and administrative changes in recent month's.

(3) The proposals would embody recommendations as to how best the following ends could be achieved: (i) a democracy adaptable to changed circumstances and based on the Islamic principles of justice, equality, and tolerance, (ii) consolidation of national unity; and (iii) a firm and stable system of government."

Ibid, pp 210-211.

৪২. আইয়ুব খানের মতে, নতুন শাসনতন্ত্র ছিল—

"a blending of democracy with discipline-the two pre requisites to running a free society with stable government and sound administration."

Ibid. p. 216

৪৩. আইয়ুব খানের মতে, জাতীয় সংসদের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো—

"(1) to ensure the integrity of Pakistan against external danger and internal disruption.

(2) to make Pakistan as strong as possible and to promote among its people a national outlook, removing all traces of distrust and suspicion between the two wings; and,

(3) to adopt measures for the moral and material happiness of the people, paving the way for a social welfare stare."

Ibid, P. 230.

৪৪. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩।

৪৫. *The Pakistan Times*, 23.3. 1962.

৪৬. *The Indian Express*, 29.3.1962; *The Pakistan Times*, 29.3.1962. আইয়ুব খান ঘোষণা করেছিলেন—

"Even today the exists, in our midst, some elements which never believed in the concept of Pakistan and now that it has become a reality is still keen to destroy it."

৪৭. Herbert Feldman. *A Constitution for Pakistan*. OUP. Karachi 1955. PP. 160-63.

৪৮. কমিশনের চারজন পূর্ব পাকিস্তানি সদস্য ছিলেন—
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোমতাজুদ্দিন আহমদ, ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আবদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এ. রশিদ।

৪৯. শিক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ উদ্ধৃত করা হলো—

১. "আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসাবে শিক্ষা দিতে হইবে।"

২. "উর্দু ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।"

৩. "আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাংলা বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালার এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হইবে।"

৪. "অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র।"

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পাকিস্তান সরকার, করাচি, ১৯৬১।

৫০. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩-৭৪।

৫১. আইয়ুব খানের আত্মজীবনীতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লিখেছেন তিনি—

"The whole object of the critics during the first year or so, inside the national Assembly, outside the Assembly, through the press, through ex-politicians or Ebdoe politicians, was to break my will. Once they had done that, they felt that I would have no option but to follow their dictates. They wanted to reassert their control and, once again, be the 'King-makers' if not the 'King's. They wanted to bring about a situation where not so much position (that would not have mattered) but the very existence of the country would depend on their sweet will. They wanted me to feel that I would not be able to run the country without them. That was their game."

Mohammad Ayub Khan, *Op cit*. P. 217.

৫২. এ প্রসঙ্গেও আইয়ুব খান উল্লেখ করেছেন—

"I must confess to one miscalculation in respect of the constitution. Having suffered through the perfidy of the so called political parties, I was hoping that we would be able to run our politics without the party system. Therefore the Constitution was so framed that, in theory, it could function with or without political parties. After the introduction of the constitution, I soon came to realize that one could not do without political parties. Within the

legislature the members could only be organized on the basis of party rule and discipline. Outside, there had to be an organization to maintain contact with the people. There was also a need to explain government policies to the people in the countryside; these could only be done by a political party. So I came to the conclusion that under our conditions one could not really work the system without political parties."

Ibid. P. 22]

৫৩. বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষক প্রজা পার্টির মোহন মিয়া, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হক, ন্যাপের মাহমুদ আলী, নেজামে ইসলামের পীর মোহসেনউদ্দিন ও মুসলিম লীগের নুরুল আমীন। সোহরাওয়ার্দী লিখেছেন—

"The basis of the statement was that no single person had the right to frame the constitution of a country, that it could only be framed by representatives of the people elected for the purpose and that, therefore, an election should be held on the basis of adult franchise and a constituent assembly created for the express purpose of framing a constitution for Pakistan. "*Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, P. 176.

৫৪. আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, পৃঃ ৩৫০।

৫৫. আবদুল কাদির (খোকা রায়), গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা, শিখা, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন, ১৯৬৪, পৃঃ ২৮-৩৯; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮০-৮১।

৫৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯১-৯৫।

৫৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, ডাঃ মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম : মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র,১৯৯৩।

৫৮. "Under the Electoral College Act, passed on 17 April 1964, each of the two provinces was divided into 40,000 territorial units and each one of these units was to elect one Basic Democrat to form the electoral college for the office of President and for the members of the National and Provincial Legislatures. The Election Commission defined these units, 'having regard to territorial unity, distribution of population and administrative convenience.' The average population of each unit worked out at 1,073 persons on the basis of nearly 45 million registered voters out of a total population of 110 million."

Mohammad Ayub Khan. *op cit.* p. 234

৫৯. *দৈনিক আজাদ*, ৫.৫.১৯৬৪.

৬০. রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম', মনসুর মুসা সম্পাদিত, *বাংলাদেশ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ৪২৭।

৬১. Jayanta Kumar Ray, op. cit. P. 354.

৬২. ছয় দফার পূর্ণ বিবরণের জন্য, আজাদ ও রেজার *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১৩৬-১৩৯। শেখ ফজলুল হক সম্পাদিত পুস্তিকা 'ছয় দফা' পৃঃ ২১-২৩ থেকে উপর্যুক্ত গ্রন্থে তা উদ্ধৃত হয়েছে।

৬৩. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৬৪. *ঐ*, পৃঃ ১৫৪.

৬৫. মাহে নও, মার্চ, ১৯৬৭, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৩।

৬৬. *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত ভাষ্য—

"পাকিস্তান এছলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচি লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানিরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোনও প্রচেষ্টাই বরদাশত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথমদিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হইলেও সরকার এই সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আমরা সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

দৈনিক আজাদ, ১.৭.৬৭; উদ্ধৃত, *ঐ*, পৃঃ ১০৬।

৬৭ *ঐ*।

৬৮. ঐ, এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্কের বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ব বঙ্গ-পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১।

৬৯. দৈনিক আজাদ, ৩.১০.১৯৬৮; উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১০।

৭০. উদ্ধৃত, *ঐ*, পৃঃ ১১১।

৭১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয়খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৮২; মামলার আসামীদের বন্দি জীবন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মামলার ৩৫ নং অভিযুক্ত লে. আবদুর রউফের গ্রন্থ *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন*, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

৭২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*।

৭৩. এগারো দফার স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন-ডাকসুর পক্ষে তোফায়েল আহমদ ও নাজিম কামরান চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) পক্ষে সাইফুদ্দিন মানিক ও নুরুল ইসলাম, ছাত্রলীগের পক্ষে আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী, ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) পক্ষে মোস্তফা জামাল হায়দার। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ৯.১.১৯৯৬।

৭৫. ২২ জানুয়ারি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের একাংশ ঃ

"মিছিলে অসংখ্য কালো পতাকা ও রক্ত আঁকা ফেস্টুনও বহন করা হয়। মিছিলে ছাত্রছাত্রী, কিশোর, মহিলা, শ্রমিক, কর্মচারী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, রাজনীতিক, পরিষদ সদস্য, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সকল নাগরিক যোগদান করেন। স্মরণকালের মধ্যে এতবড় মিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়নি। এই বিশাল গণমিছিলের দৃপ্ত পদভারে ও

বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মিছিল যতই অগ্রসর হতে থাকে, ইহার কলেবরও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।" *সংবাদ* ২২.১.১৯৬৯।

৭৬. বাংলাদেশের যে সব রাজনৈতিক ইতিহাসের বই প্রকাশিত হয়েছে তার সব কটিতেই উনসত্তরের গণআন্দোলন সম্পর্কে কোনো না কোনো আলোচনা আছে। তবুও বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন—
মাহফুজ উল্লাহ, *অভ্যুত্থানের উনসত্তর*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৩। মেসবাহ কামাল, আসাদ ও *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*,বিবর্তন, ঢাকা ১৯৮৬। মোহাম্মদ ফরহাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯ সেলিনা হোসেন, *উনসত্তরের গণআন্দোলন*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৮৫ এবং দেখুন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস, *চিলেকোঠার সেপাই*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৬।

৭৭. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭৬-১৭৮।

৭৮. ইয়াহিয়া খান তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন—
"My aim is to transfer power to the elected representatives of the people.....one Unit will be dissolved and separate provinces will come into being.....Similarly, in difference to the wishes of the people, I have accepted the principle of One Man One Vote and this democratic principle will be the basis of election for the future National Assembly .....The requirement would appear to be maximum autonomy to the two wings of Pakistan.....full political activity will be allowed in the country with effect from January 1, 1970.... The Dawn. 29.11.1969 উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ৪৮০-৪৮৪।

৭৯. '১১-দফার সংগ্রাম চলবেই' শীর্ষক লিফলেটটি প্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। এতে স্বাক্ষর করেন—
১। সামসুদ্দোহা, সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
২। নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ঐ
৩। তোফায়েল আহামেদ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
৪। আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক, ঐ
৫। ইব্রাহীম খলীল, সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন
৬। ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ঐ
ঐ, পৃ : ৪৮৫-৪৮৮।

৮০. For detail, the *Morning News*, 31. 3. 1970

৮১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২.৪.১৯৭০।

৮২. *ঐ*, ১.৪.১৯৭০।

৮৩. *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, পৃঃ ৫২১-৫২৫।

৮৪. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭৫.

৮৫. *ঐ*, পৃঃ ১৭৬।

৮৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, পৃঃ ৫৭৮-৫৮০।

৮৭. *ঐ*, পৃঃ ৫৮৪-৫৮৫।

৮৮. শেখ মুজিবুর নির্বাচনী প্রচারপত্রের শেষাংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—
"বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলীবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জীবন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন পড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হল, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো-তাঁদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬-দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।" ঐ, পৃ: ৫৮১-৮৩।

৮৯.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল।	দ্য ডন।	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

Pakistan National Assembly Election Results

Name of Party	No of Seats Con-tested.	Province-Wise Result East Pakis-tan.	Punjab	Tribal Sind	NWFP	Indirectly Elected Balu-Chitstan.	Area.	Total Women's seats.	
Awami League	162	160	..	..	..	..	..	7	16
Pakistan People's Party	122	..	64	18	1	..	..	5	88
All Pakistan Muslim League (Qaium)	132		1	1	7	..		..	9
Muslim League (Council)	119		7	..	..	..		..	7
Jamait-ul-Ulema-I-Islam (Hazarvi Group)	93				6	1			7
Markazi-Jamait-ul-Ulema I-Islam (Thanvi Group)	Not known.		4	3					7
National Awami Party (Wali Khan)	61		..	..	3	3		1	7
Jamait-e-Islam	200		1	2	1	..		..	4
Muslim League (Convention)	124	..	2	..	..	..	..	..	2
Pakistan Democratic Party	108	1	..	..	..	..	..	..	1
Independence	300	1	3	3	..	..	7	..	11
		162	82	27	18	4	7	13	313

East Pakistan Provincial Assembly Election Results

	General Seats (300)	Indirectly Elected Women's Seats.	Total
Awami League	288	10	298
Pakistan Democratic Party	2	..	2
Pakistan People's Party	..	..	..
Muslim League (Council)	..	..	..
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)	..	..	
National Awami Party (Wali Khan) 1	..	1	
Jamat-i-Islami	1	..	1
Nizam-e-Islami	1	..	1
Jamait-ul-Islam (Thanvi Group)	..	..	..
Markazl-Aho-o-Hadis	..	..	..
Jamait-ulema-i-Islam (Hazarvi Group)	..	..	
Jamaii-ulema-i-Islam (Noorani Group)	..	..	
Sind-Karachi-Punjabi-Pathan	..	..	..
Muttahida Mahaz	..	..	..
Baluchistan United Front	..	..	..
Pakhtoon Khawa (Nap)	..	..	..
Independence	7	..	7
Total No of seats	300	10	310

উৎস : *দলিলপত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড)।

৯০. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৬৯২।

৯১ অধিবেশন স্থগিত করার কারণ হিসেবে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন—

"In the past few weeks certain meetings between our political leaders have indeed taken place. But, I regret to say that instead of arriving at a consensus some of our Leaders have taken hard attitudes. This is most unfortunate. The Political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West is a most regrettable situation . This has cast a shadow of gloom over the entire nation.

The position briefly is that the major party of West Pakistan, namely, the Pakistans People's party, as well as certain other political parties, have declared their intention not to attend the National Assembly session on the third of March, 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have, therefore, decided to postpone the summoning of the National Assembly to a latter date. "*The Morning News*, 2.3.1971.

৯২. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৩। পৃ. ৬৬। শেখ মুজিব বলেন—

"The is nothing but a conspiracy which has been played for long 23 years in this country and is still going on only to exploit the 70 million people of Bengal. It is intended to keep Bengal as the colonial market and we are fighting for Justice and fair play and we shall continue fighting until we achieve our goal." *The People*, 2.3. 1971.

৯৩. স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এ সময় বিভিন্ন সংগঠন প্রচারপত্র বিলি করে যার কিছু মুদ্রিত হয়েছে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ* : দলিলপত্র, দ্বিতীয়খণ্ড।

৯৪. *ঐ, পৃ.* ৬৮৮-৮৯।

৯৫. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

৯৬. *ঐ, পৃ.* ৭১।

৯৭. *দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৭৫।

৯৮. "সারা বাংলাদেশে গতকাল মঙ্গলবার তেইশে মার্চ পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি। শুধু সামরিক ছাউনিতে উড্ডীন ছিল ঐ পতাকা। আর সর্বত্র উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা।

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানক্রমে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন ও সোভিয়েট কনস্যুলেটে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের ২৩ শে মার্চের পাকিস্তান দিবসের কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকাস্থ চীনা, ইরানি, ইন্দোনেশিয় ও নেপালি দূতাবাসে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনতা এসব দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দেয়। মার্কিন দূতাবাস এ দিন বিতর্ক এড়াবার নামে কোনো পতাকাই উত্তোলন করেনি।"

দৈনিক বাংলা, ২৪.৩.১৯৭১, উদ্ধৃত ঐ, পৃঃ ৭৮০।

৯৯. "A new flag is born today-a flag with a golden map of Bangladesh implanted on a red circle placed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total lost of the flags representing various states and Nations of the contemporary world. This is the flag for "Independent Bangladesh. "This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bengalees."

The People, 23.3.1971; Ibid. P. 789.

১০০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন *দলিলপত্র*, ২ খণ্ড।

১০১. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা', *আজকের কাগজ*, ২১ ভাদ্র, ১৪০০।

বাঙালির ইতিহাস থেকে দু'জনের নাম মুছে ফেলা অসম্ভব। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলা ভাষাকে শুধু নতুন রূপ দিয়ে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠা করেনি, বিশ্বাবাসীর কাছেও তা পরিচিত করেছিলেন। অন্যজন, বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন—একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গেয়ে, আর বঙ্গবন্ধুর নামে শ্লোগান দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারে ও বুদ্ধিজীবী হত্যা স্মরণে মিরপুরে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। মিরপুরের স্মৃতিসৌধটি বঙ্গবন্ধু উদ্বোধন করেছিলেন এবং এই স্মৃতিসৌধে তখন স্বাভাবিকভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। কীভাবে?

স্মৃতিসৌধে যে ফলক ছিল, তাতে লেখা ছিল—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারপর নিচে ছিল এই স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান [আক্ষরিক উদ্ধৃতি নয়]।

কয়েকদিন আগে আমরা কয়েকজন মিরপুর স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম ফলকটি ঠিক আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি নেই। শুধু তাই নয়, স্মৃতিসৌধ উদ্বোধক অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর নামও নেই।

আমরা যারা প্রথমে এখানে এসেছিলাম তাদের মনে হল এরকমটি তো হওয়ার কথা নয়। আমরা কি ভুল করছি? কিন্তু সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক ও শিল্পী হাশেম খান ও উপস্থিত আরও কয়েকজন জানালেন, না ভুল নয়। তারা নিজে দেখেছেন স্মৃতিসৌধটি যখন উদ্বোধন করা হয় তখন ঐ দু'জনের নাম ছিল।

১৯৭৫ সালের আগে এটি হওয়া সম্ভব নয়। তারপর শাসকরা এ দুটি নাম মুছে দিয়েছেন। এবং এমন একটি জায়গা থেকে যেখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতিকরণ শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। স্মৃতিফলক থেকে নাম মুছে দেয়া এর একটি উদাহরণ। কিন্তু শাসকদের মাথায় একবারও আসেনি যে, যার গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং যিনি বাংলাদেশের স্থপতি তাঁর নাম কি বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব? মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই কারচুপি কি এখনো আমাদের সহ্য করতে হবে?

মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীর শুরুতে সারাদেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে। আনাচে কানাচে বিজয় মেলা হচ্ছে, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক তারামন বিবিকে খুঁজে বের করা হয়েছে, 'মুক্তির গান' মুক্তি পেয়েছে।

এই দিনে আমাদের দাবি মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতায়ন প্রতিরোধ করুন। মিরপুর স্মৃতিসৌধের অবমাননা রোধ করে মূল ফলকে যা ছিল তা উৎকীর্ণ করা হোক। মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি বা নির্ভয়ের সংস্কৃতির চর্চা শুরু হোক।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

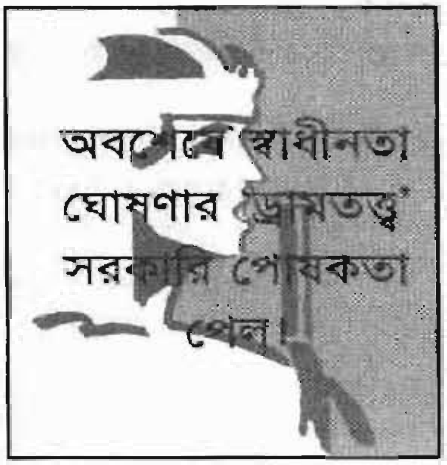

অবশেষে বিএনপি তথা সরকার স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'ড্রামতত্ত্ব'ই গ্রহণ করল বলে মনে হয়। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক শুরু করা হয় ১৯৭৫ সালের পর থেকে। তখন অনেকেই স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, দার্শনিক, তাত্ত্বিক, ঘোষক, পাঠক হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকেন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে প্রথম নিশান উত্তোলনের সময় বাঁশটি কে এনেছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক হয়। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন মরহুম জেনারেল জিয়াউর রহমান। কারণ তাঁর হাতে ক্ষমতা ছিল, সংগঠন ছিল আর ছিল গণমাধ্যম। জেনারেল জিয়া নিজে এ বিষয়ে খোলাখুলি তখন কিছু বলেননি, তবে তাঁর অনুসারীদের উৎসাহিত করেছিলেন।

এতদিন ব্যাপারটা ছিল এরকম। হ্যাঁ, শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন যাঁকে 'বঙ্গবন্ধু'ও বলা হয়, তিনি হয়তো বলেছিলেন স্বাধীনতার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং ফিল্ডে থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এটি প্রমাণের জন্য সবশেষে আবির্ভূত হন বিএনপি নেতা লে. জে. মীর শওকত আলী। গত বছর ও এ বছর এক সাক্ষাৎকারে তিনি পেশ করেন স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন তথ্য যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মান্নান এক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন 'ড্রামতত্ত্ব' হিসেবে।

২৬ মার্চ (১৯৯৫) এই 'জনকণ্ঠে'ই এক সাক্ষাৎকারে মীর সাহেব বলেন—"আমি বলব মরহুম জিয়াই স্বাধীনতার ঘোষক। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাত আনুমানিক একটার সময় চট্টগ্রাম সেনানিবাসে একটি ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি [মেজর জিয়া] প্রথমবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

ঐ একই তারিখের পত্রিকায় বিএনপির নেতা ও মন্ত্রী ও সহযোদ্ধা লে. ক. অলি আহমদ এর বিরোধিতা করে বলেন—"যারা লেখাপড়া জানেন তাঁদের এমন ভুল হওয়ার কথা নয়।"

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও উপযুক্ত দুই মন্ত্রীর প্রিয় 'স্যার' মরহুম জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে মেজর থাকাকালীন অবস্থায় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঘোষণা করেছিলেন—

ক. "আমি ঘোষণা করছি, আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে সার্বভৌম বৈধ সরকার গঠন করছি।" [উদ্ধৃত স্টেটসম্যান, ২৭-৩-১৯৭১]।

খ. আমি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীন বাংলা থেকে বলছি। ... আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পাঞ্জাবী দেশদ্রোহীদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র একদিন কিংবা দুইদিন।"

গ. "মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ... এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হবে। অন্য কোনো কারও নির্দেশ বাঙালি কোনোদিন বরদাশত করবে না, কোনো মার্শাল ল' বাঙালিরা মানে না। ... আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক। স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ

আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলার জয়।" [স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ২৬-৩০, ৩, ১৯৭১]

উল্লেখ্য, এসব ভাষণে বাংলাদেশী দূরের কথা, বাংলাদেশ শব্দটিই নেই, বরং শাশ্বত বাংলার উল্লেখ করা হয়েছে। জেনারেল জিয়ার নিজের স্বাধীনতার ঘোষণার কথাও নেই। প্রধানমন্ত্রী যে সংবিধান সংরক্ষণের জন্য একান্ত আগ্রহী সে সংবিধানেও এর উল্লেখ নেই। কিন্তু, জিয়ার সহযোদ্ধার ঐ কথা অস্বীকার, সংবিধানে এবং ইতিহাসে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বিএনপি সরকার স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লে. জে. মীর শওকত আলীর তত্ত্বই গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এ দেশের স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক লে. জে. জিয়াউর রহমান। তার প্রমাণ তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশের জন্য প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডায়েরি ১৯৯৫।']

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশ ডায়েরি ১৯৯৫' দেখুন। মন্ত্রণালয়ের 'এক্সটার্নাল পাবলিসিটি উইং' এটি প্রকাশ করেছে। ডায়েরির শুরুতে ইংরেজি ভাষায়, "ওভারভিউ" শিরোনামে বাংলাদেশ পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। "হিসটোরিক্যাল ব্যাক গ্রাউন্ড" অংশে মাত্র দু'জনের নাম আছে—একজন রবার্ট ক্লাইভ আরেকজন মেজর জিয়াউর রহমান। এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মেজর জিয়াই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা দূরে থাকুক, তাঁর নামটিও উল্লেখ করা হয়নি। প্যারাগ্রাফটি এরকম—

> "The nationalist struggle of the people of Bangladesh took a new shape under Pakistani rule followed by armed crackdown by Pakistan army on the innocent people of Bangladesh which led to the declaration of independence of Bangladesh on 26th March, 1971 by Ziaur Rahman ..."

আমরা জানি, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিএনপি ইতিহাস বিকৃতি শুরু করেছে। এর একটি কারণ, মনস্তাত্ত্বিক। জিয়াউর রহমান কিভাবে দল গঠন করেছিলেন তা সবার জানা। এক ধরনের বৈধতা অর্জনের তাগিদ থেকেই এ ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ভিত্তি হীনমন্যতা বোধ। কিন্তু, পৃথিবীর সবদেশে জাতি, জাতির জনক, স্বাধীনতা ঘোষণা, সংবিধান—এসব কিছুকে সব ধরনের বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা হয়। বাংলাদেশে তা হয়নি। কিন্তু এ ধরনের সরাসরি মিথ্যাচার বহির্বিশ্বের জন্য এক অমার্জনীয় অপরাধ। এটি শুধু সংবিধান বা দেশ বিরোধী কাজই নয়, জিয়াউর রহমানকেও অসত্যবাদী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি ও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করা হয়েছে। যেন স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক ধরনের ইয়ার্কি। এবং তাও করা হয়েছে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর শুরুতে।

সভ্য দেশ হলে, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব বা কর্মকর্তার শুধু চাকরিই যেত না তাদের এবং সরকারকে জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু, আমরা জানি, এখানে তাঁর কিছুই হবে না, কারণ বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

সাত আট বছর আগে অধ্যাপক সালাহ্উদ্দিন আহমেদ 'তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ তৈরি করা। প্রকল্পটি সমন্বয় ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমার। দু'বছর ধরে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। প্রায় এক হাজার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরে উপস্থিত হই চুকনগরে। আগে শুনেছিলাম, চুকনগরে ১৯৭১ সালের ২০ মে এক ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু, এই গণহত্যা সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। গণহত্যা বিষয়ক কোন বইতে বা স্বাধীনতার দলিলপত্রেও চুকনগর প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। চুকনগর কলেজের অধ্যাপক শফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। চুকনগর গণহত্যা সম্পর্কে তিনি আমাদের বিস্তারিত জানান। ভদ্রা নদীর তীরে নিয়ে যান। গ্রামের মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই দিনের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু, গণহত্যার ভয়াবহতা তখনও বুঝতে পারিনি। তবে, ঠিক করেছিলাম কখনও সুযোগ পেলে চুকনগরে এসে গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করবো। অবশ্য আমরা কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম।

সেই সুযোগ আসে নতুন শতকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন স্থাপিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'। এক ঝাঁক তরুণ নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছি। মূল উদ্দেশ্য, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ করা। ইনস্টিটিউটের একটি প্রকল্প ছিল 'ওরাল হিস্ট্রি' বা 'মুখের কথায় ইতিহাস।' এ প্রকল্পের অধীনে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। কোন বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গেলে এসব সাক্ষাৎকার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অন্য একটি প্রকল্প ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প'। এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে সে স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়া এবং স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করা। ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস দুটি প্রকল্পের সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নেয় চুকনগর গণহত্যার বিবরণ প্রস্তুত করার। এ কারণে ২০০০ সালের ৮-৯ সেপ্টেম্বর চুকনগর কলেজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা হয়। এ ক্যাম্পে ও আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশার মানুষজন। চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী প্রায় দুশো জনের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়। সেসব সাক্ষাৎকার ইনস্টিটিউটের আর্কাইভসে রক্ষিত আছে। এদিক থেকে দেখলে প্রায় এক দশক আগে যে কাজ শুরু করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতা।

দুই

চুকনগর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায় অন্তর্গত। খুলনার উত্তরে যশোর ও ফরিদপুর, পূর্বে ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এখন পাকা সড়ক ধরে অনায়াসে স্বল্প সময়ে চুকনগর যাওয়া সম্ভব। ১৯৭১ সালে তা সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ জমি ছিল নিচু, বিল, ডোবায় ভর্তি। তবে, চুকনগর থেকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার একটি পথ আছে। ১৯৭১ সালে এ পথ ধরেই মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে যেতে চেয়েছেন। ডুমুরিয়া থানার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগর বাজারটি তখনও ছিল বেশ পরিচিত। তিনদিকে নদী ঘেরা চুকনগরের বাজার। খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে ভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার সঙ্গে নদী ও সড়ক পথে তুলনামূলক ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চুকনগর ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদারদের গণহত্যা শুরু হয়। রাজাকার, শান্তি বাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। স্থানীয় বাঙালি ও বিহারী সহযোগীরা হানাদারদের থানা-ইউনিয়ন পর্যায়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে থাকে। প্রধান টার্গেট হয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগাররা। খুলনায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। এবং এরই সূত্র ধরে চুকনগর গণহত্যা সংঘটিত হয়।

চুকনগর গণহত্যার কারণ কি সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিভিন্ন বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। খুলনার বিভিন্ন থানায় হানাদারদের সহযোগীরা সাধারণ মানুষজনের ওপর অত্যাচার শুরু করে বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। ফলে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন যাবার পথটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে চুকনগর আসা। এবং তারপর দালাল অথবা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কারো সাহায্যে সীমান্তে পৌঁছা। হানাদার ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার বাড়লে, দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট থেকে রওয়ানা দেয়। নদীপথ বেশি কার্যকর হওয়ায় এ পথেই মানুষ এসেছিল বেশি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একই দিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এতো মানুষ চুকনগরে জমা হলো কীভাবে? এপ্রিল মাসের শেষ দিকে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার, লুটপাট, নারী নির্যাতন, হত্যা চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্থানীয় পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও শ্রেণী শত্রু নিধনের নামে একই কাজ শুরু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ডুমুরিয়া, বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মানুষ ভারতের পথে রওয়ানা দেয়।

সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ রওয়ানা হয়ে চুকনগর পৌঁছে। যাদের যাওয়া সম্ভব হয়েছে তারা চলে গেছে। বাকিরা ছিল যাওয়ার অপেক্ষায়। তাছাড়া হানাদাররা 'আক্রমণ করতে পারে' কিছু এলাকায় এই আশঙ্কার খবর ছড়িয়ে পড়লে ১৮/১৯ মে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষজন রওয়ানা হয় এবং ২০ তারিখ দেখা যায় চুকনগর এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, খেয়াঘাটের জনৈক বিহারী খানের সঙ্গে খেয়া পারাপারের মূল্য নিয়ে কারো কোন বচসা হয়েছিল। সেই খান 'দেখে নেয়া'র বাসনায় হানাদারদের খবর দিয়েছিল। হানাদারদের স্থানীয় সহযোগীরাও এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—'মালাউন' বা বিধর্মীদের পাক দেশ থেকে বের করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে তাদের টাকা, সোনাদানা লুট করা। এই হচ্ছে চুকনগর গণহত্যার পটভূমি।

২০ মে, বৃহস্পতিবার, সকাল থেকেই সবাই যাত্রার আয়োজন করছিল। অধিকাংশ পরিবারের ইচ্ছা ছিল ১০-১১টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে রওয়ানা হবে। অন্যদিকে, চাপা আতঙ্কও ছিল খানিকটা। কারণ, বিহারী খানের সঙ্গে বচসা হয়েছিল। বেলা দশটার দিকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে হানাদারদের দুটি ট্রাক বর্তমান চুকনগর কলেজের (৭১-এ কলেজ ছিল না) পশ্চিম পাশে কাউতলায় এসে পৌঁছায়। এই এলাকাটুকু তখন পাতখোলা নামে পরিচিত ছিল স্থানীয়দের কাছে। হানাদারদের সংখ্যা বেশি ছিল না। খুব সম্ভব এক প্লাটুন সৈন্য হয়ত এসেছিল। হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্রাক থেকে নেমেই তারা গুলি করতে শুরু করে এবং চুকনগর পরিণত হয় এক মৃত নগরীতে।

গণহত্যা সম্পর্কে সব প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য একই রকম। প্রত্যেকেই হানাদার বাহিনীর আগমন ও নির্বিচার হত্যার একই রকম বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের ডিটেলসে খানিকটা পার্থক্য আছে। একটির পর একটি বিবরণ যখন শুনেছি তখন গণহত্যার স্বরূপটি অনুভব করতে পেরেছি। 'ওরাল হিস্ট্রি' এভাবেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। ভাবতে অবাক লাগে, স্বজন-পরিজন হারিয়ে কীভাবে পরিবারগুলো বেঁচেছিল! চুকনগরে এই সাক্ষাৎকার শুনতে শুনতে আবেগে আপ্লুত হয়ে জনকণ্ঠের রিপোর্টার ফজলুল বারী জনকণ্ঠে লিখেছিলেন, "লাশের ওপর লাশ, মায়ের কোলে শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা মেয়েকে বাঁচাতে জড়িয়ে ধরেছিল। মুহূর্তে সবাই লাশ হয়ে যায়। ভদ্রানদীর পানিতে বয় রক্তের বহর, ভদ্রা নদী হয়ে যায় লাশের নদী। কয়েক ঘণ্টা পর, পাকিস্তানিদের গুলির মজুত ফুরিয়ে গেলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে।"

চুকনগরে পাকিস্তানি হানাদাররা কত মানুষ খুন করেছে তার সঠিক সংখ্যা কেউ জানাতে পারেনি। রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী সেদিন একই জায়গায় কমপক্ষে ছয় থেকে দশ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড চালাবার মাঝেও হানাদাররা কিছু নারীকে ধর্ষণ করে, কয়েকজনকে ট্রাকে করে তুলেও নিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় লোকজন লাশ পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ে। অধিকাংশ লাশই ভদ্রা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিছু গণকবরে সমাহিত করা হয়।

তিন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইতোমধ্যে সহস্রাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশই স্মৃতিকথা, দিনলিপি, যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের, অহংকারের দিকটি যত আলোচিত হয়েছে সে মাত্রায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, গণহত্যার দিকগুলো রয়ে গেছে উপেক্ষিত।

আসলে বাঙালি ভালোবাসে বীরত্বগাথা। এর একটি কারণ বোধহয়, ক্ষুদ্র এক ব-দ্বীপে তার বসবাস। মাত্র কিছুদিন হলো বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সে দেখেছে

আশপাশে নির্যাতিত, গরিব, ক্ষুদ্র সব মানুষ। চিন্তার জগতটাই তার ছোট। তাই সাহসী কাউকে দেখলেই সে চমৎকৃত হয়। সে সবসময় বীরের কথা বলতে চায়, যদি সে বীর হয় 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'-এর মতোও। এ যাবত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বইপত্র দেখলে এ কথাটি আরো স্পষ্ট হবে। শুধু রণগাথা, বীরত্বের ব্যঞ্জনা। না, নির্যাতন, অত্যাচারের কথা তেমন নেই। এ ইঙ্গিতও নেই কোথাও যে, অত্যাচার ও বীরত্বও এই সূত্রে গাঁথা। মানুষ অত্যাচারিত হয়, নিপীড়িত হয়, বিদ্রোহ করে এবং তার পর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে। মুক্তিযুদ্ধ কি তাই নয়? পাকিস্তানের কলোনির অধিবাসী হিসেবে বাঙালি অপমানিত, শোষিত হয়েছে, ১৯৭১-এর শুরু থেকে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা রুখে দাঁড়িয়েছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। লড়াই করেছে বীরের মতো। তাই শুধু বীরত্বই যদি হয় ইতিহাসের গাথা তাহলে পটভূমিকা থাকে অস্পষ্ট, অজানা এবং সেই বীরত্বের ব্যঞ্জনাও হারিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের গাথা কি কম রচিত হয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান বা ইতিহাসে। কিন্তু বীরত্বের গাথা কতটুকু মনে রেখেছে বাঙালি? মনে রাখলেও রেখেছে খুব অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে রাখলে তো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজাকার হতো না। 'আলবদর মাওলানা' মান্নান বা গোলাম আযম তো প্রকাশ্যে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারত না। কারণ, এই বীরত্বের পটভূমিকাটি সবসময় স্পষ্ট হয় নি, অনবরত বলা হয় নি দু'টি নতুন প্রজন্মের কাছে।

তা ছাড়া বাঙালির কন্ট্রাডিকশনের আরেকটি দিক উল্লেখ্য। বাঙালি আবার কোনো বীরকে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। প্রথম সুযোগে তাকে ধুলায় ফেলে দিতে বাঙালি কার্পণ্য করে না। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব কম জাতিরই আছে। কিন্তু বাঙালি যেহেতু মানুষ এবং মানুষ আর কিছু না হলেও অত্যাচার-অপমানের কথাটা মনে রাখে। বাঙালিরও তাই আর কিছু না হোক অত্যাচারের কথাটা মনে থেকেছে। গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে এ কথাটা টের পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ইউরোপের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে উপন্যাস, গল্প থেকে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে গান—সবখানে কি বারবার ঘুরেফিরে আসে না হিটলারের সেই ক্রুর মুখ আর গুলির শব্দ। ইউরোপের শহরে-বন্দরে কি এখনো চোখে পড়ে না ফ্যাসিস্ট বা নাৎসিদের বীভৎসতার স্মারক? এর কারণ, সেখানে বীরত্বের গাথা যেমন রচিত হয়েছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অত্যাচারের গাথাও। এবং তা বর্ণিত হয়েছে প্রবলভাবে, জোরালোভাবে যা এখনো মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়, যে-কারণে এখনো অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অসামান্য সব চলচ্চিত্র। নির্মিত হয় 'গণহত্যা' জাদুঘর। জেনেশুনে ইউরোপ সে-কথা মনে রেখেছিল যে—মানুষ সব ভুলতে পারে কিন্তু অত্যাচার-অপমানের কথা ভোলে না।

আমরা আবার অনেক সময় অত্যাচারকে মনে করি অপমান। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গড়নে এ ধরনের হীনমন্যতা সবসময় ছিল এবং আছে। উদাহরণ দেয়া যাক। একজন শিক্ষককে পাঁচজন ছাত্র এসে পিটিয়ে গেল বা একজন তরুণীকে দু'জন মিলে ধর্ষণ করল, তাতে টিটি পড়ে গেল। সমাজ এসব ঘটনাকে ব্যক্তির অপমান হিসেবে চিহ্নিত করে লুকাতে চায়। ঘটনাটা উল্টো করে দেখি-না কেন? পাঁচজন একজনকে পিটাল,

যাকে পিটাল তার অপমান হয় না, বরং ভীরুতা প্রমাণিত হয় পাঁচজনের এবং সেই ভীরুতা হলো অপমান। দু'জন এক তরুণীকে ধর্ষণ করলে তরুণীটি কেন অপমানিত হবে? অপমানিত হবে যারা তাকে রক্ষা করতে পারে নি, অর্থাৎ আশপাশের মানুষ, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ। কারণ তাদের ভীরুতার কারণেই তরুণীটি ধর্ষিত হয়েছে। অপমানিত হবে সেই সব পরিবার যেসব পরিবারে তারা বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয় নি। কারণ সেইসব পরিবার তাদের শেখায় নি সভ্যসমাজে কিভাবে বসবাস করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর অহংকারের ঘটনা প্রবাহ আমাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘার সঞ্চার করে নিশ্চিতভাবে কিন্তু অপমানের বা নির্যাতনের ঘটনার আবেদনও কিছুমাত্র কম নয়। বরং অপমানের ঘটনা জাতির অনুভূতিতে যে গভীর ক্ষত এবং তা যে সংহতি গড়ে তুলতে পারে, তা গৌরবের আনন্দ দিয়ে সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা অনালোচিত বিষয়ের উপাত্ত সংগ্রহে মনোনিবেশ করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের কম আলোচিত দিকগুলোর একটি হচ্ছে গণহত্যা। পাকবাহিনী একাত্তরে শহর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত অগণিত গণহত্যা চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গণহত্যার শিকার নিম্নবর্ণের মানুষ যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, তারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। ওয়াহিদুল হক 'জাহানারা ইমাম স্মারক' বক্তৃতায় যথার্থই বলেছেন যে, স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে 'গণহত্যার চেতনা' প্রধান, "গণহত্যাকে, ত্রিশ লক্ষের বলিকে প্রায় চার লক্ষ বাঙালি নারীর সম্ভ্রম আহুতিকে ভুলতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কিছুই বাকি থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের আদিতে আরম্ভ এই দিনে গড় দশ হাজার বাঙালি নিধনের নিরন্তর মোচ্ছব, একে ভুলিয়ে দিয়েই আরম্ভ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উৎসাধন। ... একমাত্র গণহত্যার চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিকষিত হেমে পরিণত করতে পারে।"

এ কারণে আমরা ছুটে গেছি বারবার চুকনগর। আগেই উল্লেখ করেছি গণহত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি ওরাল হিস্ট্রি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়ত, ঘটনাকেন্দ্রিক। এখানে আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই গ্রহণ করেছি। চুকনগর গণহত্যার বিষয়টি সাধারণ মানুষ কীভাবে দেখেছেন, গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, আহত হয়ে দৈবাৎ প্রাণে বেঁচে গেছেন, শহীদ পরিবারের সদস্য এ ধরনের প্রায় দুশো নারীর পুরুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে। যাঁরা গ্রন্থনা করেছেন এ সংকলন তাঁরা নিজেরাও আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, নোট নিয়েছিলেন এবং ইন্সটিটিউটের সংগৃহীত উপাদান পরীক্ষা করে ৯০টি সাক্ষাৎকার সংকলন করেছেন। *"এবং এটাই প্রমাণিত হয়েছে এই গবেষণায় যে চুকনগরেই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি ঘটিয়েছিল পাক বাহিনী। একটি এলাকায় এত কম সময়ে এত মানুষ আর হত্যা করা হয়নি।"*

চার

সাক্ষাৎকারগুলো পড়লে দেখা যাবে কী নিষ্ঠুরতায় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা মানুষকে হত্যা করেছিল। যারা বেঁচেছিলেন তারা নিয়তি মেনে নিয়েছেন,

প্রিয়জনদের হারিয়ে, অসম্ভব দৃঢ়তায় সেই শোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা ফিরে গেছেন নিজ নিজ এলাকায়। অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। কেউ তাদের দিকে সহানুভূতি বা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। একমাত্র বঙ্গবন্ধু সরকার তাদের সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিল। ব্যাস ঐ পর্যন্তই। কিন্তু, তা নিয়ে কোন অভিযোগ করেনি এই পরিবারগুলো। হানাদার বাহিনীর সহযোগীরা তাদের আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে, কেউ কেউ বেঁচে আছে এখনও। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো একবাক্যে শুধু বলেছে, তারা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চায়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো।

বেশ কয়েক বছর আগে পাকিস্তান-বাংলাদেশ ক্রিকেট ম্যাচের সময় চাঁটগায় খুব হইচই। মুক্তিযুদ্ধের বই সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে আমাকে বলছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, 'ঘটনাটি অবশ্য বেশ আগের। রিকশায় যাচ্ছি। রিকশাঅলা বলল, পাকিস্তানিগো লয়ে এত হইচই। তারা কি অত্যাচার করছে তা আমাগো গ্রামের গাছের পাতাও সাক্ষী দিবো।' স্বাধীনতার পর পর ক্রিকেট নিয়ে হৈচৈয়ের দৃশ্যটি দৃষ্টিকটু লেগেছে, আমরা যাদের অশিক্ষিত বলি, সে রিকশাঅলার।

যে পেরিয়েছে ঐ সময় এবং এখনো তীব্রভাবে অনুভব করে সে সময় তার পক্ষেই এ ধরনের মন্তব্য সম্ভব। এটি বোধের ব্যাপারে। *অসউইৎজের* কথা এখনও বলা হয়। সারা বিশ্বের লাখ লাখ লোক এখনো স্মরণ করে সেই গণহত্যার কথা। অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু *অসউইৎজ* বা এ ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক নেই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আছে। আছে বললে বোধহয় ঠিক হবে না, একে সুকৌশলে বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে। আমরা জোরাল প্রতিবাদ জানাইনি। ফলে একটি প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের পুরো বিষয়টিই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যখন পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন আমরা এর প্রতিবাদ করিনি কিন্তু 'মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ' করে মুখে ফেনা তুলেছি। অথচ, ঐ যে রিকশাঅলা যার গ্রামের গাছের পাতাও সাক্ষী দেবে হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের সে কিন্তু বিস্মিত হয়েছে পাকিস্তানিদের নিয়ে মাতামাতি করায়। তাই প্রশ্নটি করেছে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, শহীদদের রক্তের দাগ শুকোতে না শুকোতে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকা শহরের মানুষজন হর্ষোৎফুল্লভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই হল বাঙালির বোধ!

এ পরিপ্রেক্ষিতেই সিভিল সমাজ থেকে দেশীয় ও বিদেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু, আশ্চর্য হলেও সত্যি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারতো হয়-ই নি বরং তারা রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। ফলে অনিবার্যভাবেই চলে আসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা দেশের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড, লুট, ধর্ষণ বা বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিল তারাই যুদ্ধাপরাধী। হানাদারবাহিনীর নীতিনির্ধারক বা যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত তারাও যুদ্ধাপরাধী। স্থানীয় যেসব অধিবাসী এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারাও যুদ্ধাপরাধী।

এ ধরনের মুক্তিসংগ্রামের পর বা যুদ্ধের পর সবসময়ই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশেও হওয়ার কথা ছিল। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত জানিয়েছেন, হানাদারবাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭২-এর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এ সংখ্যা হ্রাস করে ১৯৫ এবং তারপর তা ১১৮তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি। তাঁর মতে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো গোপন সমঝোতা হয়েছিল কি না কে জানে? নাকি বাংলাদেশ সরকার আসলেই যুদ্ধাপরাধের প্রমাণাদি যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিঃসন্দেহ ছিল যে, যুদ্ধাপরাধ হয়েছে।

তবে দীক্ষিত এও জানিয়েছেন যে, যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তা চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে—"The substantative motivation for Mujibs decision might have been his long-term strategy of not doing any thing which would prevent recognition of Bangladesh by Pakistan and other Islami countries. In the larger interest of peace and normalcy in the sub-continent Mujibur Rahman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে কি প্রার্থিত সেই 'stability' এসেছে? না উপমহাদেশে সামগ্রিকভাবে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে? বরং বলা যেতে পারে, যুদ্ধাপরাধের বিচার না হওয়ার কারণে পাকিস্তানি জান্তা সাহসী হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের দেশে নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আফগানিস্তানের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তারপর আবার কাশ্মীরেও। বাংলাদেশেও একইভাবে, বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা দেশের শান্তি, স্বাভাবিকতা বিনষ্টে তৎপর হয়েছে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি মিরপুরে দুটি বধ্যভূমি খনন করা হয়েছে এবং তা থেকে নিহত মানুষের হাড়গোড়, মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরকম আরও বেশ কিছু বধ্যভূমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি আমাদের কাছে আবার নতুনভাবে ফিরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আরো জোরালো হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিক আহমদ বলেছেন, প্রচলিত যে আইন আছে তা দিয়েই যুদ্ধাপরাধের বিচার হতে পারে। কিন্তু কোনো সরকার তাতে আগ্রহী হয়নি, হবে কি না সন্দেহ।

ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পিএন হাকসার শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার বাংলাদেশেই করতে হবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু সে 'নিয়ম' আর এখন নেই। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেও হতে পারে রোম চুক্তি অনুযায়ী। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক ফোরামগুলোর উচিত

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সে দাবি উত্থাপন। যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশে বসবাস করার কারণে আজ রাজনীতি, সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এর ফলে সমাজের একটি অংশ (মানুষ) যে যুদ্ধাপরাধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে না তার গ্যারান্টি কী? এবং তা হয়ে উঠলে কি দেশ ও জাতির জন্য বিষয়টি মঙ্গলজনক হবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বিচারের অনেক ধারণাও চ্যালেঞ্জ করা উচিত। জনসমক্ষে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যার বিবরণ ছাপা হয়েছে তার আবার সাক্ষ্যপ্রমাণ কী? আইন মানুষের সৃষ্টি, মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের ফ্রেমে নিয়ে আসার জন্য। যে আইনে বিচার পাওয়া যায় না সে আইন আবার কিসের আইন?

পাঁচ

অনেকে বলেন, কেন আপনারা এখনো এসব বিষয়ে লেখালেখি করেন? এত বছর পর কে আবার রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করেন? পুরনো ক্ষত জাগিয়ে লাভ কী? আপনারা কয়জন এগুলো করে নিজেদেরও বিপদাপন্ন করছেন। তাছাড়া রাজনীতির এমন অবস্থা হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের কথা যিনি বলেন, তাঁকেই অভিধা দেয়া হয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে।

আমি জানি না, রাজনৈতিক দলগুলো এসব বিষয় নিয়ে ভাবে কি না বা কেয়ার করে কি না। আমি তা জানতেও চাই না। কিন্তু আমি কেয়ার করি। আমরা যাঁরা লিখছি তাঁরা কেয়ার করি, যাঁরা এ লেখা পড়ছেন তারা কেয়ার করেন। অজস্র মানুষ আছেন বাংলাদেশে যাঁরা কেয়ার করেন, হয়ত প্রকাশ্যে সে কথা বলেন না বা মিটিং-মিছিলে আসেন না। এ প্রসঙ্গে তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদের চলচ্চিত্র 'মুক্তির কথা' মনে পড়ছে। সেখানে সামান্য এক মানুষের জবানবন্দি বিধৃত হয়েছে। তাঁর গ্রামে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এক রাজাকার। সেখানকার মানুষ বলছেন, যদি আমরা রাজাকার নির্বাচিত করে থাকি তাহলে আমরা ৯০ ভাগই তো রাজাকার হয়ে গেছি। কুত্তার মতো হয়ে গেছি, না হলে রাজাকার চেয়ারম্যান বানাই!

এ ধরনের মনোভাব নিয়ে অজস্র মানুষ বসবাস করছেন। যদি সে সংখ্যা অজস্র না-ও হয়, তাহলেও অন্তত আমরা ১০০ জন হলেও কেয়ার করি। এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন হিসেবে, ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে, একজন লেখক হিসেবে আমি কেয়ার করি। তাই যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই। এবং এ কারণেই এ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে সম্পাদনা করেছি। যদি কখনও এ দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় তাহলে যেন এদের বক্তব্যকে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

শুধু তাই নয়, আমি এও মনে করি, আমাদের এসব কথা বলে যেতে হবে। আপনাকেও বলতে হবে আপনার সন্তানদের। এসব কথা সোনালি শস্যের মতো বেড়ে উঠবে, ঘিরে ধরবে একসময় নতুন প্রজন্মকে। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, যে স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে তাদের, কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

বহুদিন পর ১৯৭১ সালের ঘাতক বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথমবার সব ধরনের [এদের অনেকে যে আগে এ দাবি করেন নি তা' নয়] রাজনৈতিক দলও একই দাবি তুলছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান, সেনা প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এর যৌক্তিকতা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। সিভিল সমাজ থেকে যে সব দাবি উঠেছে তার সারাংশ হলো—

১. যুদ্ধাপরাধীদের স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচার করতে হবে এবং বাদী হবে সরকার/রাষ্ট্র
২. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল/রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে
৩. যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচন করতে পারবে না

বিদ্যমান আইন ও সংবিধানের আলোকেই তা করা যেতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সামরিক সরকারের একটি অংশ যার নেতৃত্বে ছিলেন ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন, এটি মানতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সরকারের হাতে অনেক কাজ। সুতরাং বাড়তি এসব দায়িত্ব সরকার নিতে পারবে না। অন্যদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আদালতে যেতে পারে। হয়ত এতে উৎসাহিত হয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালের আলবদর মুজাহিদ ও কাদের মোল্লা এবং শাহ হান্নান নামে প্রাক্তন এক সচিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেছিলেন। ঐ ৩ জন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন। আদালত তা তদন্তের জন্য থানায় প্রেরণ করে। কিন্তু, সরকার অনুমতি না দেয়ায় পুলিশ তা আদালতে ফেরত পাঠায়। ব্যারিস্টার মঈনুল বলেছেন, ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারে না। তা হলে প্রশ্ন, মাত্র কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি, ড. কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করলেন কীভাবে? বা আরো আগে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে? এসব আশংকা করেই আমরা দাবী করছি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা সরকারকেই করতে হবে। মঈনুল হোসেন আরো বলেছেন, ৩৬ বছর যারা বিচার করে নি, তাদের বলুন। ব্যারিস্টার মঈনুল ৩৬ বছর আগে সরকারি দলের এম.পি ছিলেন দেখেই তো তাঁর কথামতো তাঁর কাছেই দাবি তোলা হচ্ছে।

ঐ একই ধারায় জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন—

১. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, হয়েছিল গৃহযুদ্ধ
২. সুন্দরী নারীর জন্য যুদ্ধ হয়েছিল
৩. ভারতের স্বার্থ রক্ষায় যুদ্ধ হয়েছিল
৪. মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিচার করতে হবে।

জামায়াত দেশে স্টাবলিশমেন্টের সমর্থন পাচ্ছে। বিদেশেও কেউ কেউ একই রকম কথাবার্তা বলছেন। অনেকে বলতেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ১৯৭১ সালের

পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটিয়েছে। এসব কথা আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে।

বিদেশে প্রচারের ধরনটা অন্যরকম। জামায়াত বা জামায়াত সমর্থকদের মতো স্থূল নয়। পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকরা ১৯৭১ সালের গণহত্যা খাটো করে দেখার জন্য যে ধরনের প্রচার করছে, বিদেশি 'অ্যাকাডেমিশিয়ান'দের কেউ কেউ সে কৌশল নিয়েছে। কৌশলটা এরকম, কিছু হত্যা হয়েছিল, যুদ্ধ হলে এমনটি হয়, তবে গণহত্যা হয় নি। যুদ্ধে ধর্ষণ এক আধটু হয়, সেটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তবে যে ২-৪ লক্ষ ধর্ষণের কথা বলা হয় তা 'ফ্যান্টাসটিক'। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ জনৈক গবেষক শর্মিলা বসুর কিছু লেখালেখি।

লন্ডন থেকে আমার এক তরুণ সহকর্মি জানান পাকিস্তানীরা বিজয় দিবস উপলক্ষে শর্মিলা বসুকে নিয়ে এসেছে আলোচনার জন্য। কী করা? আমি বললাম, অনেকে খবর হওয়ার জন্য এগুলি করে। আগে এসব উপেক্ষা করতাম। এখন দেখছি, উপেক্ষা করলে তাদের মিথ্যাচার সত্যে পরিণত হয়ে যায়, যেভাবে জেনারেল জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে গেলেন। তাঁকে পরামর্শ দিয়েছি, নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসব মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে, যেভাবে আমরা করছি বাংলাদেশে। প্রয়োজন হলে, এসব যারা বলে ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরও ত্যাগ করতে হবে সামাজিকভাবে।

শর্মিলা বসুর প্রবন্ধ আগে দেখিনি। এখন কৌতূহল হলো, ইন্টারনেট থেকে তা সংগ্রহ করলাম। এটি ছাপা হয়েছিল মুম্বাইয়ের বিখ্যাত পত্রিকা *ইপিডব্লিউ*-তে। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হলো, সম্পাদক এটি ছাপলেন কীভাবে? এটি শুধু মিথ্যাচার-ই নয়, পুরো একটি জাতিকে আঘাত করা। *ইপিডব্লিউর* প্রতিষ্ঠাতা শচীন চৌধুরী বেঁচে থাকলে এই অনাচার সম্ভব হতো না। আগেই বলেছি, আগে হলে এসব লেখালেখি উপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন করা যাবে না কারণ এ প্রবন্ধ পুরো একটি জাতির বিরুদ্ধে।

গবেষকরা কোনো প্রবন্ধ পড়ার আগে তার উৎস দেখেন। শর্মিলার প্রবন্ধের ধরনটা অ্যাকাডেমিক। তাই উৎস দেখলাম। [এখানে বলে রাখা ভালো, উৎসের দৈর্ঘ্যের ওপর প্রবন্ধের মান নির্ভর করে না]। তার প্রবন্ধের নাম বেশ দীর্ঘ, ১৪টি শব্দের শিরোনাম। আজকাল পাশ্চাত্যে এ ধরনের একটা ফ্যাশন হয়েছে, এক্সোটিক সব শিরোনাম ব্যবহার করা। শিরোনাম দিয়ে একটা অ্যাকাডেমিক ভাব আনা। শর্মিলা বোসের প্রবন্ধের নাম- 'লুজিং দা ভিকটিম : প্রবলেমস অব ইউজিং উইম্যান অ্যাজ উইপনস ইন রিকাউন্টিং দি বাংলাদেশ ওয়ার।' উৎসের মধ্যে আছে, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রের* ৮ম খণ্ড, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত একটি সংকলন, শর্মিলার নিজের একটি প্রবন্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের একজন গবেষকের একটি বই, লন্ডনের জামায়াত ভিত্তিক প্রকাশনার একটি বই আর পাকিস্তানের একটি। এর মধ্যে আছে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত *শ্বেতপত্র* ও পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রধান জেনারেল নিয়াজি ও আরেকজন পাকিস্তানি জেনারেল মিঠা, তার নেয়া পাকিস্তানী কিছু সেনা অফিসারের সাক্ষাৎকার অন্যতম। অর্থাৎ, তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন পাকিস্তানী সূত্রের ওপর। এসব সূত্র তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এই উৎস বিশ্লেষণ করলে শর্মিলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. শর্মিলার প্রবন্ধের মূল ফোকাস ১৯৭১ সালের ধর্ষিতা নারী। তার বক্তব্য, বাংলাদেশের লেখক/গবেষক ও তাদের সমর্থক বিদেশি গবেষক/লেখকদের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ২ থেকে ৪ লাখ। আসলে সংখ্যা কয়েক হাজার। তবে এর মধ্যে বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত বিহারি নারীও আছে। অর্থাৎ ধর্ষিতা বাঙালি নারীর সংখ্যা আরো কম। এবং এগুলি যুদ্ধজাত নয়। তার ভাষায়–

"The available evidence confirms the occurrence of rape but does not support claims of hundreds of thousands of women raped by the army in East Pakistan in 1971. The seven case studies in Neelima Ibrahim's book, the opportunistic raped admitted by the army and the reports of massacres of non Bengali (West Pakistani and Bihari) men. Women and children by Bengalis, suggest that several thousand women may have been victims of sexual violence in 1971."

২. বাংলাদেশের লেখালেখিতে যে সব ধর্ষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেগুলি অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত। উদাহরণ হিসেবে তিনি রাবেয়া, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ও চম্পা নামে একটি মেয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের ভাষ্য মিথ্যা এবং প্রিয়ভাষিণী তো স্বেচ্ছায় থেকে গেছেন ধর্ষিত হওয়ার জন্য [কারণ, তিনি পালান নি]।

৩. পরিকল্পিত ধর্ষণের কোনো নীতি পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রহণ করে নি। ধর্ষণ কিছু হয়েছে তবে সেগুলির সঙ্গে সবাই জড়িত–পাকিস্তানী সৈন্য, বাঙালি, বিহারি সব। এবং এগুলি হচ্ছে 'oppurtunistic sexual crimes in times of war' কারণ, পাকিস্তানী সৈন্যরাতো ভদ্র, পেশাদার।

৪. বাঙালিরা বিহারিদের হত্যা করে 'এথনিক ক্লিনজিং' চালিয়েছিল।

শর্মিলা লিখেছেন, ধর্ষণের বিষয়টি রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। কত ধর্ষণ হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। অনেকে চিৎকার করে এসব কথা বলে 'শত্রু' কে নিন্দিত করতে চায়। উদ্দেশ্য, 'ভিকটিমহুডকে' মহিয়ান করা আদর্শের খাতিরে এবং ক্ষতিগ্রস্ত [অর্থাৎ ধর্ষিত] যারা তাদের প্রতি কোনো 'কনসার্ন' নেই [অর্থাৎ আসল ক্ষতিগ্রস্তরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন]।

সত্যি বলতে কী গত ৩৬ বছরে এ ধরনের প্রবন্ধ এই প্রথম পড়লাম। পাকিস্তানীরাও এভাবে নিজেদের পক্ষালম্বন করেনি। ১৯৭১ সালে ৩৬ জন পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি [উদাহরণ 'সেই সব পাকিস্তানী' ও 'পরাজিত জেনারেলদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ']। তারা গণহত্যা ধর্ষণকে নানাভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন কিন্তু এ ভাষায় লেখেন নি বরং ছিলেন অ্যাপলোজেটিক।

শর্মিলার বিবরণের কিছু নমুনাও উল্লেখ করতে হয়। আগাগোড়া মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বলেছেন 'গৃহযুদ্ধ'। লিখেছেন, গৃহযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটির মতো। যুদ্ধের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। ডিসেম্বরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ হাজারে। সশস্ত্র সিভিল পুলিশ ও অসৈন্যের সংখ্যা ছিল

১১ হাজার। সুতরাং, ৩৪ হাজার সৈন্যের পক্ষে একটি দেশ পরিচালনা করে, যুদ্ধ করে এত ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। তার মতে, হামুদুর রহমান কমিশনের প্রধান একজন বাঙালি বিচারপতিও তা স্বীকার করেছেন।

শর্মিলা বাংলাদেশে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করেছেন। অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তারা যুদ্ধের কথা বলেছেন, হত্যার কথা বলেছেন কিন্তু ধর্ষণের কথা বলেন নি। তার মানে, পাকিস্তানীরা মহিলা ও শিশুদের টার্গেট করে নি। তার ভাষায়, "....women were not harmed by the army in these events except by chance such as in crossfire. The pattern that emerged from these incidents was that the Pakistan army targeted adult males while sparing women and children." অবশ্য, তিনি এও স্বীকার করেছেন, অন্যখানেও কেউ ধর্ষিত হতে পারে, মহিলা ও শিশুদেরও সৈন্যরা ক্ষতি করতে পারে। বিহারিদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পাকিস্তানী শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে তার মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় তার সত্যতা মিলেছে। পাকিস্তানী সেনা অফিসাররাও তাকে একই কথা বলেছেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও পেয়েছে।

ধর্ষিতা রাবেয়া খাতুন অথচ তার বয়ান শিক্ষিতের। আখতারুজ্জামান মণ্ডল তার বইতে গণধর্ষণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ঠিক নয়। নয়নিকা মুখার্জি এ সংক্রান্ত যেসব গবেষণা করেছেন তাতেও এসব সমস্যা সম্পর্কে লিখেছেন তবে তার মতামত বাঙালিদের কাছাকাছি। ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদিতে কোনো নারী আটকে [কমফোর্ট উইমেন] রাখা হয়নি। তার ভাষায় "The allegation that the army maintained 'comfort women'-even the numbers were nowhere close to Bangladeshis claim is a serious charge and merits further inquiry." নীলিমা ইব্রাহিম তার 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' তে যাদের কথা আলোচনা করেছেন তাদের অধিকাংশ বাঙালিদের দ্বারা ধর্ষিত যাদের পরে মিলিটারিদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এরা অপহৃত হয়েছেন। পাকিস্তানীরা যদি এদের কিছু না করে থাকে তবুও এদের 'ধর্ষিতা' বলা যায়। ইত্যাদি।

দুই

শর্মিলা বসুর প্রতিটি লাইনের বিরুদ্ধেই তথ্য প্রমাণ সহ প্রতিবাদ করা যায় কিন্তু আমি তা না করে কিছু উদাহরণ দেব মাত্র।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিনদেশের দলিলপত্রে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে ৯০,৩৬৮ জন। শর্মিলা কি বলবেন তার হিসাবের বাইরে ৬০ হাজার সৈন্য এল কোথা থেকে? রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্য সংখ্যা জানা যায় নি। এদের সংখ্যা ১১ হাজারের বেশি ছিল এবং অধিকাংশই ছিল সশস্ত্র। সৈন্যরা দেশ চালায় নি। চালিয়েছে অবরুদ্ধ দেশের এবং পাকিস্তানের সিভিল

প্রশাসনের মানুষজন। একটি দেশের সবাই যুদ্ধে যেতে পারে না বা পালাতেও পারে না। এই প্রশাসনের অনেকেই আবার সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগী জামায়াত, মুসলিম লীগ বা রাজাকার আলবদররা ছিল ঐ বাহিনীর সশস্ত্র সহযোগী। হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ সবাই মিলে করেছে। এর অর্থ এ নয় যে এরা সবাই ধর্ষণ করেছে। একটি সৈন্য একাধিক জায়গায় একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। সশস্ত্র ব্যক্তির সংখ্যা যদি দেড়লাখের মতো হয় তা হলে ২ লক্ষ ধর্ষণ সম্ভব কিনা? রুয়ান্ডাতে ১০০ দিনে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ ধর্ষিত হলো কীভাবে? এ সংখ্যাতো পাশ্চাত্যের বিশ্লেষকদের দেয়া।

পাকিস্তানীরা পরিকল্পিত ধর্ষণ করেছিল কিনা বা যত্রতত্র নারী ধর্ষণে মেতে উঠেছিল কিনা আমি সে সম্পর্কে কিছু তথ্য দেব এবং কোনো বাঙালির তথ্য উল্লেখ করব না কারণ বাঙালিদের তথ্য শর্মিলা বোসের পছন্দ নয়। উল্লেখ্য বোস নিজের বিশ্লেষণের জন্য নিয়াজির তথ্য ব্যবহার করেছেন। নিয়াজি একটি মেমোতে লিখেছিলেন, 'আমি চাই সব সৈন্য শৃঙ্খলার প্রতীক হবে।' তারা 'কোড অব অনার মানবে' কারণ তারা 'জেন্টলম্যান অ্যান্ড অফিসারস।'

নিয়াজির একটি মেমোর উল্লেখ করছি যেখানে তিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যাপক হত্যা, লুট ও ধর্ষণের কথা বলেছেন। তার ভাষায়–"Since my arrival, I have heard numerous reports of troops indulging in loot and arson, killing people at random and without reason in areas cleared of the anti state elements; of late there have been reports of rape and even the West Pakistanis are not being spared; on 12 Apr. two West Pakistani women were raped, and an attempt was made on two others." শুধু তাই নয় সৈন্যরা ফেরত যাবার সময় লুটের মালও নিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে। তার ভাষায়, "I gather that even officers have been suspected of indulging in this shameful activity and what is worse, that in spite of repeated instructions, *comdo* have so far failed to curb this alarming state of indiscipline. I suspect that COS and OSC units/sub-units are protecting and sheilding such criminals." সেনাপতি নিজেই তার সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খল ক্রিমিনাল বলেন আর শর্মিলা ইঙ্গিতে করেন তারা 'জেন্টেলম্যান'। শর্মিলা বোস, কোন দেশে দক্ষ ও পেশাদার বাহিনী সিভিল সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে রাখে? বা নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করে, শাস্তি দেয়, লুট করে, ধর্ষণ করে?

পরিকল্পিত ধর্ষণ হয় নি? তবে, মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের ১ মার্চের টেলিগ্রাম দেখুন– "six naked female bodies at Rokeya Hall Dacca U. Feet tied togethers. Bits of rope hanging from ceiling fans. Apparently raped, shot and hung by their heels from fans."

শর্মিলা যদি ভারত থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে কলকাতা থেকে পত্র-পত্রিকাগুলি দেখতেন তা'হলে এরকম অনেক বর্ণনা পেতেন। অবশ্য, কলকাতার পত্রিকাওতো বাঙালিদের, সেগুলি কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? পাকিস্তানীদের হলে না হয় কথা ছিল।

আচ্ছা পাকিস্তানীদের ভাষায়ই বর্ণনা করি। ঐ সময় আলমদার রাজা ছিলেন ঢাকার কমিশনার। তিনি একটি বই লিখেছেন যাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের অহরহ মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যার বর্ণনা আছে। হামুদুর রহমান কমিশনের বিবরণ প্রকাশিত হলে তিনি এর বিরুদ্ধে একটি রিট করে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছিলেন। ইসলামাবাদে তিনি এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, "রিটের নবায়ন কালে আমি বলছিলাম একটি ঘটনার কথা। চার সৈনিক হামলা করেছে এক বাসায়। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কন্যাটি অল্প বয়সী, সে হাতজোড় করে তাদের জানাল যে, সে মুসলমান, তাকে যেন তারা বোনের মতো দেখে। তারপরও যখন তারা এগিয়ে আসছে তখন সে বলল, আমিওতো পাকিস্তানী। তোমাদের কারও হয়ত আমার মতো মেয়ে আছে। তাও তারা মানছে না। তখন সে বিছানার পাশে কোরান শরীফ রেখে বলল, আমার যদি কিছু করতে চাও তাহলে এই কোরান ডিঙ্গিয়ে করতে হবে। তারা কোরান ডিঙ্গিয়ে ছিল। আমি যখন আদালতে এ বর্ণনা দিচ্ছি তখন সারা আদালত স্তব্ধ। আর বিচারক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বারবার, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? তাঁর চোখে পানি।"

কমফোর্ট উইমেনের কথা বলছেন? যুক্তরাষ্ট্রের *টাইম* পত্রিকা জানিয়েছিল অক্টোবরে (২৫ অক্টোবর) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৫৬৩ জন নারীকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের অনেকে গর্ভবতী। অনেককে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। কাউকে কাউকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। শর্মিলা অবশ্য এই বর্ণনা পড়লে লিখতেন পাঞ্জাবী সৈন্যরা 'জেন্টলম্যান' দেখেইতো তাদের ছেড়ে দিয়েছে। *টাইমের* বয়ান—

"One of the most horrible revelations concerns 563 young Bengali women, some onlyg 18, who have been held captive inside Dacca's dingy military cantonment since the first days of the fighting. Seized from Dacca University and Private homes and forced into military brohees, the girls are all three to five months pregnant. The army is reported to have enlisted Bengali gynecologists to abort girls held at military installations. But for those at the Dacca cantonment it is too late for abortion the Miliatry has began freeing the girls a few at a time, still carrying the babies of Pakistani soldiers."

সারা পৃথিবীতে *টাইম* এর সংবাদের নির্ভুলতার খ্যাতি বিদ্যমান।

এবার আসুন ধর্ষণের সংখ্যায়। ধর্ষিতাদের সাহায্য করতে তখন অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন ডা. জিওফ্রে ডেভিস। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা বলেছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে *বাংলার বাণীতে*।

"সিডনীর শল্য চিকিৎসক ড. জিওফ্রে ডেভিস সম্প্রতি লন্ডনে বলেন যে, ন'মাসে পাক বাহিনীদের দ্বারা ধর্ষিতা ৪ লাখ মহিলার বেশির ভাগই সিফিলিস অথবা গনোরিয়া কিংবা উভয় ধরনের রোগের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই ভ্রূণ হত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তিনি বলেন, এরা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে কিংবা বাকী জীবনভর বারবার রোগে ভুগতে পারেন।

ড. ডেভিস বলেন, বাংলাদেশে কোনও সাহায্য এসে পৌঁছুবার আগেই পাকিস্তানী সৈন্যদের ধর্ষণের ফলে ২ লাখ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ স্থানীয় গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্লিনিক্যাল দিক থেকে গর্ভপাত কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের কঠিন সমস্যা এখনো রয়ে গেছে।

ড. ডেভিসের মতে দীর্ঘ মেয়াদী জটিলতা খুবই গুরুতর। বেশ কিছু সংখ্যক তরুণী যৌন মিলনের উপযোগী না হওয়ায় সমস্যা বেশি জটিল হয়েছে। তিনি বলেন, দূর্ভাগা মহিলারা যদি রোগের চিকিৎসা লাভে সক্ষমও হন তবুও তাদের বিয়ে করার মতো কোনো একজনকে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর।

ধর্ষিতা মহিলারা যখন কমপক্ষে ১৮ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা তখন ডা. ডেভিস ঢাকা এসে পৌঁছান।

ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্যে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিতা মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিসের মতে এই সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচির শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।...

ধর্ষিতা মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০ টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্ক রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্যে হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে। কোনও কোনও এলাকায় ১২ ও ১৩ বছরের বালিকাদের শাড়ি খুলে নগ্ন করার পর ধর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তারা পালিয়ে যেতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে।

হতভাগা বন্দি নারীদের যখনই শাড়ি পরতে দেয়া হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উদ্ধন্ধনে আত্মহত্যা করেছে। ডা. ডেভিস বলেন, অনেকেই বুকে পাথর বেঁধে পুলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। যারা প্রাণে বেঁচে গেছে তেমন ধরনের হাজার হাজার মহিলা তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। কারণ তাঁরা ধর্ষিতা, অন্তঃসত্ত্বা। বর্তমানে দেখতে 'অপরিচ্ছন্ন'। এ ধরনের ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক।

ডা. ডেভিস বলেন, 'চট্টগ্রামে আমি একজন মহিলাকে দেখেছি, তিনি বিধবা। যুদ্ধে তাঁর ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর সন্তান দু'টি এবং তিনি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভপাত ঘটানোর পর এই মহিলার থাকার মতো স্থান নেই। ছেলে মেয়েদের আহার যোগানোর কোনও সংস্থান নেই।'

আরেকজন মহিলার স্বামী যখন যুদ্ধে গেছেন তখন তাকে হানাদাররা ধর্ষণ করে। স্বামী এসে স্ত্রীকে দেখেন গর্ভবতী। তিনি স্ত্রী এবং দুটি সন্তানকে ফেলে চলে যান। এবং এ বলে যান যে, আর তিনি তাদের গ্রহণ করবেন না।

আরেকজন তরুণী বয়স ১৯। অশিক্ষিতা। সে ছিল ছয় মাসের গর্ভবতী। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে স্বল্পকালের জন্য সাহায্য কেন্দ্রে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর সে কোথায় যাবে কেউ জানে না।"

ধর্ষণের কথা কেউ বলে নি, তাই ধর্ষণ হয়নি এবং উল্লিখিত সংখ্যা অতিরঞ্জিত– এ লজিক খুবই অদ্ভুত। বাঙালি মহিলারা কি সবাই তসলিমা নাসরিন? শর্মিলা কী ধর্ষণ বিষয়টা বোঝেন এবং যুদ্ধকালীন ধর্ষণ। যেহেতু [অনুমান করে নিচ্ছি] তিনি যুদ্ধ দেখেন নি তাই যুদ্ধের চরিত্র তিনি অনুধাবন করতে পারবেন না? তিনি কি বাঙালি? বাঙালি হোন না হোন ধর্ষিতা নারী কখনই প্রকাশ করতে চান না তিনি ধর্ষিতা হয়েছেন, তার পরিবারও। পাশ্চাত্যেও না। পাশ্চাত্যে যত ধর্ষণ হয় তার কয়টি রিপোর্ট করা হয়? আর প্রাচ্য, তার ওপর বাংলাদেশ এবং তাও চারদশক আগের বাংলাদেশ, যে সময় নারীরা ঘরের বাইরেই প্রায় যেত না। যারা কখনও যুদ্ধ দেখেনি। সেখানে পুরুষ নারী কারো বর্ণনায় ধর্ষণের বিষয়টি আসবে না। সেটি কলঙ্ক মনে করা হয় সামাজিকভাবে। যে নীলিমা ইব্রাহিমের বই থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই নীলিমা ইব্রাহিমের বইতেও এর ইঙ্গিত আছে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে তখন খবর পান ৩০/৪০ ধর্ষিতা নারীও চলে যাচ্ছে। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করে দেশ ত্যাগ না করার অনুরোধ জানান। এর মধ্যে ১৪/১৫ বছরের এক কিশোরীও ছিল। তিনি তাকে বলেন, 'তুমি আমার বাড়িতে থাকবে মেয়ের মতো।' মেয়েটি রাজি হয় নি। বলেছে, 'আপনি যখন থাকবেন না তখন কী হবে? যখন লোকে জানবে পাকিস্তানীরা আমাকে স্পর্শ করেছে তখন সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।' নীলিমা ইব্রাহিম বললেন, 'তুমি কী জান পাকিস্তানীরা তোমাকে নিয়ে কী করবে?' মেয়েটি বলেছিল, 'জানি, ওরা আমাকে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না।' বছর দু'য়েক আগে একজনের লেখায় পড়লাম [ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না] যে, পাকিস্তানের সুদূর চিত্রলে তিনি এরকম একজন বাঙালি দেখেছিলেন যিনি বাংলাভাষা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতার সংখ্যা দিয়ে কী বোঝানো হয়? বাঙালিরা বলেন, দু'লক্ষ ধর্ষিত হয়েছে। তাতে পাকিস্তানীদের নিষ্ঠুরতার মাত্রাটা বোঝানো হয়। শর্মিলা বলেন, হয়ত দু'হাজার ধর্ষিতা হয়েছে, তাতে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা হ্রাস পায়। শর্মিলাদের উদ্দেশ্যও তাই যার সঙ্গে বিবেকবান পাকিস্তানীরাও একমত নন। বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বিবেচনার কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত কলামিস্ট এম. ভি. নকভী। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বর্বরতার প্রতিবাদ করে তিনি 'দি ডনে' লিখেছিলেন। 'ডন' তা ছাপেনি দেখে 'ডনে' লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। করাচীতে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। "পাকিস্তানি বাহিনী ছিল", অকম্পিত স্বরে জানালেন নকভী, "বিশৃঙ্খল লুটেরা বাহিনী। এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত [দেখুন, বেলুচিস্তানের কসাই নামে খ্যাত টিক্কার সঙ্গে শর্মিলার মতের মিল কত গভীর]। মাত্র তিনহাজার, মাত্র তিনহাজার মহিলা ধর্ষিত হয়েছে।" তিনি ক্রোধে আবেগে এরপর আর কথা বলতে পারছিলেন না। উল্লেখ্য, গণহত্যার মাসখানেক পর টিক্কা পাকিস্তানে ফেরেন। সে সময়ই সরকারি ভাবে তিনি ৩ হাজার ধর্ষণের কথা বলেছেন। নকভী এরপর যা বলেছিলেন তা' হলো, একজনকেও যদি ধর্ষণ করা হয় সেটিও অপরাধ। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার গূঢ়ার্থ, রাষ্ট্রের 'রক্ষক' তো ধর্ষণ করতে পারে না। ধর্মীয় বিবেচনা যদি আনেন তা'হলে এ ভাবে বলা যায়। তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার ছিল রাষ্ট্রের রক্ষক। তারা তাদের নাগরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমানত খেয়ানত করেছিল। ইসলাম ধর্মে আমানত খেয়ানত করার চেয়ে বড় পাপ কমই আছে।

বাঙালি কর্তৃক প্রবলভাবে বিহারী মহিলা ধর্ষণের উল্লেখ করেছেন শর্মিলা। ২৫ মার্চের [১৯৭১] আগে পাকিস্তানীদের হয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ আরো কয়েক জায়গায় বিহারীরা দাঙ্গা শুরু করে। এই দাঙ্গায় উভয় পক্ষেই নিহত হয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমিত হয় বাঙালি রাজনীতিবিদদের সাহায্যে। ২৫ মার্চের পর হানাদারদের সহযোগিতায় বিহারিরা ঝাপিয়ে পড়ে বাঙালিদের ওপর। ২৬-৩০ মার্চ বিহারিরা মিরপুরে কী করেছিল তার সাক্ষী আমি নিজে। সৈয়দপুরেও একই কাণ্ড হয়। বাঙালিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করে। সেখানে নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণের দু'একটি ঘটনাও ঘটতে পারে যা কাম্য ছিল না। কিন্তু, তখন যুদ্ধ চলছিল, নিরস্ত্র বাঙালিরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ঐ ধরনের ঘটনা যদি ব্যাপক ঘটত তাহলে পাকিস্তানী [দুই অংশের] এমনকি বিদেশী পত্র-পত্রিকায়ও ব্যাপকভাবে ছাপা হতো। কিন্তু, বিহারিদের ওপর 'প্রবল' অত্যাচারের খবর পাওয়া যায় একমাত্র পাকিস্তানী 'শ্বেতপত্র' ও ম্যাসক্যারেনহাসের এক অনুচ্ছেদে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিহারিদের বরং পাকিস্তানিরা ব্যবহার করে প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমরা যখন পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ করি তখন দু'একজন জেনারেল ছাড়া বিহারিদের ওপর

'প্রবল' অত্যাচার ও 'প্রবল ধর্ষণের' কথা কেউ বলেন নি। এবং সেইসব জেনারেলরাও মৃদুভাবে তা বলেছেন। ১৯৭১ সালে নকভীকে সাংবাদিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায়। হানাদারদের উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে, বিহারিদের ওপর প্রবল অত্যাচার হয়েছে, তাই পাকিস্তানিরা তাদের জানমাল রক্ষায় ব্যস্ত। নকভীর ভাষায়, "আমাদের তথাকথিত একটি রিফ্যুজি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে রাখা হয়েছিল বিহারীদের [লক্ষ করুন, 'তথাকথিত' শব্দটি]। একজন পাঠান কর্নেল ছিলেন ক্যাম্পের কমান্ডার। কমান্ডার বললেন, এসব কথা শুনতে শুনতে [বিহারিদের ভাষ্য] যখন আমার রাগ লাগে, ক্লান্ত লাগে তখন গ্রামে গিয়ে কিছু মানুষ মেরে আসি। চিন্তা করে দেখুন, বললেন নকভী, "গ্রামের নিরীহ মানুষদের লাইন ধরিয়ে গুলি করে আসে। এ ধরনের প্রচুর কাহিনী আছে। এরা কী মানুষ, নাকি পশুরও অধম...।" আর বাঙালিরা বাঙালি নারীদের ধর্ষণ করেছে? তাত্ত্বিকভাবে ঠিক। তবে বাস্তব হলো সেই বাঙালিরা ছিল হানাদার বাহিনীর সহযোগী জামায়াত ইসলামীর ক্যাডার, আলবদর বা রাজাকার। শর্মিলা বসুও যেমন হানাদারদের সাফাই গাইছেন এখন, তেমনি অনেক বাঙালি ছিল পাকিস্তানীদের সহযোগী। বাঙালিরা [মুক্তিযোদ্ধা] পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলা ধর্ষণ করেছে এ ঘটনার বয়ান এই প্রথম শুনলাম। পাকিস্তানীরাও তা উল্লেখ করেনি। কারণ, এটি অবাস্তবের অবাস্তব, শর্মিলা নিজেও তো নিয়াজির মেমোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে জেনারেল নিজেই লিখেছেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলাদের ধর্ষণ করেছে। শর্মিলা অবশ্য বলতে পারেন, সেইসব পাকিস্তানীরা বাঙালি ছিল। পালাতে পারে নি বা স্বেচ্ছায় কিছু বাঙালি সৈন্য/অফিসার ১৯৭১ সাল পুরোটা হানাদার পাকিস্তানীদের সঙ্গে ছিল। এ যুক্তি দিলে অবশ্য আমার কিছু বলার থাকবে না।

সবশেষে একটি কথা বলি, শর্মিলা সবসময় মুক্তিযুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানী সৈন্যপ্রেমী এই মহিলার জ্ঞাতার্থে বলি, গতশতকে বাংলাদেশই বিশ্বের একটি দেশ যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং জয়ী হয়েছিল। তাই তাত্ত্বিকভাবেও এটিকে গৃহযুদ্ধ বলা সমীচিন নয়। এতে একটি রাষ্ট্রের জন্মকেই অপমান করা হয়।

পাকিস্তানী সৈন্যরা পাকিস্তান শুধু ভাঙ্গেইনি পাকিস্তানকেও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। পাকিস্তানী সিভিল সমাজকে [যাদের অনেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জেলে পর্যন্ত গিয়েছিলেন] তারা অস্ত্রের সাহায্যে দমন করে রেখেছে যেখানে বীরত্বের কিছু নেই। নিন্দিত এই সেনাবাহিনী পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে ভারতকে [তাদের ভাষায় হিন্দুস্থান] এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কেও তারা ভারতের হিন্দুদের সমার্থক মনে করে। সেই বাহিনীর প্রতি এখন কোনো বাঙালি নারী গবেষণার মোড়কে তাদের অন্যায়কে খাটো করে দেখার প্রচেষ্টা করেন, তখন এটিই অনুধাবন করি পাকিস্তানের আইএসআই খুবই শক্তিশালী প্রভাবশালী, কার্যক্ষম আইনি সন্ত্রাসী একটি প্রতিষ্ঠান।

২০০৬

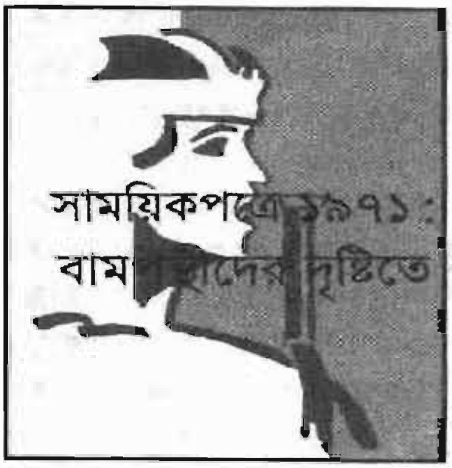

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আজ অনেকেই বিস্মৃত, বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম। যারা বিস্মৃত নন, তাদের অনেকের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে শুরু হয়েছে নানা বিতর্ক যার অধিকাংশ রাজনীতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ সব অর্থহীন। তবে তা নতুন প্রজন্মের মাঝে সৃষ্টি করছে বিভ্রান্তি। উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক যারা সৃষ্টি করছেন তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কোনও সঠিক তথ্য বা উপাদান-ই সাক্ষ্য নয়। তবে, এর বাইরে আছেন বিশাল জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে তরুণরা। তারা যদি মুক্তিযুদ্ধের তথ্য ও উপাদানগুলি পর্যালোচনা করেন বা নিদেনপক্ষে পড়েন তা হলে এসব বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক বিবরণ নিরসন করতে সাহায্য করে এসব বিভ্রান্তি। বিশেষ করে সমসাময়িক সংবাদ সাময়িকপত্র। এসব সংবাদ সাময়িকপত্রের কিছু বেরিয়েছিল মুজিবনগর ও বাংলাদেশের অভ্যন্তর (মুক্তাঞ্চল) থেকে। এ ছাড়া আছে সারা বিশ্বের সংবাদ-সাময়িকপত্র। এ সব পত্র পত্রিকায় ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, এর সংগঠক, বিশ্ব শক্তিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি। এগুলিকে অবিশ্বাস করার অর্থ বাস্তব অস্বীকার করা। ১৯৭১ সালে বিশ্বের এমন কোনও পত্র-পত্রিকা ছিল না যেখানে প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোনো দেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত ঔৎসুক্য, সমবেদনা দেখা যায় নি।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী স্বাভাবিকভাবেই বেশি অভিঘাত হেনেছিল প্রতিবেশী ভারত, বিশেষ করে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে। ভারতীয় সব পত্র-পত্রিকায়ও প্রায় প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত খবর/প্রবন্ধ/কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। এ সব পত্র-পত্রিকা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত খবরাখবর/প্রবন্ধ সংকলন করতে পারলে তা হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক বৃহৎ উপাদান ভাণ্ডার।

আমি ও আমার কিছু সহকর্মী এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গত কয়েক বছর ধরে কাজ করছি। জানি না, কতদিনে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কারণ, এ ধরনের কাজে সহায়তা করতে পারে এমন কিছুই আমাদের আয়ত্তে নেই। এবং এ সব পত্র-পত্রিকা এখন সংগ্রহ করা দুরূহ।

১৯৭১ সালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সন্ধান করতে গিয়ে আমরা কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবি সমর সেন সম্পাদিত 'দি ফ্রন্টিয়ার'-এর ফাইল খুঁজে পাই।

সাপ্তাহিক এ পত্রিকাটি দু'টি কারণে উল্লেখযোগ্য। এক, কবি সমর সেন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। দুই, পত্রিকাটিকে বিবেচনা করা হতো অতি বামপন্থীদের মুখপত্র হিসেবে। বিশেষত চৈনিক রাজনীতির প্রতি তাদের ছিল বিশেষ পক্ষপাত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে অতি বামদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা নিয়ে বিশেষ কোনও গবেষণা হয় নি। চৈনিক রাজনীতি, বিশেষ

করে নকশাল আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) ও বাংলাদেশের বামপন্থীদের একাংশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে, মুক্তিযুদ্ধকে বাম, অতি-বামরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছিল বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের তাত্ত্বিক আলোচনা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব—এসব কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে ফ্রন্টিয়ার-এর পাতায়। এমন কিছু চিত্র অন্য কোনও সংবাদ-সাময়িকপত্রে পাওয়া যাবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ফ্রন্টিয়ারে প্রকাশিত প্রতিবেদন/নিবন্ধ/চিঠিপত্র পর্যালোচনা করে প্রবন্ধটি রচিত হলো।

দুই

ইংরেজি সাপ্তাহিক *ফ্রন্টিয়ার* প্রকাশ করেছিলেন সমর সেন। সম্পাদকও ছিলেন তিনি নিজে। ত্রিশের দশকে বাংলা কবিতায় যারা নতুন ভাব, ভাষা নিয়ে এসেছিলেন সমর সেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জন্ম ১৯১৬ সালে কলকাতায়, বাবা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন তার দাদা। মেধাবী ছাত্র সমর সেন ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা আত্মকাহিনীতে এ সব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে (সমর সেন, বাবু বৃত্তান্ত, কলকাতা, ১৯৭৮)

সমর সেন কবিতা লিখেছিলেন এক যুগ বা বারো বছর। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, তাঁর ভাষায়, "আমার আঠারো থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত।" লিখেছেন তিনি, "আমার কবিখ্যাতির কারণ, ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম।" আসলে, ব্যাপারটি তা নয়। রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে এসে কবিতায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তারপর কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। খ্যাতির শিখরে ওঠে কেন তিনি আর কবিতা লিখলেন না তা এক রহস্যই রয়ে গেছে।

যৌবনেই সমর সেন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। জীবিকা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। মস্কোয় ছিলেন কিছু দিন। স্থায়ীভাবে কোনো পত্রিকায় তিনি বেশিদিন কাজ করেন নি। ১৯৬৪ সালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে। "ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি জোরদার" করার জন্য তিনি একটি সাপ্তাহিক বের করতে চাইলেন। সমর সেনকে সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে সমর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো ইংরেজি সাপ্তাহিক নাও (Now)।

কয়েক বছরের মধ্যেই হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সম্পাদক সমর সেনের মত বিরোধ দেখা দেয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় 'নাউ' ছিল সি.পি.এম-এর ক্ষীণকণ্ঠ প্রতিবাদ, বিক্ষুব্ধদের বিতাড়ন ও যেন-তেন প্রচারে সরকারের টিকে থাকার 'রণকৌশল' আমাকে মোহমুক্ত করে। রাষ্ট্রপতির শাসন যে ভাবে দেখানো হয় তাতে সাময়িকভাবে সি.পি. এম কে সমর্থন করা হয়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পিছনে কবিরের হাত ছিল অনেকটা।" ১৯৬৮ সালে তিনি 'নাউ' থেকে পদত্যাগ করেন এবং প্রকাশ করেন ফ্রন্টিয়ার। এর মালিক সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজে।

তিন

এ পটভূমিকা দেয়া হলো সমর সেনকে বোঝার জন্য। কারণ, তা হলে *ফ্রন্টিয়ার*-কে বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সমর সেন ছিলেন স্বভাবে অস্থির। যৌবন থেকেই বাম মতাদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন আকৃষ্ট। কিন্তু, ক্রমেই তিনি নমনীয় বামপন্থা থেকে সরে আসতে থাকেন। তাঁর ভাষায় 'মোহমুক্তি' ঘটে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি নিজেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন *নাউ* থেকে বিতাড়িত হবার হপ্তা দুয়েক পর নতুন পত্রিকার প্রস্তুতি শুরু করি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে আমার বিতাড়নের কিছুটা সম্বন্ধ ছিল বলে ভাবী পত্রিকার বিষয়ে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির অভাব হয় নি। অনেকের সঙ্গে আলোচনার ফলে ধারণা জন্মে যে ৬০,০০০ টাকা তোলা কঠিন হবে না। কিন্তু ফ্রন্টিয়ার বেরোবার মুখে হাজার দু'য়েক ওঠে ভাইবোন ও বন্ধুদের কাছ থেকে। নাউ-এর গ্রাহক ও এজেন্টের তালিকার কপি আমার কাছে ছিল। তিন সপ্তাহে ৬০০ পোস্টকার্ড নিজের হাতে লিখে বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠাই—সাড়া পাই প্রচুর। পুরনো লেখক গোষ্ঠী দল বেঁধে নতুন পত্রিকায় চলে আসেন।"

মূলধনের অভাব সব সময় *ফ্রন্টিয়ার*-এর ছিল। কারণ, পত্রিকার একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেটি ছিল বামপন্থী ঝোঁক, চীন ঘেঁষা। ফলে, বিজ্ঞাপন *ফ্রন্টিয়ার* কখনও তেমন পায়নি। যা পেয়েছে তা সমর সেনের নাম ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে। দীনহীন ভাবে, নিউজপ্রিন্টে ছেপে পত্রিকা বেরুতো। এর লেখকমণ্ডলী ছিল নির্দিষ্ট। যাঁরা চিঠিপত্র বা বিভিন্ন মতামত পাঠাতেন তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঐ একই রকম। এবং প্রচার সংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট। সমর সেন জানিয়েছেন, প্রথম দু'বছর পত্রিকায় প্রচার তথা আয় ভালোই ছিল। তারপর ওঠানামা হয়েছে। মনে হয়, চীনের প্রতি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ঝোঁক হ্রাস পেলে, বিশেষ করে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর, পত্রিকার প্রচার সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৭৮ সালে আত্মজীবনীতে খেদ করে সমর সেন লিখেছেন—"দশ বছর কেটে গেছে, এখন প্রায়ই মনে হয়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছি—ভারতীয় মোষ তাড়ানো অবশ্য কোনও পত্রিকার বাইরে। বিশেষ করে বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যক্তিরা অনেকে যখন বলেন ফ্রন্টিয়ার-এর জন্য 'আপনাকে শ্রদ্ধা করি' তখন মনে হয় শ্রদ্ধায় চিঁড়ে ভেজে না।"

ফ্রন্টিয়ার যখন প্রকাশিত হয় তখন ভারতীয় ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদল চলছিল। কংগ্রেসে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন পুরাতন দ্বন্দ্ব শুরু হয় যার পরিসমাপ্তি ঘটে ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভে। সিপিএম-সিপিআই দ্বন্দ্বতো ছিলই কিন্তু সিপিআইএমে চরমপন্থীরা সমর্থন করে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল বাড়ি আন্দোলনকে। এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে প্রবলভাবে আগ্রহী করে তোলে। মার্কসবাদী অন্যান্য দলগুলি এর সমর্থক ছিল না। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের কংগ্রেস সরকার নকশাল বাড়ি আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন শুরু করে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সামগ্রিকভাবে ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করলেও চরম বামপন্থীরা

সর্বতোভাবে তা সমর্থন করে নি। বাংলাদেশের চরম বামদের মধ্যেও এ দোদুল্যমানতা ছিল ফ্রন্টিয়ার-এর বিভিন্ন রচনায় আমরা এসব মতের প্রতিফলন লক্ষ করি।
ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমর সেন নিজেই লিখেছেন- "দিনকাল ছিল উত্তেজনায় ভরা।... ফ্রন্টিয়ার নকশাল ঘেঁষা পত্রিকা বলে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করে।"
"১৯৭০-৭১ সালে নকশালপন্থীদের উচ্ছেদে সি. পি. এম-এর ভূমিকা? পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। কিন্তু, মুজিবের ব্যাপারে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপে সি. পি. এম-এর রাতারাতি ভোল বদল বিষয়ে একটি কথা বলা দরকার। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইন্দিরা বিরোধী, কিন্তু পরদেশের সঙ্গে সংঘাত লাগলে জাতীয় সরকারকে সমর্থন–দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই ভূমিকা সি. পি. এম অনেকটা বজায় রেখেছে–চীনের সঙ্গে ১৯৬২-র সংঘর্ষটা অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম।" ১৯৭১ সালে, সমর সেন ও ফ্রন্টিয়ার-এর লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি এরকমই ছিল– বিদ্যমান সব মতামত বিরোধী- "নকশালঘেষা"।
১৯৮৭ সালে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সমর সেন ফ্রন্টিয়ার সম্পাদনা করে গেছেন, নিদারুণ অর্থসংকট সত্ত্বেও। এবং পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি যাই থাকুক না কেন সৎসাংবাদিকতা ও মার্কসবাদী তর্ক বিতর্কের ফোরাম হিসাবে *ফ্রন্টিয়ার* বুদ্ধিজীবী পাঠকদের কাছে সব সময় সমাদর-ই পেয়েছে।

চার

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকেই *ফ্রন্টিয়ার*-এ বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবরাখবর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ডিসেম্বর এমন কী পরের বছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চরমপন্থী মার্কসবাদীদের দোদুল্যমানতা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষ করি পশ্চিম বঙ্গের মার্কসবাদী বাঙালিদের এ যুদ্ধ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। দলে দলে শরণার্থী এসেছে পশ্চিমবঙ্গে– এটিই উদ্বেগের একমাত্র কারণ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ, এর চরিত্র, গতিপ্রকৃতি, ভবিষ্যত বাংলাদেশের প্রকৃতি কী হবে সেসব নিয়েও অপার কৌতূহল ছিল মার্কসবাদীদের। তা ছাড়া সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিলো আবেগ। এবং এ কারণেই আমরা দেখি, ফ্রন্টিয়ার এর এমন কোনও সংখ্যা নেই যেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু না কিছু থাকছে। এ সময় ফ্রন্টিয়ার-এ ছাপা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকদের মতামত, 'ক্লিপিংস' বিভাগে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্য পত্র পত্রিকার খবর, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইত্যাদি। ২০ মার্চ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত আমরা ফ্রন্টিয়ার-এর ৩৭টি সংখ্যা পেয়েছি যেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এ ছাড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের দু'টি ও ১৯৭২ সালের জানুয়ারির দু'টি সংখ্যা। ফ্রন্টিয়ার-এ প্রকাশিত রচনা/সংবাদ-কে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হলো–
ঐতিহাসিক পটভূমি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, পাকিস্তান, ভারতীয় রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বশক্তিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি।

ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যায়ে ১৪টি প্রবন্ধ/নিবন্ধ আছে। এর মধ্যে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, অভিমত, চিঠিপত্র, গ্রন্থ সমালোচনা ও অন্য পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি। ফ্রন্টিয়ার-এর যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা আগে আলোচনা করেছি, সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাত্ত্বিক দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে বা জয়লাভের কৌশল হতে পারে সেসব বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে মার্চ-এপ্রিলের লেখাগুলিতে।

এ পর্যায়ে সংকলিত তিনটি সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেগুলির ভিত্তিও তাত্ত্বিক। বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে ভারতীয় ঘটনাবলীর। প্রথম দিকে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ তথা পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই লেখা হয়েছে–

"It is quite on the cards that under the compulsions lf getting into power, Mr. Bhutto and Mr. Mujibur Rahman will come to terms."

২৬ মার্চের ঠিক আগে মুজিবের কৃতিত্ব সম্পর্কে এ বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে, "The civilian administration is still controlled by the party, in itself a unique achievement." তবে এ প্রশ্ন করা হয়েছে–

"কতদিন মুজিব বাঘের পিঠে সওয়ার থাকতে পারবেন? তিনি যে সমর্থন পেয়েছেন তা অভূতপূর্ব; জনগণের ঐক্য প্রায় কিংবদন্তীসম।" এবং লেখক এ ভবিষ্যতবাণী করেছেন, "এ কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি যেখানে আধিপত্য বিস্তার করে আছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা, চেনা পথ অনুসরণ করবে না। সাময়িক সমাধান বা জাতীয় সংসদ বসলেও।"

"পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি আমাদের মৈত্রীভাব ফলপ্রসূ হবে যদি আমরা আমাদের ঘর গুছোতে পারি– বা নতুন যাত্রার জন্য তা পুরো ভেঙ্গে ফেলতে পারি। এর কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।"

এপ্রিলে *ফ্রন্টিয়ার* মন্তব্য করেছে যুদ্ধে জেতাটা কষ্টকর এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কীভাবে জেতা যেতে পারে? এ প্রসঙ্গে পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিল তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে–

"A combination of violent non-cooperation, sabotage and ambushes can be very effective in curbing the enemy."

তাত্ত্বিক প্রবন্ধের ধরণটা বোঝা যাবে, শিশির কে, মজুমদারের লেখা 'Storm in the East' প্রবন্ধ থেকে। তিনি লিখছেন, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ রক্তাক্ত, ইসলামাবাদ ও দিল্লীর ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষতের কারণে। তিনি আরো লিখেছেন, সমস্ত কিছু বিচার করলে পাকিস্তানকে একটি 'nation' বলা যাবে না। পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র এক ধরনের ধাপ্পাবাজি। মূল কথা হলো তাঁর ভাষায়–

"এখন সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুতি এবং এর জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী সন্ত্রাসের। অহিংসা ও অসহযোগ হচ্ছে গান্ধীবাদী পন্থা যা বিভ্রান্ত করে জনগণকে, শ্রেণী সংগ্রামকে সাবোটাজ করে। অন্তর্নিহিত শক্তিকে জানা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। অস্ত্র থেকে সবসময় শক্তিশালী মানুষ ও ভাবাদর্শ।" (১৬.৯.১৯৭১)

সুমন সরকার তাঁর দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, "Pakistan strategry was "mobilization of economic surplus from agriculture to modern sector and promotion of the growth of entrepreneurship." (28.8.71) তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'দি নেশন' এ লেখা আইজাজ আহমদের প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। ২৪.৭.১৯৭১ সংখ্যায় তা উদ্ধৃত হয়েছে 'Power Equation on Pakistan' শিরোনামে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিভিন্ন শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ঠিকই লিখেছিলেন যে, "Chinas attitude is reprehensible"। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে তিনি যা যা বলেছেন তা অনেকাংশেই সত্যি। সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে বসে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই এ ধরনের দৃঢ় ধারণা করা দুরূহ। আমি দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, কৃষকদের মুক্তি আওয়ামী লীগের এজেন্ডা ছিল না। তার ফলে, "বাঙালি নেতৃবৃন্দ যারা অনুমান করেছিলেন স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া কি হবে, কৃষকদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করেন নি। জনগণ অভ্যস্ত শহরে নেতৃবৃন্দের নির্বাচনী বৈধতা প্রদানে, কিন্তু এ বিপরীতে সেনাবাহিনীর গণহত্যা পদ্ধতির বিরুদ্ধে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে তা বলা হয় নি, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠির আচরণকে ক্ষমা না করেও আওয়ামী লীগের নেতাদের বিজ্ঞতা, এমনকি উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।" কারণ, "কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়নি, এ কথা ভেবে যে, তা'হলে তাদের ভূমিকা আন্দোলনের চরিত্র পালটে দিতো এবং গ্রামাঞ্চলে দেখা দিতো সামাজিক বিপ্লব। বরং এখন যা হবে তা'হলো বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বায়ত্তশাসনের ফলে তারই খানিকটা সুবিধা হবে।"

তাত্ত্বিক আলোচনা যাই হোক, বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতি ভালোবাসা সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ, এদের অনেকে (বা পূর্বপুরুষ) ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। এবং সে কারণে বাংলাদেশকে সমর্থন করা ছিল আবেগের ব্যাপার যা পরিস্ফুট হয়েছে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি চিঠিতে–"যদি মেনেও নিই যে বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলন বুর্জোয়া বিদ্রোহ ছাড়া কিছু নয়। তারপরও তিনটি কারণে আমাদের তা সমর্থন করা উচিত। (১) বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে; (২) পাকিস্তানের শাসকরা মধ্যযুগীয় সামন্তবাদের উত্তরাধিকারী এবং (৩) বাংলাদেশ সবসময় আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি। সাধারণ মানুষ সব সময় জেনেছে যা কেবিনেট মিশনও স্বীকার করেছিল যে, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৭০০ মাইল দূরে কিন্তু আমাদের বাংলা থেকে মাত্র কয়েক কদম।"

পাঁচ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তৎকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী। মন্তব্য করা হয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান, তাদের

ঐক্য-অনৈক্যের প্রশ্ন; মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি যেখানে বারবার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও সাধারণ যোদ্ধাদের কথা এসেছে। *ফ্রন্টিয়ার* এর লেখক/সাংবাদিকবৃন্দ বামপন্থীদের ভূমিকার বিষয়টি বুঝতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, পিকিংপন্থী লাইনের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও, চীনের পাকিস্তানকে সমর্থন তারা মানতে পারেন নি। বরং, এর বিপরীতে বাংলাদেশের জয়ের কথাই বারবার ব্যক্ত হয়েছে। সমর সেন তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– "পূর্ব পাকিস্তানে, সিংহলে আন্দোলনের সময় চীনা নেতাদের বিবৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লাগেনি। বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য চীনের বিশ্লেষণকে অনেকটা সমর্থন করে, কেননা চীনের প্রধান আপত্তি ছিল ভারতের হস্তক্ষেপ। 'এক কোটি' উদ্বাস্তু আগমনের অনেক আগে, প্রায় এপ্রিলের শুরু থেকে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আছে।" যেমন দুই পাঠিকা লিখেছিলেন–"ভিয়েতনাম আমাদের শিখিয়েছে, দানবশক্তি কখনও জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে পারে না। ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয় জয়ী হবে।"

শেখ মুজিবকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থীদের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু, মৃদু সমালোচনা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর প্রতি। উল্লেখ্য, পাঠক পাঠিকা, সাংবাদিকরা সব সময় এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সফল হবেই। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে–

"(১) গত দু'সপ্তাহে যা সবাইকে অবাক করেছে তা'হলো মানুষের সজীবতা ও fortitude."

(২) "মুজিবুর এখন তার জনগণ নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছেন এবং সারা পৃথিবী তার অভিঘাত বোধ করেছে..... আশংকা যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সরবরাহের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা কাবু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যারা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস জানেন, তারা এটাও জানেন যে মানুষ এমন এক পর্যায়ে গেছে যেখান থেকে ফেরার উপায় নেই এবং সে কারণে তারা শেষ পর্যন্ত লড়বে।"

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে কারণ তখন ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস ছিল ক্ষমতায় যা বামপন্থীদের পছন্দ ছিল না। সে জন্য দেখি এক পাঠক বাংলাদেশের জয় কামনা করে লিখেছেন–"কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের চরিত্রে পার্থক্য কম।

কাশ্মীরের যুদ্ধ রাইফেলের সাহায্যে দমন করা হয়েছে। অন্য যে কোনও সংগ্রামও দমিত হবে।"

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। এর দু'দিন পর ১৮ ডিসেম্বর *ফ্রন্টিয়ার* প্রকাশিত হলো। 'A Famous Victory' শিরোনামে লেখা হলো সম্পাদকীয়। আজ ত্রিশ বছর পর দেখি, ফ্রন্টিয়ার জাতীয় মতানৈক্যের যেসব কারণগুলি উল্লেখ করেছিল তার সবগুলিই সঠিক হয়েছে। সম্পাদক (নিশ্চয় সম্পাদকীয়টি তাঁর লেখা) সমর সেনের

দূরদর্শিতা এখানেই ফুটে ওঠে। দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, পূর্ববঙ্গে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই কি সব শান্ত হয়ে যাবে? তাঁর উত্তর ছিল–না। কারণ–"সম্পদের বখরার প্রশ্নে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে তিক্ততা দেখা দেবে। দ্বন্দ্ব আছে যারা যুদ্ধ করেছে ও প্রবাসে যারা আরামে কাটিয়েছে তাদের মধ্যে; যারা পালিয়েছে দেশ থেকে এবং যারা নির্বাসনে কাটিয়েছে নির্ভয়ে তাদের মধ্যে; যারা পালিয়েছে এবং যাদের বুকের পাটা ছিল দেশে থাকার এবং যুদ্ধ করার তাদের মধ্যে; দ্বন্দ্ব দেখা দেবে সিভিলিয়ান এবং ভারতীয় সুপার অফিসার যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে এই সমৃদ্ধ দেশটি হাতে নেয়ার তাদের সঙ্গে যারা দেশে সরকার ত্যাগ করতে পারেনি কিন্তু সহায়তা করেছে স্থানীয় যোদ্ধাদের; দ্বন্দ্ব হবে অপ্রতিরোধ্য সম্পদ সমৃদ্ধ ভারতীয় পুঁজিপতি ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে। এ ছাড়া আছে রাজনৈতিক-সামরিক ক্ষেত্র। যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল তাদের সবাই সরকার বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দেবে না। সীমিতভাবে হলেও তারা স্বাদ পেয়েছে সে ক্ষমতার যার ভিত্তি বন্দুকের নল। এবং আছে সশস্ত্র মানুষ যারা ভারতীয়দের মনে করে না মুক্তিদাতা।"

•

ছয়

পাকিস্তান শিরোনামের অধীন প্রধানত পাকিস্তান আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান সংক্রান্ত রচনাবলী/মতামত অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নির্বাচনের পর পাকিস্তানী নেতাদের মনোভাব কী হতে পারে সে বিষয়ে ১৯৭০ সালেই প্রবন্ধ লিখেছেন অসীম মুখোপাধ্যায়। তিনি আশা করেছিলেন–"এই তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের ভারসাম্যপূর্ণ ও পক্ষপাতহীন প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিঃসঙ্গ করে তুলবে তা-ই-নয়, সাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়ে আনতে পারবে।"

এ, কে, চন্দ্র তারিক আলীর বই আলোচনা করতে গিয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন- ' Spotlight on Pakistan' শিরোনামে। তবে, এ বিভাগে 'ক্লিপিংস' বা অন্যান্য পত্র পত্রিকা থেকে সংকলনই বেশি করা হয়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে আগ্রহের অভাব। তথ্যের স্বল্পতাও হয়ত লেখকদের অনুৎসাহিত করেছে। তবে, এ ক্ষেত্রে Mohammad Ayoob রচিত Times of India-য় 'West and East' নামক নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

আইয়ুব *টাইমস অব ইন্ডিয়া*-তে যা লিখেছিলেন তা সঠিক। ১৯৯৮ সালে আমি পাকিস্তান গিয়েছিলাম এবং ১৯৭১ সালের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, গণহত্যার প্রতিবাদ তারা করেননি কেন? উত্তর দিতে তারা ইতস্তত করেছেন অথবা উত্তরই দেন নি। আইয়ুব লিখেছেন, "এটা ভাবা অবাস্তব যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিতরা (এক্সপ্লয়েটেড) পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কারণ সেই শোষিত শ্রেণীরও স্বার্থ আছে উপনিবেশে.....দ্বিতীয়ত স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করবে বিভিন্ন "অটোনমিস্ট" গ্রুপ। তবে তারাও এটা সমর্থন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ

তার স্বায়ত্তশাসনের সীমায় থাকবে এবং পরিণত হবে না দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে।" (২৯.৫.১৯৭১)

এ বিভাগে সবচেয়ে 'ইন্টারেস্টিং' প্রতিবেদনের নাম 'পাকিস্তানী দূতদের সম্মেলন' (৩০.১০.৭১)। পাকিস্তানের দূতরা ২৪-২৫ আগস্ট জেনিভায় মিলিত হয়েছিলেন বার্ষিক সভার জন্যে। সভায় যোগ দিয়েছিলেন, পররাষ্ট্র সচিব, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা লে. জেনারেল মুহাম্মদ উমর এবং তথ্য সচিব রোয়েদাদ খান।

১৯৯৮ সালে আমি জেনারেল উমর ও রোয়েদাদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। জেনারেল উমর সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর সঙ্গে তার যোগ ছিল না। অথচ, আত্মসমর্পণের ছয় সপ্তাহ আগে দেখি, তিনি জানাচ্ছেন, পাকিস্তানীরা রাজাকারদের সংগঠিত করছে এবং ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটি যেমন থাকবে তেমনি অটুট থাকবে সংহতি। তবে, তার মতে, রাজনীতি-তে স্থির বলে কোনো বিষয় নেই।

একই ভাবে রোয়েদাদ খানও সব অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবেদনে দেখি, তিনি "স্বীকার করছেন, পাকিস্তানের ভাবমূর্তি খারাপভাবে বিনষ্ট হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এ কারণে সুনির্দিষ্ট আগ্রাসী প্রচার চালাতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্মচারি দেয়া হবে।" এ প্রতিবেদন থেকে আমরা আরো জানতে পারি, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ কী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পর্যালোচনা করছিল।

মুক্তিযুদ্ধকে তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে বিচার করেছে তার একটি খণ্ডচিত্র পাই আমরা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক শিরোনামের সংবাদ/রচনাগুলিতে। ফ্রন্টিয়ারের এ দৃষ্টি অবশ্যই একপেশে। পত্রিকা যেহেতু ছিল অতি বামের সমর্থক, তাই স্বভাবতই তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে পারে নি। বামপন্থী সিপিএমের তারা সমালোচনা করেছে কিন্তু ক্ষুব্ধ ছিল তারা বেশি কংগ্রেসের ওপর। শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের যুদ্ধ পরিচালনা বা নীতিও সমালোচিত হয়েছে।

জ্ঞানকাপুর তাঁর 'কলকাতার রোজনামচা'য় পাকিস্তানীদের এশীয়দের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। লিখেছিলেন তিনি, "পূর্ববঙ্গের হানাদাররা খুব সম্ভব সে সব এলাকা থেকে এসেছে যে সব এলাকা এসিরিয়দের কব্জায় ছিল। এসিরিয়রা নিপুণভাবে হত্যাযজ্ঞ চালালেও এক সময় নিজেরাই উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল।" তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আধুনিক অস্ত্র দিয়ে ভারতের সাহায্য করা উচিত। এক কথায় "বাংলাদেশ যে বন্ধুতার হাত প্রসারিত করেছে তা এখনি গ্রহণ না করলে তা হয়ত ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং কখনও তা আবার প্রসারিত হবে না।" (১০.৪.১৯৭১) কিন্তু সময়টা ছিল মাত্র এপ্রিল এবং তখুনিই ভারত স্বীকৃতি দেয়ার অবস্থায় ছিল না।

কেরালার এক পাঠক আবিষ্কার করেছিলেন, সিপিএম এবং শেখ মুজিবের কৌশলের মধ্যে এক ধরনের মিল আছে। কারণ, তারা গ্রহণ করেছে "আন আর্মড মাসেস" (অস্ত্রহীন জনগণ) লাইন। সুতরাং, সিপিএমের "পরিণতিও হবে আওয়ামী লীগের

মতো। আইদিতের 'অস্ত্রহীন জন আন্দোলন' কৌশলের কারণে ইন্দোনেশিয়ায়ও একই ধরনের হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল।"(১৫.৫.৭১)

ফ্রন্টিয়ার এক সম্পাদকীয়তে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, বাংলাদেশের "সংস্কারবাদী"রা (রিফর্মিস্ট) "জয়লাভ করবে" কারণ দিল্লী (কংগ্রেস) তাই চায়। সুতরাং "বামপন্থীদের উচিত আন্দোলনটা এমন দিকে নিয়ে যাওয়া যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী কসাইদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাদের মনে রাখতে হবে এ পরিস্থিতিতে হয়ত তাদের ভারতীয় কসাইদেরও মুখোমুখি হতে হবে।" (২২.৫.৭১)

এস.আর. তাঁর "আওয়ার এটিচ্যুড টু বাংলাদেশ : অ্যান এনাটমি অব ইন্ডিয়ান রিঅ্যাকশন" প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, উপমহাদেশ ক্রমেই "বিপ্লবের ক্ষেত্র" হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে লেনিনের বিশ্লেষণ সঠিক। লিখেছেন তিনি "এটা খুব সম্ভব অস্বাভাবিক নয় যে, পাকিস্তানে যুদ্ধ ভারতীয় পাক উপমহাদেশের বিপ্লবীদের জন্য সুখবর। অর্থনীতিতে পশ্চাদপদ এবং জনসংখ্যা ও বেকারত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য তৈরি করছে বিপ্লবের জন্য সজীব ক্ষেত্র।" (৩.৭.৭১)

সি. প্রসাদের 'দি ইয়ার অব কনফিউশন' চিন্তা-উদ্দীপক, ১৯৭১ সালের মার্ক্সবাদী লেখকদের রচনা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, Les Tempa Modernes-এ হামজা আলাভী ও La Nouvelle chine-একস্টেট মৌরাকিসের রচনা। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন-সহানুভূতিপূর্ণ। (৬.১১.৭১)

বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনার মাঝেও 'আমরা কখনও কখনও এমন সংবাদ জানতে পারি যা আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন মনে হতে পারে কিন্তু তা বাঙালি ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত মুসলমানদের মন মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করে। কারণ, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর এ ধরনের টানাপোড়েন অভিঘাতের সৃষ্টি করেছে। একটি খবরে জানা যায়, রক্ষণশীল মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি কারণ, তারা পাকিস্তানের ধ্বংস মেনে নিতে পারেনি। আওয়ামী লীগের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব যে তীব্র হয়ে উঠছে তাও জানতে পারি। নভেম্বরে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আওয়ামী নেতৃত্ব বিভক্ত। এর একটি অংশ পাকিস্তানের কাঠামোর সমাধান চাচ্ছে। অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তিকেও সমালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমালোচনার পাত্র ছিল সিপিআই। বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত নানা তত্ত্বে আসলে ফ্রন্টিয়ারের লেখকবৃন্দ যা বলতে চাইছিলেন তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে সৈকত সেনের লেখায়। লিখেছেন– "A consciously-attempted and correctly oriented, well-organised armed class-war is the only answer to any anti-people war, the only way out of this crisis." (13.11.1971)

মুক্তিযুদ্ধ চুকে বুকে গেল। ভারতীয় বামপন্থী দলগুলি এ বিষয়ে নিজ নিজ মতবাদ অনুযায়ী কাজ করেছে এবং তা করতে গিয়ে তত্ত্ব ও বাস্তব মেলেনি। কিন্তু একটি বিষয়ে সবাই একমত হয়েছে যে, "Bangladesh was exploited by West

Pakistan and the nature of the exploitation was colonial. Therefore the liberation of Bangladesh is the successful culmination of a national liberation war which completed the bouregious democratic revolution of Bangladesh." (1.1.1972)

কিন্তু অতি বাম ফ্রন্টিয়ার এ সরলীকরণও মানতে রাজি নয়। তাদের মত হলো, এই 'বিপ্লব' করা সম্ভব হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে, এর অর্থ বিপ্লব রপ্তানী করা হয়েছে। তারপরও যদি বাংলাদেশের মানুষ অবরুদ্ধ মুক্তির কাজটি শেষ করতে পারে তখনই হবে তা সার্থক মুক্তিযুদ্ধ।

"If the people of Bangladesh succeed, the left parties in India would leave a sigh of relief and get out of the funny entanglement they are in. But if the Bangladesh people can do so, a whole chapter of Marxism would have to be re-written." (1.1.1972)

সাত

বৃহৎশক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি শিরোনামের অধীন সংকলন করা যেতে পারে কিছু রচনা ও চিঠিপত্র। তবে, এ পর্যায়ে পাঠকদের চিঠি পত্রের সংখ্যাই বেশি। স্বাভাবিকভাবেই চীন ও পাকিস্তান প্রসঙ্গই এসেছে বেশি। *ফ্রন্টিয়ার* ছিল যেহেতু চীন ঘেঁষা সেহেতু চীনের অবস্থান ব্যাখ্যা করার ঝোঁকটাই ছিল প্রবল। সিপিএম-এর সমালোচক ফ্রন্টিয়ার, সি.পি.আই এরও। সুতরাং রাশিয়াকে জোরালোভাবে সমর্থনের উপায়ও ছিল না। আমেরিকাকে তো সমর্থনের প্রশ্নই আসে না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ফ্রন্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পরাশক্তির ভূমিকা আলোচনা করেছে। আবার সম্পাদকের সহানুভূতিও ছিল বাংলাদেশের প্রতি। এই টানাপোড়েন লক্ষ্য করি দু'টি চিঠিতে। চীনের মনোভাব সাধারণের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল এভাবে যা লিখেছেন একজন পাঠক—

"যতই এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করুন না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চীন ইসলামাবাদের শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়েছে, বাংলাদেশের ৭.৫ লক্ষ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করেনি। ইতিহাসের কী পরিহাস!" (২৪.৪.৭১)

আবার যারা চীনকে সমর্থন করেছিল তারা এক অবাস্তব তত্ত্বে পৌঁছেছিল, যেমন লিখেছিলেন একজন—

"বাংলাদেশে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার-এ ঘোষণার মাধ্যমে চীন বাস্তবে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এভাবে চীন বাংলাদেশের বিপ্লবকে রক্ষা করছে, সুযোগ দিচ্ছে নিজস্ব উপাদানে বিকশিত হওয়ার।" (৮.৫.৭১)

আবার দুঃখ করে আরেকজন মন্তব্য করেছিলেন—

"বিশ্বের এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি হতাশাজনক বৈশিষ্ট্য এই যে, শাসক গোষ্ঠী আধুনিক অস্ত্র দ্বারা তা দমন করে। এবং এ সব অস্ত্র আসে পুঁজিবাদী ও

সমাজতান্ত্রিক দু'ধরনের দেশ থেকেই। আদর্শবাদের বিষয়টা হারিয়ে গেছে। স্পেনীয় আন্দোলনের সময় যে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছিল এখন আর তা গঠন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ও সিলোনের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ এর উদাহরণ। মুক্তিযুদ্ধের মহড়ার জন্যে কোনও দেশ নেই। চিত্রটি হতাশাজনক সন্দেহ নেই।" (২৯.৫.৭১)

আমেরিকার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রবি চক্রবর্তী আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন এবং যা ছিল সঠিক, তা'হলো, যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই ছিল পাকিস্তানের বন্ধু। সদ্য প্রকাশিত সেই সময়কার মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের দলিলপত্রও সেই মত সমর্থন করে। রবি চক্রবর্তী লিখেছেন–

"চেষ্টার বওলস যিনি আট বছর ভারতে ছিলেন, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি পররাষ্ট্র বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের চেষ্টা করেও সফল হননি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও ইয়াহিয়া খান তা জানেন কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তা জানেন না। এ কারণে পাকিস্তান সব সময় ভারতের সঙ্গে সংঘাতে এবং এখন পূর্ববঙ্গে গণহত্যা নীতি কার্যকর করে খুন করে পার পেয়ে যাচ্ছে।" (২৯.৫.৭১)

আমরা যারা বাংলাদেশে ছিলাম তখন আমাদের মনে হয়েছিল বাংলাদেশ প্রশ্নে পৃথিবী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জোট নিরপেক্ষ দেশ সমূহ। কেন কিছু দেশ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কেন কিছু বিরোধী ছিল সে নিয়ে নানা তর্ক চলতে পারে কিন্তু বাস্তব ছিল পরাশক্তির মধ্যে চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু ভারত তথা বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (১৯৮২)-র উপসংহারে লিখেছেন, ১৯৭১ সালে চীন, সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ তিন পরাশক্তির কেউ-ই 'বাংলাদেশপন্থী' 'বাংলাদেশ বিরোধী' ছিল না। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা করে অগ্রসর হয়েছে। ভারতও। "তাদের নীতি নির্ধারণে বহুল প্রচারিত বিভিন্ন আদর্শিক মতের কোনও স্থানই ছিল না।"

এই বক্তব্যের সঙ্গে খানিকটা দ্বিমত পোষণ করতে চাই (এবং *ফ্রন্টিয়ারের* দৃষ্টিভঙ্গির পরিপেক্ষিতেও)। অবশ্যই প্রত্যেক দেশ নিজ স্বার্থ দেখেছে এবং দেখবে।

১৯৭১-এ বাঙালিরা নিজেদের স্বার্থ দেখেছে, পাকিস্তান দেখেছে তার স্বার্থ, কিন্তু, তার মধ্যে আদর্শিক ব্যাপার একেবারে থাকে না, তা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছে, যেমন, সৌদি আরব করে ইসলামপন্থী দেশগুলোকে। কমিউনিজমের প্রভাব বলয় বিস্তার করাও ছিল এক ধরনের আদর্শিক ব্যাপার। তা বাদ দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলো প্রায় ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সহানুভূতি লাভ করেছে। অনুসরণ করেছে জোট নিরপেক্ষ নীতি।

অন্যদিকে আনোয়ার হোসেন যে 'বোম্বেটে' কূটনীতির কথা বলেছেন তা অনুসরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। খুব কম ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঐ সময় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন করেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আনোয়ার হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের ও

সোভিয়েতের 'বোম্বেটে কূটনীতি'র একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাতে দেখা যায়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্র ৪২টি ঘটনার সঙ্গে এবং সোভিয়েত ১৩টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ কথাও বিচার্য যে, যখন পরাশক্তিসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নীতির রূপ দেয়নি, তখন গণহত্যার শুরুতেই ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরালো ভাষায় এর নিন্দা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র নয়।

আট

সত্তর দশকে মস্কো-চীন বিরোধী বা পক্ষের লাইন নিয়ে মার্কসবাদী দলগুলি বহুধা বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সব ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে। ফ্রন্টিয়ার সম্পাদক ও লেখকবৃন্দও ছিলেন মার্কসবাদী তবে সি.পি. এম. থেকেও বাম ঘেঁষা, অন্য কথায় চৈনিকপন্থি। সুতরাং, ফ্রন্টিয়ার সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছে মুক্তিযুদ্ধকে। সমর সেন লিখেছেন, বাংলাদেশের মতো চীনের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পছন্দ হয়নি। অনেকেরই হয়নি। তাই তিনি আবারও লিখেছিলেন-"বাংলাদেশ নিয়ে সংকটের সময় বা চৈনিক সময় একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বর্তমান আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকের সংখ্যা খুব বেড়েছে।"

ভারতের বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেসের মতো হয়ত ছিল না কিন্তু বাংলাদেশ প্রশ্নে তেমন কোনও বিরোধ ছিল না। সমর সেনও তা স্বীকার করেছেন বিদ্রূপ করে লিখেছেন—

"বাংলাদেশের সংকটের সময় আমাদের জাতীয় সংহতি একটা অভূতপূর্ব রূপ নিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সবাই তদগত, উত্তেজিত লেখার বন্যা বাঁধ ভেঙ্গে দিল। নানা কারণে সেটা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ, যে বিদ্বেষের নানা অঙ্গভঙ্গি, নানা যুক্তি। তাছাড়া বহুদিন ধরে অনেক শরণার্থীও এই দেশে আছেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন ও পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন– এতে উত্তেজনার কারণ অবশ্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা অন্তত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের থাকা উচিত ছিল। সঙ্কটের সময় বাস্তব নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু মুজিবের সর্বদা সপ্তগ্রামে ওঠা কণ্ঠস্বর, পলাতকদের নানা গল্প, রবীন্দ্রসঙ্গীত, সোনার বাংলা সব মিলিয়ে একটি অনবদ্য খিচুড়ি পাক হয়। যে খিচুড়িতে এমনকি অল্প বয়স্কদেরও পেট ফাঁপে, মাথা পাকা হয় না। দু-একটি স্রোত বহির্ভূত দল ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এক সুরে বাঁধা পড়লেন। স্বদেশে যে সরকারের সতীত্ব সম্বন্ধে রাম-রাবণ সবাই একমত হলেন।" (আগস্ট, ১৯৭২)

সমর সেনের দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি দিলাম, অতি বামদের মনের টানাপোড়েন বোঝার জন্য। তাত্ত্বিক দিক থেকে তারা বাংলাদেশকে সমর্থন করতে পারছিলেন না, কিন্তু মনের দিক থেকে তত্ত্বকে সমর্থন করতে পারছিলেন না। সে জন্য মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মার্কসবাদের পটভূমিকায় অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধী সমালোচিত হয়েছেন, চীনকে ডিফেন্ড করা হয়েছে, কিন্তু তারপর সব শেষে চেয়েছেন বাংলাদেশ জয়লাভ করুক।

বাংলার মানুষ স্বাধীন হোক। *ফ্রন্টিয়ার*-এ এইসব চিত্রই ফুটে উঠেছে। একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ দল বা মতবাদের মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে বিচার করেছে তা বোঝার জন্য হয়ত এ সংকলন প্রয়োজনীয় হতে পারে।

২০০২

সংকলন

Letter

Bangladesh

I have been reading letters in Frontier condemning the Bangladesh freedom movement. It is better to let your readers know at the very beginning that I do not have the slightest intention of criticizing those who possess definite political ideologies. But when people betray utter lack of knowledge of the history of their own country and try to preach erroneously the teachings of leaders like Mao Tsetung it is only proper that somebody should come forward and contradict them. To understand the present freedom movement in Bangladesh, one has to think of the history of the Indian freedom movement and critically analyse the days before partition. It is not known to many that immediately after the failure of Lord Curzon to divide Bengal and put a check to the growing nationalism of the area, the British politicians under the leadership of Lord Minto thought of a novel plan. Let me quote from Lady Minto's journal dated Ist October, 1906:- This has been a very eventful day : as some one said to me 'An epoch in Indian history' .... This evening I have received the following letter from and official : 'I Must send Your Excellency a line to say that a very big thing happened today. A work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of 52 millions of people from joining the ranks of seditious opposition'." She, obviously, referred to the birth of communal electorates. The scheme came out of the fertile brain of a man called Mr. Archbold who was, then, the Principal of the Aligarh College. He was admittedly helped and supported by Lord Minto. In 1927, some prominent Muslim leaders formulated the famous Muslim Proposals. There were four points :- Separate Sindh province, reforms in NWFP and Baluchistan, proportionate representation in Punjab and Bengal and one third seats in the Central Assembly. At the Third Round Table Conference in 1932, J. Coatman, CIE, wrote :- The creation of a strong, united India,

including the whole of British India and the Indian States and the borders in the North-West, whose inclusion in India was one of the first and most fundamental conditions of her nationhood is, day by day, being made impossible, and in its place it seems that there may be brought not being a powerful Mohammedan State in the north and north-west, with its eyes definitely turned away from India, towards the rest of the Moslem World of which it forms a fringe, whilst away to the south and east there will be what?" One should take note of the fact That Bengal was never one of the places regarded as a predominantly Muslim area. In 1933, the Punjabi student of Cambridge. Chaudhuri Rahmat Ali, gave the separatist movement a shape and a name. He propounded the idea that the Punjab. NWFP (Afghan Province). Kashmir, Sind, and Baluchistan should be formed into a separate Muslim State called Pakistan." Chaudhuri Rahmat Ali was a creation of the Churchill-Lloyd group of the Conservative Party. It is obvious that even a politician like Churchill could not dream of calling Bengal a predominantly Muslim State. Even in 1946, the Cabinet Mission stated :- The setting up of a separate sovereign state of Pakistan on the lines claimed by the Muslim League would not solve the communal minority problem ; nor can we see any justification for including within a sovereign Pakistan, those districts of the Punjab and Bengal and Assam in which the population is predominantly non-Muslim League governments before 1946. But that did not persuade the Cabinet Mission to believe that Bangla should be divided. And yet, Bengal was divided. How? And who was responsible for this? To find out, we have to go back to 1940 when Mr. Rajagopalachari started to play his game. Allow me to quote from Pattabhi Sitaramayya : "He has been differing, in fact from Gandhi for some time earlier. He was mainly, yea, wholly responsible for the Resolution of the AICC passed at Poona in July, 1940, a meeting not attended by Gandhi. Poona was later undone at Bombay (August 1940) which paved the way to Individual civil disobedience Movement in October 1940. C.R. did not choose to tread the beaten path by writing to Government the slogan about war which Gandhi and the working the slogan about war which Gandhi and the Working committee had adopted and recommended to Congressmen....He was largely instrumental in persuading Gandhi to suspend the IDM in November, 1941 and the Bardoli Resolution was the result" To C.R. the key to the situation lay in a friendly

attiude towards the Pakistan idea. The idea was not authoritatively clothed and put into shape by Mr. Jinnah but C.R. had formed certain ideas about it. At the base of it lay the two-nation theory which he had accepted." C.R. himself state. : "I stand for Pakistan because I do not want that state where we Hindus and Muslims are both not honoured. Let Muslims have Pakistan .... I stand for Pakistan but I do not think the Congress will agree to this." There is no doubt that C.R. was instrumental for including Bengal in the list of provinces that were to be awarded to Mr. Jinnah. On 8th April. 1944, C.R. had made his "constructive proposals" to Mr. Jinnah. C.R.'s formula was endorsed by Gandhiji. The formula was : After the termination of the war a commission shall be appointed for demarcating contiguous districts in the north-west and east of India, wherein the Muslim population is in absolute majority...If the majority decide in favour of forming a sovereign state separate from Hindustan, such decision shall be given effect to.

Thus, the history of the Indian freedom movement tells us that more than 10 crores of Bengalis were betrayed by people who never liked them for their nationalism. For the immediate results of partition. I request your readers to go through Dr R.C. Mazumder's History of the Indian Freedom Movement (Vol.III)

Now, we have to take note of two very important things. One was the list of names that was sent from the President of the Muslim League to Lord Pethick-Lawrence, the head of the Cabinet Mission, on 29th April, 1946. The names were those of the representatives of the Muslim League :

(1) M.A. Jinnah (2) Nawab M.I. Khan (3) Nawabjada Liaquat Ali Khan and (4) Sardar A.R. Nishtar. Out of the four representatives, two were feudal rulers and the other two represented the upper middle class. Pakistani rulers have always been the representatives of the feudal landlord class. Yahya Khan and Z.A Bhutto are no exceptions. And what about East Bengal? Barring a few landlords, the whole area belongs to lower middle class people and peasants, subjected to all sorts of torture.

The second item of interest was made clear by the Cabinet Mission. Paragraph 10 of the Statement by the Cabinet Delegation and His Excellency the Viceroy, New Delhi dated 15th May, 1945, reads as follows :-"Finally, there is the geographical fact that the two halves of the proposed Pakistan state are separated by some even hundred

miles and the communications between them both in war and peace would be dependent on the good will of Hindustan." Also, in Para 7, we get the following lines :-"We ourselves are also convinced that any solution which involves a radical partition of the Punjab and Bengal, as this world do, would be contrary to the wishes and interests of a very large proportion of the inhabitants of these provinces. Bengal and the Punjab each has its own common language and a long history and traditional". What the foreigners could realise was not understood by men like Jinnah and Rajagopalachari! Or, did they deliberately, choose to be ignorant ? Whatever be the will of 10 crores of Bengalis. A quarrel between the two parts of Pakistan was inevitable. I am surprised to find that the quarrel has taken concrete shape after 23 years.

So before we start judging the class character of Sheikh Mujib, we have to judge the same of the rulers of Pakistan. They are the sons of big landlords and zamindars. Any quarrel with them is a quarrel with feudalism, superstition and blind religion. They do not deserve the support of any civilised human being. Nor, as a matter of fact, are they getting any. They have been admirably isolated. If China, the most civilized country in the ancient world, extends her helping hand towards Pakistan, the reasons must be other than political. Moreover, China cannot allow Mujib to achieve victory in Pakistan. That would hamper her prestige as the leader of all the liberation forces in the world. Will Mr. Charu Majumdar be able to tolerate say, Jaiprakash Narayan or Charu Chandra Bhandari if all the peasants in India revolt under their leadership?

Now we have to think of the second big problem, the problem of a proper reading of Chinese history and the works of the leader of the Chinese revolution. The question that we have to answer now is-did Mao Tse-tung take the help of the bourgeoisie in his bid to free the country from foreign yoke? The answer is, yes, he did. He took the help of all the nationalist parties at the time of driving the Japanese out of China. His greatest friend and ally at that time was Chiang Kai-shek. He was all the time conscious that Chiang was a potential enemy. He was getting ready for any eventuality. But he did not kick Chiang out of China when his country was engaged in a bitter fight against the Japanese aggressors. For a clean understanding of Mao's political outlook of the time. I request all your readers to go through Chen Po-ta's great work on Mao Tse-tun realised that without the

help of the bourgeoisie he would never be able to defeat the powerful. Japanese aggreeors in our country however, we have been witnessing a typical hate-campaign against the bourgeoisie. At this initial stage of the movement, this sort of perverted application of Mao's Thought may prove disastrous.

Even if we take it for granted that the present freedom movement in Bangladesh is nothing more than a bourgeois uprising, we should support it for three reasons :- (1) Bangladesh was made a colony of West Pakistan much against the will of the people living there ; (ii) Pakistani rulers are invariably the inheritors of medieval feudalism and (iii) Bangladesh has always been very close to our hearts. Ordinary people have always known, what the Cabinet Mission accepted as the truth, that socially, culturaly, historically and geographically, Bangladesh has always been 700 miles away form West Pakistan but only a few paces away from our Bengal.

Rathindranath Chattopadhyay
Calcutta
Frontier 05.06.1971

Rajshahi : A Post-mortem
D. Chakrabarti

Returning from Rajshahi in the second week of April it become evident how our news media have been distorting facts. When on April 14 and 15 Rajshahi town and the adjoining villages were burning before my own eyes, the town being under the complete control of the Pakistani army, and the fighting forces of Bangla Desh had retreated from the area and were trying to miles away, AIR kept saying that Rajshahi was still under the control of "Mujib forces" and that fierce fighting was going on.

In these sector during the first few days of battle against the Pakistani forces, besides men of the EPR, the Mujahids and the Ansars, the student volunteers of almost all the left. parties like the EPCP (ML). NAP. other pro-Peking groups and even pro-Moscow EPCP, took active part. Those who became conspicuous by their almost total absence were the Awami League and Chhatra League leaders. Even the District President of the Wali-NAP (and also if the EPCP) left the town "for want of security". Only when the army had taken shelter in the Rajshahi cantonment and when besides the regular forces, armed peasants from Nababganj. Natore and Nowgaon

had encircled them from three sides, did the AL and CL leaders come back and demand a dominating position in action committees. In reality, among the civilian population, mainly the left forces gave the leadership. It is an unpleasant fact but it must be mentioned that some rightist parties fostered communal killings of even innocent and poor non-Bengali Muslims. One of them even declared at Berhampore on March 30 that all Pakistanis were their enemies, not only West Pakistani military forces, businessmen and spies, but also the West Pakistani labourers and Peasants. At Rajshahi many innocent men were killed and their property looted. In some cases the left students saved innocent non-Bengalis at the point of the bayonet.

The military strategy of the AL leader who was made the convener of the Action Committee was such that he stopped even the supply of diesel oil to the farmers, thus hampering agricultural production, while supply of petrol did not pose any problem to the Chhatra League members in their unnecessary journeys by jeep. Supply of food and ammunition to the frontline fighters was hampered. All this explains the note of despair in the statement of Capt. Giasuddin Chowdhury of EPR after the retreat of the freedom-fighters : "The political leaders promised me all things, and then I never got them. I find it hard to trust any of the local leaders. I know that they are sitting around in Calcutta and Agartala. But their place is here and not in meetings that can't possibly yield any result."(The Statesman, April 16).

But even then the EPR forces fought gallantly. The student volunteers showed great courage. On the morning of April 13, the army, cooped up within the cantonment, were on the verge of surrender. But precisely at that moment new forces advanced by road from *Nagarkotaghat* through Ishawardih, Pabna and Sardaghat, setting fire and killing almost everyone of the roadside. They reached Rajshahi and attacked the liberation fighters from the rear. After a few hours' fight the EPR, who were in the front line of the cantonment encirclement, had to retreat in the face of superior armed forces. From the morning of the 14th the army began to control the town. They killed or destroyed almost everything in it, set fire to villages on both sides of the road up to Kathalbari, three miles from the town, and killed thousands of panicky villagers who were crossing the Padma.

My talks with students of all shades of political opinion revealed that the left-wing students are determined to continue the struggle. The

EP-CP(ML), and pro-Peking elements, and even the pro-EPCP Students' Union cadre said they would go back to villages and organise armed resistance. Many rural people came to Indian territory for shelter, but here were many who were determined to remain at their native places. One thing became clear during my journey through the villages outside Rajshahi town : many villagers want to fight but did not know how to organise themselves.

Reports of fighting from Pabna, as available in Rajshahi, showed almost the same picture. There, too, left forces were in the forefront of the struggle and AL leaders came forward only after the initial victory, to be included in the leadership. A curious leaflet was circulated declaring that "the West Pakistani enemies have been finished, and now it is time to finish off the other enemy, i.e. the Communists". There were of course militant CL supporters who fought bravely ; but they were exceptions.

A few EPCP (ML) and pro-Peking fighters whom I met explained their thinking very clearly. According to them, Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League have utilised the genuine grievances of the East Bengal people against the West Pakistani big bourgeoisie and tried to limit people's resistance to "peaceful" means-so that East Bengal does not become another Vietnam, so that U.S imperialism after its tremendous defeat by the Indo-Chinese people, can turn East Bengal into its military base, and the imperialist plot to encircle China succeeds. But owing to the conflict of interests with the West Pakistani expansionists, Yahya Khan had to resort to armed onslaught on the East Bengal people. People's armed resistance has grown spontaneously, even the militant patriotic elements with the AL-dominated CL revolted and the Sheikh had to support this for survival. But in the world today, any national liberation movement must be a part of the world people's war against world imperialism, headed by U.S. imperialism. Hence the fight of the East Bengal people against the big bourgeoisie of West Pakistan must be linked with their fight against US imperialism. But forces are trying to turn the anti-imperialist revolutionary spirit of the East Bengal people into a reactionary plot. Lakhs of people have shed their blood for genuine freedom, not only from the West Pakistani bourgeoisie but also from US imperialism and Soviet social-imperialism. The wheels of history cannot be turned back. The people of East Bengal have learnt the revolutionary lesson that "political power comes out of the barrel of a

gun." Under the leadership of the revolutionary communists of East Bengal, the agrarian revolution must merge with the liberation struggle: political power will be established in rural areas and the cities surrounded by the rural base-areas, and final victory won through protracted struggle. None can stop it.
These pro-Peking fighters fully support china's stand in this matter. Pakistan's future, as well as the future of East Bengal, must be decided by the people of that country. No interference of U.S. imperialism, Soviet social imperialism and Indian reactionaries will be tolerated: otherwise the revolutionary struggle of the East Bengal people would be dominated by the imperialist design of turning East Bengal into a military base and using it in the anti-China plot. According to them, China has correctly promised to support the Pakistani people against imperialism and colonialism. But China did not support Yahya Khan in his military onslaught against the East Bengal people, which is evident by China's protest note to the Indian government, stating that it was a slander that China was aiding the Pakistan Government in its war on the freedom-loving people of East Bengal.
These boys were confident that whenever their liberation struggle becomes part of the world people's war against world imperialism, China will support in.
Frontier, 01.05.1971

A Famous Victory

The West Pakistani army in East Bengal has put up a miserable performance so far. The vast distance from the west, disruption of supplies and the demoralisation that comes from the fact that it has almost no support among the Bengalis whom it gave a terrible time are the principal reasons for the debacle. These would have taken time to mature and contribute to the defeat the Indian army, acting with clock like precision in collaboration with the Mukti Bahini, has hastened the process-and complicated it. It is the beginnig, not the end of a chapter.
A military defeat of such magnitude involving directly some 70,000 troops whose families are far away and fretting will have major repercussions in West Pakistan, even if the war on that front ends in a stalemate. It would have brought about the collapse of the regime if the political opposition there were strong-had it been strong enough.

Pakistan would have continued to exist. What is more likely is a tremendous hardening of attitude over the dismemberment of Pakistan-the grievance over Kashmir is nothing compared to the loss of East Bengal-and the creation of a revengeful, Israeli-type army with massive foreign aid, preparing and ever ready for a lightning war on one front. In the east also, since there is no chance of a major detente with China, the Indian army will continue to have an uneasy time despite the Russian umbrella.

On the political front, will all be quiet in East Bengal after the fall of Dacca and the installation of the Bangladesh Government ? There will be middle-class bitterness over the distribution of spoils. There is contradiction between those who fought and those who had an easy time in exilic: between those who fled the country and those who had the guts to stay on and fight; between those civilians, with Indian super-officers who are preparing to take over this rich land and those who could not leave the government but helped the local fighters; between Indian capitalists with their formidable resources and the indigenous entrepreneurs. There is also the politico-military front. Not all those who took up arms will hand them over to the government or the Indian army. They have tasted, in a limited way, the power that comes out of the barrel of a gun. And there are armed people who do not look upon the Indians as liberators.

A period of imbalance of this sub-continent has started, even if one leaves out the implications of immediate maneuvers to help Pakistan. The fact that despite the official announcement that all Pakistani planes in the cast have been accounted for, the total black-out in large areas of West Bengal will continue is symbolical of the uncertainty, anxiety and unease that will dog the authorities even after a famous victory in East Bengal.

Frontier, 18.12.1971

Documents

Pakistani Envoys' Conference

A meeting of Pakistan ambassador was held in Geneva on August 24-25 presided by the Foreign Secretary, Sultan M. Khan, and attended by Lt. Gen M.Umar and Information Secretary, Roedad Khan. The main points were :

The Foreign Sceretary admitted that the present crisis is the biggest since 1947 and blamed India. He referred to the hostile press in USA

and the hostile press and Government reaction in U.K. He thought that Pakistan's case had not been understood. He mentioned the August 17 letter of Kosygin promising Russia's continued desire to help Pakistan. President Nixon had also agreed to continue maintaining economic and other aid to Pakistan. China is also interested to maintain the integrity and strengthening of Pakistan. Many Arab states had told India not to interfere.

Lt. Gen Umar believed that the military situation was under control in the absence of any organised military resistance. As such no organised military operation was necessary except repelling Indian aggression and action of saboteurs. To counter saboteurs, civil armed forces and Razakars have been organised. He admitted that the communications had been almost ruined and it would take a very long time to restore them. The Awami League would remain banned and some members would face criminal charges and if found guilty would lose their seats. He mentioned that some civilisation of the administration was to take place soon. Martial Law would assist civil administration. He asserted that the economy had to be restored, food sent to areas of shortage. The future constitution would ensure autonomy as well as integraity.

Information Secretary. Roedad Khan, admitted that the image of Pakistan had been badly tarnished. He said that a most resolute publicity offensive was to be launched. He asserted that adequate staff and funds would be made available.

Main observations of the Ambassadors/High Commissioners :

U.S.A. Mr. Z. M.Faruqi (For Agha Hilali) said that Nixon is well disposed to Pak views as a result of the Pak role in US China rapprochement. He admitted the scepticism of U.S. public and Congressmen over East Pakistan. The U.S. would continue to assist the current projects. Admitted that Senator Kennedy's support of Awami League and refugees in India made adverse publicity for Pakistan. He believed that the establishment of civil government in East Pakistan would improve the image of Pakistan. He urged intellectuals, students from both wings to visit USA to influence the views of the U.S. government and the public.

USSR : Ambassador Jamshed Marker believes that the Russians have no intention for severing ties with Pakistan and that the Indo-Soviet Treaty was mainly aimed at extending Russian influence in South-East Asia. He regarded the Treaty as more anti-Chinese than

anti-Pakistan. The Soviet Union has given no indication that economic aid to Pakistan would be reduced.

UK : High Commissioner Salman Ali said that the British government had not seen Pak views. He revealed that the High Commission had set up a Pakistan Solidarity Organisation to counter the various Bangladesh organisations. He blamed the British press as Jewish inspired and thought that the Labour party was bent on undoing the partition of 1947. The H. C. had been financing groups and individuals to focus Pakistani views.

He also of methods to befriend the Sylhetis. He advocated the insertion of advertised publicity in the times and other newspapers during the visit of Mrs. Gandhi to UK and the opening of the General Assembly of the UN. He would also try to screen the Pak films on the Bengali massacre of the non-Bengalis.

China : Ambassador K. M. Kaiser said that China wanted non-intervention. He stated that China had advised a political settlement maintaining the integrity of Pakistan. China is ready to give aid for rehabilitation of E. Pakistan economy. The Chinese press did not publicize the Indo-Soviet Treaty and China believed that it is directed against China. China intends to strengthen her relations with Afghanistan. Ceylon. Nepal and Burma. China would like to see Pakistan active in the politics of Indo-China. Ambassador Kaiser was not sure about the mature of Chinese help in case of a war between India and Pakistan. Private sources indicate arms shipment to Pakistan since March 25 was almost nil. Most of the Chinese weapons Pakistan is using were received during the years after 1965.

UNO : Ambassador Agha Shahi said that in the last ECOSOC meeting Pakistan got support on technical grounds and not on substance. He is afraid that in the forthcoming General Assembly session India would get strong support of Bangladesh issue. He suggested that some drastic measures must be taken to prevent this,. Restoration of civil government, substantial return of refugees, tackling the present food shortage. postponing the trial of Sk. Mujib were some of his suggested measures. He mentioned the hostile press in the USA-New York Times. Washington Post. Time and Newsweek magazines-and recommended advertised publicity. He strongly suggested that the press and TV must be made to see Pak view at any cost. He recommended that the Pak. delegation to UN should include East Pakistanis.

France : Ambassador Dehlavi said that the French press and public are not sympathetic to Pak views. According to him France regarded the Pak problem as a humanitarian problem.
W. Germany : Ambassador J. G. Kharas said that the German Government regarded this as an internal affair but India had been trying to blackmail West German press and suggested that action be taken to counter this.
Canada : H/C Sajjad Hyder said that the Indian Foreign Office is trying its utmost to influence the foreign ambassadors. He did not agree that the Indo-Soviet treaty would restrain Mrs. Gandhi in her plan to recognise Bangladesh. He believed that India and Russia may have some agreement on future actions with regard to Bangladesh.
Switzerland : Ambassador Afzal Iqbal said that the Swiss government was very much distressd at the human misery in East Pakistan.
Austria : Ambassador Enver Murad said that the Austrian government had shown great anxiety over the reported loss of human lives as well as the influx of refugees into India. The Austrian press had been very critical of Pakistan's action in East Pakistan.
Turkey : Ambassador Iftikhar Ali said that although the Turkish government was committed to assist Pakistan both the Turkish press and public were divided on this issue. He did not foresee any favourable change in their attitude towards Pakistan.
Poland : Ambassador Bahsirul Alam said that the Polish Government did not agree with the contentions of the Pakistan government. The Polish government is greatly concerned over the refugee problem. The Polish press was critical of Pakistan and held it responsible for the E.P. tragedy. He also did not fores any appreciable change in the postion of either the Polish press or government.
Spain : Ambassador Maj. Gen Abid Ali said that the Spanish government completely unerstood Pakistan's stand. Spain not only fulfilled with promptitude all the arms orders placed with them but had offered additional supplies at favourable terms. But a part of the Press was critical of Pakistan.
Czechoslovakia : Ambassador Kamaluddin said that the Czech government as well as the press were anxious about the Pakistan tragedy and urged a political settlement.
Sweden : Ambassador M. Safqat Ali did not participate in the discussion.
Argentina : Ambassador Abdul Momin arrived after the meeting had ended.

Ghana : H/C S. A. Moid said that the Ghana government followed a neutral policy.
Netherlands : Ambassador R. S. Chatari said that the Dutch government was greatly perturbed over the human misery. Holland was distressed over the unilateral moratiorium decision. But the Dutch government had moratiorium decision. But the Dutch government had agreed to lease out 7 coasters on payment of 2.8 million dollars.
Nigeria : H/C Samiullah Koreshi said that Nigeria supported Pakistan since Nigeria herself suffered from such a secessionist revolt.
Belgium : Ambassador Masood said that neither the press nor the government did appreciate the stand of the Pakistan government.
Yugoslavia : Ambassador I. A Akhund said that the Yugoslav government was well disposed towards Pakistan but did not agree that the revolt was India-inspired. He also reported the very active part played by one Mr. Bam of India, at present head of UNDP in Belgrade.
Frontier, 13.10.1971

The Year Of Confusion
C. Prasad

The year 1971 will perhaps go down in history as the "Year of Confusion". Bangladesh, Ceylon, Sudan and to cap it all the Nixon trip to Peking. What really has been happening in China? The new left in the West is puzzled, frustrated, angry. The Trotskyit fringe has lashed out at the chinese for their "great betrayal" while the Maoist factions have come out with a defence, lukewarm and often unconvincing, of Chinese policy. But the critique and defence have been more emotional than rational. Two recent articles in the left-wing French press, however, do not quite belong to this category.
Hamza Alvi writing in Jean-Paul Sartre's Les Temps Modernes has tried to view Bangladesh from a nonorthodox Marxist angle and has come out with an indictment of the Chinese policy towards Pakistan as "myopic". One of his basic premises is that in post-colonial societies like Pakistan the superstructure of the State often does not correspond to the indigenous socio-economic base. Compared to the state of the economic infrastructure and that of the national bourgeoisie, the state superstructure is "overdeveloped". And he suggests a triangular conflict between the bureaucratic-military oligarchy, the

bourgeois and landlord classes of Pakistan and the petit-bourgeois nationalists of East Pakistan. "The movement for the independence of East Bengal". he says, "cannot be explained in terms of the interest of the Bengali bourgeoisie" because the bengali nationalist movement came into existence before the Bengali bourgeoisie was born. The class basis of the movement is essentially petitbourgeois. But armed struggle for liberation has transformed it into a popular movement.

Alavi, however, does not have any illusion about the reactionary nature of the Awami League leadership. At the beginning, he says, the ruling classes of Pakistan were in the same dilemma as Mujib. They knew that the Awami League was the last bastion of the social system to which their interest was inextricably linked. If they did not concede the demand for regional autonomy the situation might turn revolutionary and they would stand to lose more. The Awami League too faced the dilemma of choosing between the army and the rapidly rising popular force. Americans had no such dilemma what soever. They overtly supported, encouraged and infiltrated the Awami League. It was clear that an independent East Bengal under Awami League rule would pass squarely under American influence. India too made significant intervention through diplomatic activity and propaganda. The Indian press and radio reacted to the Pakistani army's action by exaggerated and even erroneous statements. This hardly helped the Bangladesh cause because by the same token Pakistani propaganda according to which the trouble in East Pakistan was fomented by India and participated in by "Indian infiltrators" became credible. But there is little proof of Indian military intervention.

India, according to Alavi, aims at setting up an Awami League government in Dacca through international pressure and if this could be realised with the help of Western pressure India could hope to develop close cooperation with Bangladesh. Such a possibility obviously raised the apprehension of the Chinese to whom geopolitically this is a most sensitive region. In the context of their conflict with the Western powers, the Soviet Union and India, the Chinese placed more importance on friendship with the ruling oligarchy in Pakistan. Chou Enlai's message to Yahya Khan and the Chinese warning against "external intervention in the internal affairs of Pakistan" have helped to mislead public opinion and strengthen the morale of those who committed one of the worst crimes in history against a people.

Maoist Left

Alavi believes that the Maoist left of East Bengal is the vanguard of the united struggle for national liberation along with other left groups and the militants of the Awami League who have preferred armed struggle to withdrawal into India. In putting accent on intrigues and Western designs and speculating on the future orientation of an Awami League government the Chinese, they think, have underestimated the role of the liberation fighters. Thus not only have they become politically isolated but they have also failed in their obligation the proletarian internationalism. They have equally demonstrated their extreme myopia, their incapability to understand the developmint of the social forces in Bangladesh and the real support existing between the Awami League leadership and the struggling people. The Awami League leadership were riding a munting tide of nationalism that would not easily recede. Despite their limitations and their dependence on the West they did have no other choice but to accept the popular demand and thus reinforce direct struggle. It is the role played by the liberation forces— and not the orientation of the Awami League leadership— which will determine the course to be followed by the Bangladesh government. The Chinese reaction can only spread confusion at the base and weaken the revolutionary unit. Happily, according to information available, the Maosist leadership of East Bangal has not been misled or diverted from their task in the coming struggle. They fervently hope that the Chinese will realise their mistake and correct it.

Explaining why in the final analysis the reactionary nature of the Awami League leadership would not count, Alavi says that even among the leadership there are people more inclined to the masses than to anti-people compromise with the Western powers. Moreover, an Awami League government cannot but depend on the people because in East Bengal there is no repressive apparatus. There is practically no Bengali army.

Hamza Alavi believes that without a change in the mode of production regional autonomy cannot solve any problem. But while underlining the importance of a common struggle for socialism in Pakistan he wants to accord equal importance to the struggle for the liberation of Bangladesh. Independence of Bengal is already a historic necessity. Not because by itself it will resolve the problem of regional disparities, neither because it is the problem of regional disparities,

neither because it is the only one to posses a different national identity in the whole of Pakistan. It is necessary because the bloody operation conducted by the army has rapidly created a totally new problem of regional disparities. neither because it is the only one to posses a different national identity in the whole of Pakistan. It is necessary because the bloody operation conducted by the army has repidly created a totally new political situation. It has irretrievably snapped the political tie the existed between East Bengal and West Pakistan and dramatically crystallized the Bengali nationalist sentiment. It has also set in motion the forces for national liberation which will not allow the struggle for socialism to be stopped by the weak petit-bourgeois Awami League leadership.

Different Assessment

Kost's Maverkis, another Marxist writing for La Nouvelle Chine, a Parsian monthly devoted to Chinese affairs, has made a quite different assessment of the struggle in Bangladesh and justified the Chinese position vis-a-vis Pakistan as principled Marxist-Leninist stand. Aware that the Western press has distorted and misinterpreted the Chinese statements Mavrakis starts with an anlysis of the text of Chinese messages and statements which are anyhow very few in number. The declaration of April 8 which accuses Indian reactionaries of slandering China by saying that she is helping in suppression of the "freedom loving people of East Bengal" cannot in any way be construed as Chinese support to the Pakistani Army's "what do the Indian expansionists want?" is reaffirmation of the Chinese support to the Government and people of Pakistan against aggression and intervention from outside. So far Chou En-lai's message to Yahya Khan is concerned, it has never been published by the New China News Agency and the Chinese Embassy in Paris has declared itself unaware of the text. If it is false the absence of explicit Chinese denial could be explained by unwillingness to snub a friendly to draw from the text conclusions the Western press has readily drawn. At a time when Yahya Khan broke off negotiations to resort to the gun Chou En-lai writes : "We believe that thanks to the wise consultations and effort of Your Excellency and leading personalities of the different political sectors of Pakistan the situation will become normal. Wasn't it an advice to seek political solution instead of military repression? At a time when the world press published reports on the

massacres in Bengal Chou wrote : "It is highly important to differentiate between the large mass of people and a handful of persons who want to sabotage the unity of Pakistan." Finally it is to be noted that in the test the paragraphs stating the Chinese official position start with : "The Chinese Government considers that...."But the ones dealing with Pakistan's internal problem start with :
"We believe..." and "according to our opinion..." And they are concluded by the phrase "As friendes of Pakistan we submit these views for your information." It is thus a personal and private missive and this would perhaps explain why the Chinese have refused to publish it.
From the analysis of the official Chinese position Mavrakis has drawn two conclusions. First the Chinese support to the Pakistan government is directed uniquely against Indian interference. Secondly, in the present situation the Chinese do not seem to wish the dismemberment of their sole ally in this part of the world (which would be to the greatest advantage of India).
After referring to the U.S.-Soviet attempt to encircle China and the key role India played in it. Mavraksi points out the necessity for China as a state to counter these moves. By having ties with Pakistan China conforms to the principle : "
We should support everything that the enemy opposes". It is on the basis of this principle that Lenin concluded the Rapallo agreement with Germany. The case of Cambodia is also similar. This country found itself menaced by the territorial designs of Thailand and South Vietnam both supported by the U.S.
Prince Sihanouk also had to draw closer to China and North Vietnam. These two countries on their part knew that friendship with Cambodia helped the struggle against American intervention. Aid from China and other socialist countries to Cambodia allowed Sihanouk to break off ties with the U.S. Later events have shown how wrong it is to think that Chinese "support" to a government representing the propertied classes would be an obstacle to the development of revolutionary movement. The good relation Peking had with Prince Sihanouk did not hinder the Cambodian communists from striking root among the masses and gathering military strength. Prince Sihanouk suspected China of supporting them and did not hesitate to criticise her in his speeches. Nevertheless, thanks to chinese assistance Sihanouk could resist American pressure which ultimately brought about the coup d'etat. Thus the skilful Chinese poli-

cy led Sihanouk into a position where he could be of service to the people. After the coup his speeches broadcast all over Cambodia have helped to rally peasants to the revolutionary movement.
Coming to the Chinese attitude at party and people's level Mavrakis says that by not supporting Bengali nationalist they have not violated Marxist principles. There are always exceptions to the general principle of supporting national movements depending of concrete circumstances. Marx and Engels were for the independence of Poland and Hungary but against the national movement of the Czechs and Slavs of the south. Lenin in his polemics with the partisans of Rosa Luxembourg explained that in view of the changing international situation it becomes necessary to adopt a different attitude. "In that epoch (of Marx) one had to be against Czar (and against a certain movement of small nations utilised by the Czar for anti-democratic purposes) and for great revolutionary nations of the West. Today one has to be against the front, henceforward unith, of the imperialist powers and for all national movements directed against imperialism to the profit of socialist revolution." (Oeuvres Completes, t. 22 pp. 368-9). While calling on the oppressed nations to rise Lenin nevertheless stressed that "different democratic demands, including the right of national self-determination, are not absolute but part of the whole worldwide democratic (now socialist) movement. It is possible that in certain cases the part is in contradiction with the whole. Then it has to be rejected. It may happen that the republican movement of one country is an instrument of the clerical, financial or monarchic intrigue of other countries. Then we have the right no to support this movement." (ibid p. 367)
Some "leftists" have criticised China on the assumption that an autonomous people's movement has been existent in East Bengal. But citing evidence of the Western press Mavrakis has tried to show that the Awami League is nothing but a bunch of reactionaris tied to the apron strings of India trying to get a share of the cake. He quotes the Director of the Indian Institute of Defence Analysis as having said, "The disintegration of Pakistan is in our interest. We have thus a rare chance. "Mavrakis concludes that the Awami League is an example of a nationalist movement turned, by all evidence, into an instrument of Indian expansionist intrigue. In the absence of an autonomous movement the two parties in the recent crisis are India (and her allies of the Awami League) and Pakistan. The Bengali peo-

ple are a victim almost reduced to passivity. But he is certain that if the Bengali liberation movement becomes a genuinely popular, anti-imperialist and anti-feudal and autonomous movement the Chinese people will not fail to express their solidarity. The situation than would be different. A revolutionary Bengal would sap the established order of the whole Indian sub-continent.

Letter From America
U.S. And East Bengal
Robi Chakravorti

Recently, I received a letter from a friend of mine in Calcutta asking me why America is silent over the massacre in East Bengal. At about the same time, I came across an article published in The Statesman which claimed that the average American was "deeply moved" by the army action against unarmed freedom fighters in East Bengal.

Both reactions are typical of the confusion that, I assume, prevails in West Bengal regarding the U.S. posture on East Bengal. The confusion, I suppose, has been made worse by the action of the Senate Foreign Relations Committee calling for suspension of all military aid and military sales licences to Pakistan until the conflict in East Bengal is resolved.

The confusion stems from our muddled thinking on some simple facts of life about the United States, its political process and its foreign policy assumption. When we criticise, support, oppose or adore the "United States," we do not know what we are talking about. Are we referring to the Foreign Policy executed by the Administration, or to newspaper editorials in a handful of great newspapers or magazines? Are we thinking or some Congressmen and public opinion leades assuming that their view scan influence Congressional deliberations and, eventual the White House?

To avoid confusion, it is necessary to make a separation between three factors relevant to the making of U.S. foreign policy. First, there is the executive branch of the United States Government. Second, there is Congress. Third, there is the vague thing called public opinion which is supposed to be reflected in or moulded by the mass media. When we discuss the United States' silence on the atrocities in East Bengal, we must remember to make a clear distinction between these three factors.

Let me take the third factor first. The Statesman article is very much on my mind, and I would like to use it as an illustration of how jour-

nalists often mislead people in their ignorance combined with a lofty opinion of their own vocation. The Stateman's reporter, K. Katyal is his name— wrote. "A recent visit to the USA and Britain revealed surprising gaps between official postures and popular sentiments. In both countries, there was not mistaking the non-official mood— expresssions of horror at the genocide in East Bengal were forthright and sincere. The Government, however, dithered—or so it seemed". In another part of the article, Katyal talked glibly of the "average" American, and sermonised. "Whatever the Government or politicians may or may not do, the average American, it was clear, was deeply moved by the army action against unarmed freedom fighters."

Katyal seems to have accepted the people he must have met during his short visits to big cities as representative of the "average" American. He must have, also, read editorials and newspaper reports in great "national" newspapers and magazines and quickly concluded that they reflect the views of the "average" American. It is not that simple: if it were, the Vietnam war would have been over by now and the Negroes in this country would have had real, substantive equality in all walks of life, not merely in the small area of schooling. In fact, Nixon and his political strategis are making the point that the mass media do not accurately reflect the views of the "middle America," the "average" American, if you please, and they are not all that wrong in their estimate.

Newspapermen from India and other "underdeveloped" countries, visiting this country on Government or Foundation auspices, often make the easy mistake of equating the views of great newspapers as representative of the "average" American. They forget that these great newspapers are few in number, straddling a country geographically much larger than India and population-wise about two-fifth of India's size.

Average American

The "average" American, if there is one, reads his hometown newspaper, which is fatter than Indian newspapers and frequently, leaner in coverage of foreign news. He works from eight to five and if you take into account the time for commuting, his household worries, his down-payment problems etc., he is a pretty harassed fellow who does not only lack time for absorbing foreign news carefully, but often also, intellectual capacity, interest or motivation to do so.

Whatever the "average" American may do or thing, he certainly does not sit behind a typewriter in the office of the New York Time or Newsweek. Secondly, even if these handful of publications did reflect the opinion of the "average" American, we have to recognize the fact that public opinion is a vague, clusive thing, and that unless it is aroused on an issue that affects the interest of the country directly, it is unlikely to have any influence of the machinery of policy making. The "average" American has only peripheral interest in East Bengal; he will have a great deal of difficulty even in locating the country on the map. East Bengal is not an issue which falls in the area of the "average" American's interests,-cultural, political or economic. The situation would perhaps have been different if there were large pockets of American residents of East Bengal ancestry who could have campaigned for public interest or put pressure on Congressmen.

Public opinion in this country may have taken into cognizance the events in East Bengal with a mixture of curiosity, puzzlement and some compassion. On some sensitive minds, the reports and pictures from East Bengal may have left scratches. But it would be outright folly to claim, as the writer in The Statesman has done, that the "average" American has been "deeply moved" by the events in East Bengal.

The elites are, however, another matter. They consist of intellectuals, writers, journalists, old India hands, such as former Ambassadors or Ful bright scholars and Congressmen. The Senate Foreign Relations Committee's action on the military aid to Pakistan. Peggy Durdin wrote an excellent article in the New York Magazine. The AP correspondent, one of the six foreign newsmen to visit East Bengal under army escort, described the horrors of carngage there. Popular magazines like Newsweek and Time published reports which can be interpreted as critical of the Yahya regime. Left-wing journals such as the New Republic and I.E. Stone's Bi-weekly have called for suspension of aid to Pakistan.

It is one thing, however, to claim that these opininons exist; it is another to argue that they reflect a deep concern on the part of the average American, and that consequently the U.S. policy towards Pakistan is likely to change. The Senate Foreign Relations Committee has spoken as did a number of newspapers and magazines; but there is little indication that policymakers in Washington are going to change their thinking towards Pakistan.

At the moment of writing. the U.S. government-different from the Senate Foreign Relations Committee and some newspapers and magazines—seems to be unflinching in its military and economic support of the Yahya government. The State Department's answer to the Senate Foreign Relations Committee's vote against continuance of military aid to Pakistan is evidence of the U.S. Administration's official attitude to the problem. The suspension of aid, the State Department argued, "would not significantly affect the military situation in East Pakistan and could have a strongly adverse political impact on our relations with Pakistan. "If the logic appears Machiavellian, it is so only in the eyes of those who are emotionally involved in the struggle for Bangladesh to policy is, of course, balance of power that favours its interests and endangers communists. It is not that intellectuals in the State Department and the White House and strategists in the Pentagon do not have emotions and sentiments; they do not take them into account in making decisions. The killings in East Bengal are not likely, therefore, to weigh as much in the thinking of the U.S.policymakers as they do on the minds of Bengalis. If a Bengali reader is shocked by this statement and angrily point out the U.S. contradiction in harping on the theme of "bloodbath" in Vietnam and official ignorance of the same in East Bengal, he is confusing the rhetoric of foreign policy with its reality, superficiality with substance. The United States is a Big Power and like all Big Powers. It controls its tear ducts like a ham actor and tells fairy tales like a governess. As Richard Barnet. author of Intervention and Revolution, pointed out, the U.S. policymakers are highly selective in the voilence they anbout them.

"On November 23. 1946. for example." Barnet wrote. "at the very moment when the State Department was preparring a major U.S. intervention against Greek 'terrorists', a French naval squadron turned its guns on the civilian population of Haiphong and killed more than six thousand in an afternoon. The United States did not protest much less intervene. Violence on behalf of the established order is judged by one set of criteria. insurgent violence by another. When established institutions kill through their police or their armies, it is regrettable but by hypothesis, necessary. When the weak rise up and kill, their violence threatens order every where. Sympathetic as U.S. bureaucrats were with the objectives of the Hungarian freedom fighters in 1956, they breathed a sigh of relief when they were disarmed."

The State Department's position on the military aid to Pakistan shows once more what Barnet has so forcefully point and what any dispassionate observer of the U.S. foreign policy must have known. Bengalis are not however, dispassionate of the issue of East Bengal and continue to equate righteousness with the impulse for success. What they forget violence can be successful when used by the unscrupulous. Hitler had succeeded with his reign of terror in Europe and although the movies and magazines later made folklores out of the partisan struggle in Europe, the fact remains that the underground movement by itself could not topple Hitler. A massive invasion army organized from abroad defeated him.

The U.S. Government which has used violence throughout history may have overestimated its value in Vietnam: but certainly it knows its use better than the greenhorn fighters for Bangaldesh who died heroically but uselessly. The latter's fault was understimating the power of organized violence and terrorism.

The State Department's position on the military aid to Pakistan reveals its philosophy of realpolitik. It shows that the U.S. policy is not to change simply because thousands of people were killed in East Bengal. In his recently published book. Promises to Keep Chester Bowles has confessed that after eight years of effort as Ambassador the India he has encountered no success in persuading the State Department to revise the U.S. policy in South Asia. Yahya and the ruling clique in Pakistan know this: the freedom fighters for Bangladesh do not. That is why Pakistan has always gotten away with murder—in its conflicts with India and now in its genocidal policy in East Bengal.

It appears that Pakistan may pull it off again—over the dead bodies of thousands in East Bengal and aided by the opportunistic policies of Big powers. including the United States which may deplore the use of violence privately but knows its efficacy in international affairs. After all, as I.F. stone Bengal are "fully as cruel as those we have been using in Vietnam."

China And Pakistan

T. Karki Hussain

As of today, evidence has piled up to suggest equally (a) that China is determined to support the West Pakistani regime wholeheartedly against the nationalists fighting for statehood in Bangladesh: and (b)

that China has kept her options open and that it is quite possible that her present stance of Bangladesh may shift radically according to the direction the Bangladesh struggle takes. If the first proposition is acceptable then theology would no more play an important role in China's foreign policy decisions. If the second is taken as correct, then ideology still remains a dominant factor in her policy-making. Perhaps it would be more correct to suggest that there is an element of truth in both these propositions. To say this we have to examine also the factors—historically, ideologically and diplomatically identifiable—which in their totality determine the Chinese view of the Bangladesh struggle.

These factors can be categorised as follows;

(1) Chinese policy on nationalities from the point of view of her own national experience :

(2) Chinese view of the struggle for self-determination in other countries (Biafra and Kashmir as case studies) :

(3) Chinese understanding of internal developments in Pakistan and the class character of the Awami League movement in East Pakistan : and

(4) China's immediate diplomatic stakes in the subcontinent.

China's stand on nationalities differed radically from that of Soviet Russia. On the other hand the thinking on struggles for self-determination underlined China's commitment to certain ideological objectives. The immediacy of China's diplomatic aims and the ideological line, as we shall attempt to show, seems to have brought about a compromise in her present stance on Bangladesh.

Whatever might have been the Soviet practice, there is along tradition in the history of the Soviet communist movement to theoretically define the right of self determination of nationalities. The official line as advanced by Stalin defined a nation as a "historically evolved stable community of language, territory, economic life and psychological make-up, manifested in a community of culture". Interpreting the nation thus, Stalin proclaimed its right of self-determination. "It has the right to arrange its life on the basis of autonomy. It has the right to enter into federal relations with other nations. Nations are sovereign, and all nations are equal". (Stalin, Marxism and the national and Colonial Question PP. 8 & 19). Lenin had later realised the differences in the theoretical approach to the question on nationalities and its practice in the Soviet Union. In his last days he was

very much worried about Great Russian chauvinism which he warned should be suppressed so that the "weaker" nationalities need not exchange class exploitation for exploitation by the Great Russians. Lenin had declared war to the death on Great Russian chauvinism in a letter to the politbureau on October 6, 1922 (Louis Fischer, Life of Lenin N.Y. 1964. P. 610)

In the soviet constitution also, the principle of self-determination was consecrated in the provision that the various republics retained the right to secede from the Soviet Republic. Altough Soviet practice has universally contradicted this principle, the fact must nevertheless be self-determination has been accorded a very important place.

In Contrast, the Chinese people's Republic does not concede the right of secession even in theory. Mao considers the national minority problem as class problem and class struggle is the main theme of the Chinese communist policy on national minorities. By 1962, the Chinese leadership was asserting the fact that there are no contradictions between nationalities but only between chinese leadership was asserting the fact that there are no contradictions between nationalities but only between classes. (Mosley. China Quarterly. No. 24, October-December 1965, p. 16). Elucidating the point further, Liu Chiun, Member, Nationalities committee. Third Nationalities Committee. "Third National People's Congress argued in 1964 "the unreformed national and religious upper strata elements of the national minorities.....would try to incite national contradictions in order to protect or rehabilitate their class interests. A bourgeoisie still exists in some of the national minorities, and the bourgeoisie and the ideological influence of the bourgeoisie are the root source that gives rise to nationalism. It is quite clear that the nationality question in our country at present is still essentially a class question and its root cause is still class, class contradictions, class struggle and the struggle between the two roads". ("The current nationality question and class struggle in our country". Hung Ch'I. No. 12. June 30. 1964, translation in Selections from China Mainland Magazines, No-428, August 4, 1964, p.14).

The most immediate and practical in 1956 which was conceded by the Chinese to have been based on class struggle—a counter-revolutionary movement engineered by a handful of upper strata feudal reactionaries against the Tibetan people.

The class view ot the Tibetan revolt was merged with the Chinese fear that china's territorial integrity was being interfered with by

outside powers, including India. It would be seen that since 1949 China's main aim has been to bring border areas under centralised control as a step to defend and strengthen her territorial integrity. This process, however, has to be justified in terms of class struggle just as the Soviets in practice also suppressed the nationalities in Central Asia during the Stalin period. Thus as far as china's internal experience with the nationalities is continued, political consolidation and territorial security have been the primary motivs with ideology coming as a weak cover.

The Chinese attitude to self-determination could be best illustrated from the stand China has taken of Kashmir and Biafra. Notwithstanding her close diplomatic relation with the military regime in Islamabad, China has not changed her basic understanding on Kashmir i.e. she supports the just struggle of the Kashmiri people for self-determination. Although this stand has been interpreted as a product of China's anti-Indian stand, it should be noted that it does not support Pakistan's official policy either. The Chinese view of self-determination of the Kashmir people provides them with the option of either (1) keeping their independence or autonomy from both India or Pakistan or (2) choosing India or Pakistan. As to what means should be followed to obtain the views of the Kashmiri people on either of these choices, China has said that the pledge given to the Kashmiris should be honored by India and Pakistan.

On Biafra which represented the secessionist movement of the Ibo minorities of Nigeria, the Chinese stand was a more committed one in terms of material support in the form of small arms through other African countries. But whereas some African States (Tanzania, Zambia, Ivory Coast and Gabon) and France recognised Biafra, China did not extend diplomatic recognition to it. This might indicate that the Chinese were watching the developments in the Nigerian civil war. At the same time China's pro-Biafra attitude was motivated by the fact that the superpowers were trying to divide the African continent into their respective spheres. The Chinese stand therefore resembled that of France which was also aiming at curbing the growing influence of the big powers. It, however, differed from France because of ideological inhibitions as to whether the movement in Biafra was engineered by bourgeois class interests.

Paradoxically, the Chinese stand on Kashmir reflects adherences to the Soviet ideology of self-determination without a Chinese commit-

ment to support the Kashmiris materially. On the Biafra issue, on the other hand, the Chinese stand had no such ideological basis giving it at the same time the leverage to the extent of materially supporting the Biafrans.

What is the Chinese understanding of the situation in East Bengal? First of all, the question arises as to how the Chinese identify the character of the Bangladesh movement? What direction is the movement taking? On these questions, it is as yet too early to define the Chinese responses. It is clear that China would not be deterred by the pervasive apprehension of escalation of the struggle as India would be. Instability in East Bengal and a protracted struggle would hurt the interests of the power-elite in India rather than that of China. The reason are not far to seek. For, if the struggle escalates, it may have seriours repercussions on West Bengal which at the moment is the most troubled area of the Indian Union. Since there is already an extreme left movement in West Bengal, the spread of instability across the borders might further help these elements. In such a situation, the Chinese might interpret the developments in ideological terms.

It could be asked why China does not help escalate the situation in Bangladesh from the point of view of supporting it. This can be only answered on the basis of what has been already discussed about the Chinese understanding of the nationality question. China cannot express sympathy with the Awami League movement because it is a bourgeois-dominated movement. Secondly, since the Awami League leaders have close contact with India, the Chinese would naturally not be sympathetic at the moment. For, any success of the Bangladesh struggle under Awami League leadership may only mean a gain for India. There could be a third consideration as well. It is because India stresses the democratic aspect of the movement in Bangladesh that China might also consider that such a movement goes against her revolutionary concepts. Unlike the Soviet Union, China has not considered parliamentary democracy as a step in the direction of socialist development. A successful democratic struggle in Bangladesh may then in China's view become an obstacle to a revolutionary class struggle. Hence, China's non-support to the present struggle led by the Awami League may as well mean support to a left oriented movement at an opportune time.

The diplomatic stakes can be measured in terms of (1) Chinese suspicion of Soviet expansionist schemes in South Asia where India

is a complementary factor; (2) Chinese support to the Pakistan regime originates from their assessment of the sixties about India playing a hostile role against their interests. In other words support to Pakistan has been governed by the well-known principle "the enemy of your enemy is your best friend." (3) Whatever may be the character of the military regime in Pakistan, the Chinese think that a revolutionary movement is most likely to succeed in Pakistan because parliamentary democracy has not yet become the main instrument of the bourgeoisie to consolidate its position in Pakistan. It is the immediate future therefore China would like to keep the posture of verbal support to Pakistan and threat to India of possible measures she would take in case India intervened in East Bengal. This is also a legalistic stand in so far as international standards on secessionist movements are concerned. The world order did not come in support of Biafra because it considered that the movement would lead to the disintegration of a sovereign independent State, the single important constituent that makes the world society. The minimum posture helps her second objective, that of keeping Pakistan as a viable unit to oppose the joint schemes that the Soviet Union and India might impose in South Asia. In other words, the status quo in South Asia helps China's revolutionary stance, whereas the posture of the Soviet Union and possible India if she is to succeed would have to consider a radical change in the status quo. That is to say, the present non-committal attitude of China (which includes traditional, moral and some material support to Pakistan) leave room for escalation of the Bangladesh movement into a class struggle involving India and Pakistan. In order to prevent this situation, India has to see the immediate success of the Bangladesh struggle under Awami League leadership.

It is possible that because Pakistan played an intermediary role in the current trend towards a Sino-American detente, China would not like to see any widespread disruption leading to a collapse of the regime in Rawalpindi.

On Bangladesh China has shown that a minimum posture can bring maximum benefit in terms of the present. As to the future, the doors are side open. It is up to Peking to interpret the developing situation in Bangladesh either in terms of ideology or realpolitik.

Frontier, 11.9.1971

২০০২

একটি প্রশ্ন এখন অনেকেই করে থাকেন, মুক্তিযুদ্ধের কি খুব একটা দরকার ছিল? তার পরের প্রশ্ন, যদি হয়েই থাকে তো হয়েছিল, তা নিয়ে এখন আর এত মাতামাতি কেন? এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন তাদের পরের প্রশ্নটি আঁচ করে নিতে তেমন কষ্ট হয় না। পরের প্রশ্নের ধরনটা হয় এরকম, এতদিন পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ করা কি ঠিক? এতে তো দেশের মানুষই বিভক্ত হয়ে যায়। এতে দেশেরই ক্ষতি।

এসব প্রশ্নের উত্তর অনেকভাবেই দেয়া যায়। তবে, একটা সোজা উত্তর হয়ত হতে পারে, ১৯৭১ সালেও অনেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তাদের উত্তরসূরীদের এখনও বাংলাদেশের পক্ষে থাকার কোনও কারণ নেই। বাংলাদেশে থাকতে হয় বলে তারা আছেন। অথবা, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তা ব্যবহার করছেন। ক্ষমতা থাকলে, তারা আজ পাকিস্তানের ফ্রেমে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না।

মুক্তিযুদ্ধের এই যে অবমূল্যায়নের চেষ্টা চলছে গত ত্রিশবছর। তার জন্য আমরাও কি কমবেশী দায়ী নই? আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন ছিল মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে যখন বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে তখন আমরা কেন প্রতিরোধ করিনি? আমাদের সাথী যারা ছিলেন ১৯৭১ সালে তারাই কি এই অবমূল্যায়ন প্রতিযোগিতায় যোগ দেননি নিজ স্বার্থে? সামান্য সুবিধার জন্য কি তারা সত্য বিসর্জন দেননি বা অন্য কথায় আত্মা বিক্রি করে দেননি? কিন্তু আমরা তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিনি, ভৎর্সনাও করিনি। গোকুলে তারা বেড়েছে।

এই প্রতিরোধটি যে যার ক্ষেত্র থেকেই গড়ে তুলতে পারতেন। আমি যুক্ত লেখালেখির সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই, এ প্রতিরোধে লেখকরা ছিলেন সজীব এবং সক্রিয়। মুক্তিযুদ্ধের বোধ বা অনুভবকে যে কারণে বিনাশ করতে পারেনি শত্রুপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি বাঁচিয়ে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।

গত তিন দশকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কোনোটিই ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, একটা ধোয়াশা সৃষ্টি করা হয়েছে এ বলে যে, বিষয়টি বিতর্কিত এবং বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলের কোনো এক পক্ষ হয়ে লিখতে হবে। অন্যদিকে অ্যাকাডেমিশিয়ানদের এ বিষয়ে অনাগ্রহ দেখার মতো। দেশের সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ আছে, কলেজে আছে কিন্তু খুব কম শিক্ষক এসব উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। আজ বত্রিশ বছর পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় অভিলেখাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র কেউই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ/গ্রন্থপঞ্জি বা বিস্তারিত কোনো বিবরণ বা বই বের বা প্রকাশ করেনি। এটি শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। আমাদের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মুক্তিযুদ্ধ বা সামগ্রিকভাবে দেশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী, তারও খানিকটা বিচার করা যাবে এ

পরিপ্রেক্ষিতে। এটি প্রধান ঝোঁক। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। প্রায় এক দশক আগে, আমার সহকর্মী আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রকাশ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি। 'একাত্তরের যাত্রী' নামে একটি সংগঠনও ঐ সময় এ ধরনের একটি পঞ্জি প্রকাশ করেছিল। সামগ্রিক/আঞ্চলিক বা মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো বিষয় নিয়ে লেখার আগে, যিনি লিখবেন তার জন্য এ ধরনের পঞ্জি প্রয়োজনীয়।

'পঞ্জি' না হোক মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গত তিন দশকে বেশ বই পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এর একটা অংশ চর্বিতচর্বন। অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। স্মৃতিচারণ। বিশ্লেষণাত্মক রচনার সংখ্যা কম। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যেসব বইপত্র আমার নজরে পড়েছে, সেগুলিকে আলোচনার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। অবশ্য, বলে রাখা ভালো যে, এ বিভাগ খুব একটা বিজ্ঞানসম্মত কিছু নয়। এ বিভাজন করা যেতে পারে এভাবে-১, মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন, ২. অবরুদ্ধ দেশ, ৩. প্রবাসী সরকার, সংগঠন, ৪. রণাঙ্গন, ৫. স্মৃতি কাহিনী এবং ৬. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ। এ বিভাজন নির্দিষ্ট, ফ্রেমবদ্ধ কোনো বিভাজন নয়। কারণ, রণাঙ্গন সম্পর্কিত গ্রন্থেও বর্ণনা আছে প্রবাসী সরকারের, আবার অবরুদ্ধ দেশ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় উল্লিখিত হয়েছে রণাঙ্গন সম্পর্কিত আলোচনা। তাই গত তিন দশকে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কিত রচনাবলীর একটি গ্রন্থপঞ্জি তৈরি জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদানের একটা বড় অংশ ছড়িয়ে আছে পত্র-পত্রিকায়। এ দেশের লেখকদের, লেখা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম সংবাদপত্র। গত ত্রিশবছরের স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা ঘাটলে আমরা বিপুল উপাদানের সম্মুখীন হবো। এ সব পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ/ঘটনার বিবরণ, স্মৃতি কাহিনী প্রভৃতি। এ বিষয়ে কোনো পঞ্জি কখনও প্রকাশিত হয়নি। কী ধরনের উপাদান আছে পত্র-পত্রিকায় তা দেখার কৌতূহল থেকেই বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকা উল্টে পাল্টে দেখেছি। পত্রিকাগুলি দেখে আমার মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সামগ্রিকতা ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ইতিহাস লিখতে গেলেও এ উপাদানসমূহ কাজে লাগতে পারে এবং এর অধিকাংশ এখনও অব্যবহৃত। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৬খণ্ডে আমরা প্রকাশ করেছি *মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি*। সময়কাল ১৯৭১-৭৫। কী আছে ঐ সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলিতে?

দুই

এই পঞ্জির পত্রপত্রিকার সময়কাল ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫। ১৯৭১ এর পুরো সময়টি নয়। ১৯৭১ এর বিজয় দিবস থেকে প্রধানত শুরু। ১৯৭৫ এ শেষ। এ সময়টুকু বেছে নেয়ার কারণ আছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়ে কোনো অবান্তর প্রশ্ন করার সাহস কারো হয়নি। ঐ সময়ের স্মৃতি ছিল প্রখর, রং চড়াবার অবকাশ ছিল কম, আবেগের ভাগটি ছিল অবশ্য বেশি। ঐ সময় যখন কেউ আবেগের কথা বর্ণনা করেছেন বা যুদ্ধের, বা তুলে ধরেছেন গণহত্যা বা বধ্যভূমির চিত্র তাতে অতি অতিরঞ্জন, বিকৃতি, উপেক্ষা কিছুই স্থান পায়নি। সুতরাং, উপাদান হিসেবে এসব প্রতিবেদন/রচনার গুরুত্ব অনেক বেশি।

১৯৭৫ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রতি বছরই মার্চ এবং ডিসেম্বরে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উপাদান হিসেবে এগুলির মূল্যও কম নয়। কিন্তু, এসব রচনা বা উপাদান ব্যবহারের আগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, লেখকের মনোভঙ্গি জানতে হবে এবং তারপর এর যথার্থতা বিচার করতে হবে। যেমন, জামায়াতের নেতা বা তাদের প্রকাশনা/পত্রিকায় তো এখন বলা হচ্ছে ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বরে ঘটনা বা বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি আওয়ামী লীগেরই কীর্তি। বিএনপির প্রতি যাদের ঝোঁক, তাদের অনেকের লেখায় দেখা যচ্ছে ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে তারা স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান শুনেছিলেন। এর আগে, কখনও তা শোনেন নি।

এই পঞ্জি রচনার জন্য আমরা পাঁচটি পত্রিকা বেছে নিয়েছি সেগুলি হলো *দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান (বাংলা) দৈনিক বাংলার বাণী* এবং *দৈনিক পূর্বদেশ*।

প্রথম তিনটি পত্রিকাই এ অঞ্চলের পুরনো পত্রিকা। অপেক্ষাকৃত নতুন দৈনিক ছিল *দৈনিক পাকিস্তান*, দৈনিক বাংলা যা প্রতিনিধিত্ব করতো সে সময়ের তরুণ বা 'আধুনিক'দের। সে তুলনায় পূর্বদেশ বা দৈনিক *বাংলার বাণী* ছিল একেবারে নতুন। এভাবে, বিভিন্ন মনোভঙ্গি পত্রিকার উপাদান তুলে ধরতে চেয়েছি। *আজাদ* মূলত মুসলিম লীগের পত্রিকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, প্রগতিবাদী অনেকে তখন কর্মরত ছিলেন *আজাদে*। সংবাদও ছিল মুসলিম লীগের কিন্তু, তখনও কেউ, এবং এ পর্যন্ত সংবাদকে প্রগতি বিরুদ্ধ কাগজ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেনি। *ইত্তেফাক* ছিল আওয়ামী লীগ ঘেঁষা এবং ১৯৬৬ থেকে এ পত্রিকায়ই স্বাদেশিকতার বাণী সবচেয়ে বেশি তুলে ধরা হয়েছে। *দৈনিক বাংলা* ছিল সরকারি পত্রিকা তবে এর সাংবাদিকরা ছিলেন বাংলাদেশের তরুণ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রগতিবাদী যদিও চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অনেক বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হতো। *পূর্বদেশ* ছিল স্বাধীনতা বিরোধী হামিদুল হক চৌধুরীর এবং এর কয়েকজন কর্মচারী বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে ছিল জড়িত। *বাংলার বাণীর* মালিক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, আওয়ামী লীগের তরুণ তুর্কি।

স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবে এসব পত্র-পত্রিকা কাঁধের পুরনো বোঝা ফেলে দিয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের অনুভবকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে *দৈনিক বাংলা* অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

এখানে পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি-

দৈনিক আজাদ কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। মওলানা আকরাম খাঁ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক ছিলেন নূরুল আনাম খান। ১৯৭৪ এর পর আজাদ স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়।

পূর্বদেশ প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক হিসেবে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হতে থাকে দৈনিক হিসেবে সম্পাদক ছিলেন মাহবুবুল হক।

সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে। পরে এর মালিক ও সম্পাদক হন আহমেদুল কবির। জহুর হোসেন চৌধুরী দীর্ঘদিন এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখক-কবি-সাংবাদিক তাদের কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন

সংবাদে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সংবাদ-এ কামান দেগে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এতে মারা যান সাহিত্যিক শহীদ সাবের।

আবুল কালাম শামসুদ্দিনের সম্পাদনায় *দৈনিক পাকিস্তান* প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এটি ছিল প্রেস ট্রাস্ট অব পাকিস্তানের পত্রিকা। স্বাধীনতার পর পত্রিকার নাম বদল করে রাখা হয় দৈনিক বাংলা। তখন এর সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠা করলেও, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এর মালিকানা লাভ করেন ও সম্পাদক হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী পত্রিকাটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর মইনুল হোসেনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হতে থাকে।

সাপ্তাহিকী হিসেবে *বাংলার বাণী*-র প্রকাশ শুরু হলেও ১৯৭২ সালে তা দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। ১৯৭৫ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য আবার তা পুনঃ প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমানে উল্লিখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে *দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ* এর প্রকাশনাই অব্যাহত আছে।

এ সব পত্রিকাকে পঞ্জির জন্য বেছে নেয়ার আরেকটি কারণ আছে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। কোনো পত্র-পত্রিকার সম্পূর্ণ ফাইল কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ পত্রিকাই সংরক্ষিত হয়নি। আমাদের ভাগ্য ভালো উল্লিখিত পত্রিকাগুলির ১৯৭১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ফাইল আমরা পেয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যা পাইনি, তবে তাতে খুব একটা সমস্যা হয়নি।

পাঠক-গবেষকদের সুবিধার জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট/প্রতিবেদন সমূহ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন কালরাত্রি, খানসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞ, বর্বরতা, গণহত্যা, দালাল, আলবদর ও যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার-বিচার, নির্যাতিতা নারী, বধ্যভূমি, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা, রণাঙ্গন, রাজাকার, ২৬ মার্চ, যুদ্ধ ঘোষণা, মিত্রবাহিনী, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও বিচার, ১৬ ডিসেম্বর, স্বীকৃতি, অস্ত্র সমর্পণ ও বুদ্ধিজীবী। তবে, এগুলি সুনির্দিষ্ট আটোসাটো কোন বিভাগ নয়। যেমন, কালরাত্রি ও ২৬ ডিসেম্বর—দুটি আলাদা ভাগ হলেও এমন অনেক প্রতিবেদন আছে যা দু'ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য।

তিন

'কালরাত্রি' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে সবচেয়ে কম প্রতিবেদন। এর একটি কারণ, প্রতি বছর ২৫ মার্চ স্মরণে সব পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো যাতে ঐ রাত্রির বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। এ ধরনের কয়েকটি প্রতিবেদনে রমনার কালিবাড়ি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ আছে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালেও তেমন লেখালেখি হয়নি। ২০০০ সালে রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ গণতদন্ত কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের একটি রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছিল।

সে বিষয়ে এ রিপোর্টে বিস্তারিত প্রতিবেদন আছে। এ শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিবেদন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ২৫ মার্চের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "২৫শে মার্চ দিনটি হবে সংকটজনক।"

'খান সেনাদের ধ্বংসযজ্ঞ/বর্বরতা' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে ১৯৭২ সালে। এ প্রতিবেদনগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িকতার কারণে। মানুষ তখনও পাক হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীদের অত্যাচার সম্পর্কে ভুলে যায়নি। ফলে, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি বিশ্বাসযোগ্য যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আবেগাক্রান্ত এবং তা ছিল স্বাভাবিক। ঐ সময় যারা পেরিয়ে আসেনি তাদের পক্ষে এ আবেগ অনুধাবন করা কষ্টকর। অনেক প্রতিবেদনে আঞ্চলিকভাবে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে যার বিবরণ এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিস্মৃতির অতলে তা তলিয়ে গেছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জানতে পারি বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা—

নোয়াখালী ৭১ হাজার	নরসিংদী ৯০%
নওগাঁ ৫০ হাজার	শান্তাহার ৫ হাজার
জামালপুর ৭৫ হাজার	টাঙ্গাইল ২১৩৪৮ হাজার
বগুড়া ৮০ হাজার	

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িটিও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আনরডের (জাতিসংঘ) হিসেবে ছয় হাজার গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাবটি দেখা যাক—

কুমিল্লা ১৪৬০	নওগাঁ ৩০ হাজার
সাতক্ষীরা ৭৫%	সিরাজগঞ্জ ৮০%

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক স্কুল সমূহের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ লাখ। মোট ৩৪৫৭টি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছিল যার ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩৫ কোটি।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাই তাহলো—

বিআইডিসি ১০ কোটি	ডিআইটি ২ লাখ
শিল্প প্রতিষ্ঠান ১৫০ টি	ইমারত বিভাগ ৩ কোটি

খুলনার সব কয়টি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান
এছাড়াও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ—

[আনরডের মতে]	গবাদি পশু ২২ লাখ
চা বাগান ১২৮	
বাস ১০০০	
সেতু ২৭৪	
কৃষিপণ্য ৩৯৪ কোটি	

বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিলো। যেমন :

রামগড় ৫ কোটি	রাজশাহী ৫ কোটি
ভৈরব শহর ১০০ কোটি	জামালপুর ১২ কোটি
ভৈরব বন্দর ৩০০ কোটি	চালনা বন্দর ১.৫০ কোটি

আনরডের হিসাব মতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯৩০ কোটি। ৪ লাখ শিশু সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল কুমিল্লার ৪০ হাজার জেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যখন বলা হয় ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন, আজকাল অনেক বাঙালিই তা মানতে চান না। এ বিষয়েও বিতর্কে মেতে ওঠেন। 'গণহত্যা' শিরোনামে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাই। অধিকাংশ প্রতিবেদনই ছিল ১৯৭২ সালের। আঞ্চলিকভাবে আমরা সামান্য যে হিসাব পাই তাতেই বিস্মিত হতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ

[অঞ্চল ভিত্তিক নিহতদের হিসাব]

দিনাজপুর ৭৫,০০০	কুষ্টিয়া ৪০,০০০
চাঁদপুর ১০,০০০	নওগাঁ ২০,০০০
বরিশাল শহর ২৫,০০০	কুমিল্লা ২০,০০০
ঝালকাঠি ১০,০০০	নড়াইল ১০,০০০
রংপুর ৬০,০০০	বগুড়া শহর ২৫,০০০
আখাউড়া ২০,০০০	জামালপুর ১০,০০০
ঠাকুরগাঁ ৩০,০০০	চৌদ্দগ্রাম থানা ১,০০০
চট্টগ্রাম ১ লাখের ওপর	স্বরূপকাঠি ও বানরীপাড়া ৫০০০
সেতাবগঞ্জ ৭০০০	মানিকগঞ্জ ১০০০
পার্বতীপুর ১০,০০০	নরসিংদী ১০১৯
সৈয়দপুর ১০,০০০	হাজিগঞ্জ ৩০,০০০
কুড়িগ্রাম ১০,০০০	

এছাড়া হরিরামপুরে একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল ১০,০০০ নরমুণ্ড। কুমিল্লায় ১১ দিনে উদ্ধার করা হয়েছিল ৫০০, জয়পুরহাটে একদিনে ৫০০-এর বেশি, দিনাজপুরের দু'টি গ্রামে ৩৭০০০, শেরপুর জেটিতে ২০০০। যারা খবর আনা নেওয়া করতেন বা কুরিয়ার হিসেবে কাজ করতেন সে রকম ১৫০ জন গিয়েছিলেন বাঘের পেটে। স্বাধীনতার পর হানাদার বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন ৯৬ জন। আরো জানা যায় নিয়াজী মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে হত্যা করা হয়েছিল ১৫ লাখ মানুষকে।

গণহত্যা বা যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি আজকের নয়। সেই ১৯৭২ সাল থেকে এই দাবি তোলা হয়েছিল এবং তৎকালীন সরকারও এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবং আন্তর্জাতিকভাবেও দাবী উঠেছিল গণহত্যার বিচারের। এ সম্পর্কিত কয়েকটি বিবরণ—

১. ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক জুরি সম্মেলন রায় দিয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া উচিত (দৈ. ই. ৭.৯.১৯৭২)
২. মুসলিম দেশগুলির প্রতি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহবান জানিয়েছিলেন "ইসলামের নামে গণহত্যা দেখিয়া যান" (দৈ. ই. ২৬২.১৯৭২)
৩. সরকার গঠন করে গণহত্যা তদন্ত কমিশন, ৫.৪.১৯৭২
৪. ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেছিলেন, গণহত্যার বিচার বাংলাদেশেই হবে।

'দালাল, আলবদর, যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচার' শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত প্রতিবেদনগুলি বর্তমান প্রজন্মের অনেক-কে আগ্রহান্বিত ও বিস্মিত করতে পারে। গত দু'দশকে এক ধরনের প্রচারণা চালানো হয়েছিল যার মূল কথা হলো দালাল, আলবদরদের গ্রেফতারে তৎকালীন সরকার শৈথিল্য প্রকাশ করেছে, তারা এখন এক ধরনের রাজনীতি করছে এবং এখনও আলোচিত তাই সে সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করছি বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গটি।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালেই বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার দাবি করা হয়েছে। উল্লিখিত পত্রিকাগুলির পাতা ওল্টালেই এ বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। শুধু তাই নয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন যুদ্ধপরাধীদের বিচারের। কিছুই হয়নি, বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) দৈনিক বাংলা লিখেছিল—

"আল-বদরবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।"

অবশেষে বুদ্ধিজীবীরা নিজেই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আশ্বাসে কাজ শুরু করেন। কমিটির আহ্বায়ক জহির রায়হান নিজেই এরপর নিখোঁজ হয়ে যান।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে ৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরিবারের সদস্যদেরও তিনি

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেন নি।

সংকলিত সংবাদ থেকে জানতে পারি ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, তারপর এ মামলার কী হলো তা জানি না। ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আল-বদর আবদুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মওলানা' ও 'ইনকিলাবের' একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী তাঁদের রায়ের উপসংহারে বলেন—"In the circumstances, therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt.."

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট লক্ষ্য করুন—(f)

"Circumstances showing that Abdul Khaleque was a member of Jamat-e-Islami dominated the mind and Judgement of the prosecution witnesses because impression was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the Liberation. Be that as it may. this impression was responsible for influencing the inductive reasonings of the witness."

মনে হয় বিচারকরা সব স্বর্গে ছিলেন। যেখানে জামায়াতে ইসলাম চোখের সামনে এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটালো সেখানে কি ইমপ্রেসন হবে আওয়ামী লীগ দায়ী ছিল? বিচারকরা অবসর নেয়ার পর আজকাল অনেক উপদেশ দেন। বদরুল হায়দারও দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এই বিচারক প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের কাছে দোয়া মাংতে গিয়েছিলেন। একই ধরনের আর্গুমেন্টে গোলাম আযমকে নাগরিকত্বও দেয়া হয়েছে। এতে যে ন্যাচারাল জাস্টিস লংঘিত হয়েছে তা কারো মনে হয়নি। আমরা এগুলি মেনে নিয়েছি কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় শুধু উল্লেখ করতে চাই—বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটির প্রধান (নির্বাচন কমিশন) ছিলেন একজন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে এক রায়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন সংবিধানের ওপর। অথচ, পৃথিবীতে সামরিক আইন জংলি আইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সেই আইন না-মেনে ইংরেজিতে রায় লিখেছেন।

১৯৭৫-এর পর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক/দালাল নির্মূল কমিটি তারপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দাবি তোলে এবং সে-দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। তখন শেখ হাসিনাও এ-দাবি সমর্থন করেন। সে-দাবি থেকে আমরা এখনো সরি নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর আবার এ দাবি জোরদার হয়ে উঠছে। অনেকে শহীদ পরিবারের সদস্যদের বলছেন, মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী। কারণ, বিষয় দু'টি আলাদা।

বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ, 'মওলানা' আবদুল মান্নান যদি বলেন, ডা. আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেন নি তখন আজ এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করে নি। বিচারক বলতে পারেন, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়। যদিও আমরা জানি, তৎকালীন কাগজপত্রে তা উল্লিখিত হয়েছে। এধরনের বিচারের জন্য সবসময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করা হয়। তাই সরকারকেও তাই করতে হবে এবং সরকারকে বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। জীবন ধারণই তাদের জন্য কষ্টকর। বছরের পর বছর তারা মামলা লড়বেন কিভাবে? সংবিধানে কিন্তু স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

বিএনপি বলে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দল। এরশাদ বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ বলে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। সুতরাং, তিন পক্ষই তো সংসদে বিষয়টি তুলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করলে তো এমনটিই হওয়া উচিত। আর খুনের মামলা বা খুনের বিষয় কখনো তামাদি হয় না। সব রাজনৈতিক খুনের বিচার সব দল দাবি করছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়?

চার

মুক্তিযুদ্ধের সময়, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং অন্যান্য স্বাধীনতারিরোধী সংগঠন যে শুধু পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তা নয়, তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সফল যুদ্ধ শেষে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধশেষে অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ এনেছে; অনেকে শাস্তির ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এসব অভিঘাত সৃষ্টি করলো আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ওপর। সরকার অবশ্য চেয়েছে পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি, সরকার ঘোষণা করে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২।' এ

আইনে, শাস্তির মেয়াদ ছিল দু'বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। এ ধরনের আইনের প্রয়োজন ছিল, শুধু তাই নয়, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন ছিল এর যথাযথ প্রয়োগ। ২৮ মার্চ সারাদেশে দালাল বিচারের জন্য গঠন করা হলো ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু, এ আইনে একটি ফাঁক ছিল। ৭ম ধারায় বলা হয়েছিল "থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারও কথা বিশ্বাস করা হবে না। অন্য কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোনো আদালতেও মামলা দায়ের করা হবে না।"

১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই অধ্যাদেশ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ৩৭,৪৭১ জনকে। মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল ২,৮৪৮ জনের। দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল মাত্র ৭৫২ জন। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

এ সাধারণ ক্ষমা সমাজে এমন অভিঘাত হানবে যা বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দেবে, তা যদি ঐ সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতেন তাহলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাঁদের চিন্তা করতে হতো। এখন বাঙালি জাতিকে এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। শেষ মুজিব ও তাঁর সরকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তিনি বা তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এবং মানুষকে কি যাতনার মধ্যে থাকতে হয়েছে তাও তাঁরা অনুধাবন করেননি। করলে তাঁদের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হতো না। যেমনটি বলেছেন শহীদ সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার—"আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।" অন্যদিকে এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য, যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতীয় সংসদে, "সেই সময় প্রায় চার লক্ষ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নেমেছিল, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয়স্বজন অনেক কান্নাকাটি করেছেন। এই রকম একটা অবস্থায় সেই সব বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্যই এই Clememcy (ক্ষমা) দেয়া হয়েছিল।..... (মুক্তিযুদ্ধে) অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এই ধরনের যে সমস্ত কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধ অপরাধী, বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারী ধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি।"

এ বিষয়গুলিই বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকা ওল্টালে প্রায় প্রতিদিন চোখে পড়বে দালাল আলবদরদের গ্রেফতারের এবং তাদের বিচারের খবর,। দেখা যাবে বিচারে অনেককে কারাদণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হচ্ছে।

সরকারিভাবে ২৫.১২.১৯৭১ সালে জানানো হয়, [প্রতিবেদন অনুযায়ী] ২৫ মার্চের পর নির্দোষ মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের জন্য দায়ীদের বিচার করা হবে। ১৯৭২

সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ৪১ হাজার দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে, চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে ১৬ হাজারের বিরুদ্ধে, মুক্তি পেয়েছে ৫০০০ জন এবং মামলা দায়ের করা হয়েছে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে। এখানে মনে রাখা দরকার সে বিপর্যস্ত সময়ে, যেখানে ছিল বিচারক ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার অভাব, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা ও ১৬ হাজারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা সামান্য বিষয় নয়।

এর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনসমূহ থেকে জানা যায়, ১৯৭২ সাল থেকেই দালাল আইন বাতিলের আবেদন/দাবি জানানো হয়। ৫.১২.১৯৭২ সালের প্রতিবেদন অনুসারে, ভাসানী বলেছেন "দালাল আইন বাতিল না করলে আন্দোলন করব।" (দৈ. বা.) ৫.২.১৯৭৩ সালে "দালাল আইনে অভিযুক্তদের ক্ষমা করার জন্য অলি আহাদ আহ্বান জানান।" ২.১.১৯৭৩ তারিখে "দালাল আইন" অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্য ন্যাপ (মো) দাবী জানায়।

দালাল আইন সংশোধন করা হয় ১৯৭২ সালে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিতা নারীদের বিষয়টি সব সময় উপেক্ষিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে চাইলেও তাতে সফল হন নি। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত পত্রিকায় নারী নির্যাতনের বিষয়টি এসেছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর থেকে দেখি বিষয়টি সংবাদপত্রে উপেক্ষিত। বর্তমানে এ বিষয়টি আবার আলোচনায় আসছে এবং এ নিয়ে কিছু লেখালেখিও হয়েছে। সে কারণে বিষয়টির ওপরও সামান্য আলোকপাত করবো।

নির্যাতিতা নারীরা সবসময় অবমাননার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রহর তাদের কেটেছে আতঙ্কে, যারা নির্যাতিতা হয়েছে তাদের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও নির্যাতিতাদের স্থান হয় নি। ট্র্যাজেডি এখানেই। আমরা নাকি 'মা-বোনদের ইজ্জত' করি। বস্তুত এ ধরনের ভণ্ডামি আছে খুব কম সমাজেই। বঙ্গবন্ধু এদের 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করে সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, সমাজ তাদের গ্রহণ করছে না। ডাক্তর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর স্বামী আহসানউল্লাহর সংখ্যা দু'একজনের বেশি নয় যিনি প্রকাশ্যে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আছি। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন।' অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি পিতামাতাও। নীলিমা ইব্রাহিমের বইতে তার বিবরণ আছে। নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন? এ সংখ্যা কখনো নির্দিষ্ট করা যায় নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে-সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এ দেশেও। তাই আমি বাংলার বাণীতে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান মহিলার প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃতি করছি। তাঁর নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ঐ সময় সিডনি থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি নির্যাতিতা নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয়। এবং সেই হিসাবের তিনি একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন—"ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়।

সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।
অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ-কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ-কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।....
ধর্ষিত মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০ টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদারবাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদারবাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে।"
বীরাঙ্গনাদের পুর্নবাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে দু'খণ্ডে এ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে। যেমন—"আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরণে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা জাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।"
শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌল কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর নির্মূল কমিটি কয়েকজন বীরাঙ্গনাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিল সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য এবং যুদ্ধাপরাধ এ মাটিতে কী পর্যায়ে গিয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসাবে। সেই মহিলারা এতদিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর সমাজপতি ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাঁদের প্রায় পরিত্যাগ করে। খুলনায়, আমি একজন মহিলাকে পাগলিনী বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি যিনি '৭১ সালে নির্যাতিত হয়েছিলেন। খুলনার অনেকেই তা জানেন, কিন্তু কেউ তার পুনর্বাসনে এগিয়ে আসেন নি। এই হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালির আসল রূপ।
'নির্যাতিতা নারী' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রতিবেদন নির্যাতিতাদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে বা সমাজে তাদের যথাযথ সম্মান দেয়ার আবেদন। তবে, বিষয়টি যে সমাজ

গ্রহণ করেনি তার সাক্ষ্যও পেয়ে যাই ২৬.১১.১৯৭২ সালের এক প্রতিবেদনে যেখানে জানানো হয়েছে ২০% বীরাঙ্গনাও সমাজে স্থান পাননি। তবে, জানা যাচ্ছে কিছু যুদ্ধ শিশুকে দত্তক নিয়েছে সুইডেন, ডেনমার্ক ও কানাডার দম্পতিরা। আরো জানা যাচ্ছে, অনেক যুবকও নির্যাতিতা নারীদের বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে আসছেন এবং বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু, আজ তিনদশক পর জানা যাচ্ছে, সমাজ তাদের যথাযথভাবে গ্রহণ করেনি।

দেশজুড়ে ১৯৭১ সালে ছিল অসংখ্য বধ্যভূমি। এখন সেগুলো কেউ স্বীকার করতে চায় না। যদি এগুলি রক্ষার দাবি তোলা হয়! কারণ, সারা দেশে জমির দাম বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছিলেন সারা দেশের বধ্যভূমিগুলি চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করার। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে বর্তমান সরকারের এটিই ছিল সবচেয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছিল এবং কমিটির কয়েকটি বৈঠকও হয়েছিল। ৬৪টি জেলার ডিসির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁদের নিজ নিজ এলাকার বধ্যভূমি সম্পর্কে।

'বধ্যভূমি' শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত প্রতিবেদনগুলিতে জানা যাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে বধ্যভূমি খুঁজে পাওয়ার খবর। এখনও পাওয়া যাচ্ছে বধ্যভূমির খবর। তবে, এখন অনেকে বধ্যভূমির খোঁজ পেলেও তার উল্লেখ করেন না। কারণ, যদি কেউ স্মৃতি সংরক্ষণ করতে চায় বা সরকার অধিগ্রহণ করতে চায়। তাছাড়া জায়গা-জমি দখলের হিড়িকে সেগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমি বিখ্যাত। স্বাধীনতার পর পর সেখানকার বিরাট বটগাছের গুড়ি দেখা গেছে কসাইর ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। অর্থাৎ এখানে বাঙালিদের কুচিকুচি করে কাটা হতো। সেই বিখ্যাত বধ্যভূমিটি কোনো সরকারই রক্ষা করেনি। এখন বোধ হয় তা দখল হয়ে গেছে।

বধ্যভূমির স্মৃতি সংরক্ষিত না হওয়ায় একাত্তরের স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো যদি সংরক্ষিত হতো তা হলে একাত্তরের সেই দিনগুলোর কথা ভোলা যেত না। আজ যাঁরা খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে আছে তারা তো আর ঐ মানুষগুলোর কথা ভাবেনি। তাদের কথা দূরে থাকুক, যাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথাও কি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বাঙালি? বাঙালির কৃতজ্ঞতা বোধের কোনো নজির ইতিহাসে নেই। যদি ঐ বোধ থাকতো তাহলে সরকারি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর না হয়ে ঢাকা শহরের সবচেয়ে দামি জায়গায় অসুন্দর সামরিক জাদুঘর হয় কিভাবে? বাঙালি খুব শীঘ্রই শিকড়হীন জাতিতে পরিণত হবে।

পাঁচ

আজ ৩৮ বছর পরেও, কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধ রয়ে গেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রে। বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি—সবকিছুর পর্যালোচনা করতে গেলে কোনো না কোনো সময় নিরিখটা হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধ। তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধে ছিল যে আশা তা এখনও অপূর্ণ, নয়ত ঘুরে ফিরে কেন নিরিখটা দাঁড়াবে মুক্তিযুদ্ধ? সে জন্যই শুরুতে বললাম–মুক্তিযুদ্ধ আছে এখনও বাংলাদেশের কেন্দ্রে।

মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে বলেন স্বাধীনতা যুদ্ধও। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও তফাৎ আছে প্রত্যয় দুটিতে। তফাৎটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ কারণে যে, শেষোক্ত শব্দটি সরকারিভাবে ব্যবহার করা শুরু হয় সামরিক শাসনামলে, গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে নয়। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির দ্যোতনা প্রাক ১৯৭১ প্রজন্মের কাছে যতটা ব্যঞ্জনাময়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ততটা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক, অর্থও। অন্যদিকে স্বাধীনতার বিষয়টি সংকীর্ণ, অর্থও। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বোঝায় (বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে) বাঙালির সার্বিক মুক্তি, সব অর্থে। এখানেই বিভক্ত হয়ে যায় জনপ্রতিনিধি আর সামরিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনীতিবিদরা যেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে উঠে এসেছেন, ছিলেন তাদের প্রতিনিধি, তাই ১৯৭১ এর সময়টুকুতেও দ্বন্দ্ব ছিল এ নিয়ে এবং এই দ্বন্দ্বের নিরসন না হওয়ায়, এ পার্থক্যেই পরবর্তীকালে দ্বিখণ্ডিত করেছে সমাজ, রাজনীতি– সব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত ও এলিট মহলে শব্দ দুটির দ্যোতনা দুরকম হতে পারে; কিন্তু একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তি, স্বাধীনতা শব্দগুলোর পার্থক্য বিশেষ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। তাদের অনেকের কাছে ১৯৭১ সাল তো গণ্ডগোলের বছরও। তার অর্থ কি এই যে, সে মুক্তি বা স্বাধীনতা চায় নি? তা নয়। তার প্রকাশভঙ্গিই এরকম। তার কাছে ১৯৭১-এ কারণে গণ্ডগোলের বছর যে; এর আগে সে অর্থাৎ বাঙালি এরকম সংঘাতে মুখোমুখি আর হয় নি। প্রকাশভঙ্গি যে রকমই হোক, তাকে যদি শব্দ তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি অর্থবহ চিহ্নিত করতে বলা হয়, তা হলে সে অবশ্যই ১৯৭১ সালকে চিহ্নিত করবে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে।

মুক্তি এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি যে হঠাৎ করে আমাদের শব্দাবলিতে চলে এসেছে তা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধও হঠাৎ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয়নি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা, নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছে সর্বতোভাবে - এ অনুভূতিই সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যে প্রত্যক্ষ সমরে অংশগ্রহণ করেছে সে মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং এ শব্দটির (যা হয়ে ওঠে একটি প্রত্যয়) অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে মানুষের বা বাঙালির মুক্তি।

'মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেদনগুলির প্রকৃতি দু'রকম। কিছু নিছক রিপোর্ট, কিছু আবেগ মিশ্রিত অনুভূতি। এ সংক্রান্ত অধিকাংশ প্রতিবেদনগুলি ১৯৭২ সালের। আজকে আমরা অনেক বিষয়ের উদ্যোক্তা হিসেবে অনেককে জানি। এ পঞ্জি দেখলে দেখবেন সেগুলি ভুল। আসলে অনেক কিছু বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশে, সরকার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলি অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিই–

১. শহীদ মিনার নির্মাণ
২. শহীদ স্মৃতি মিনার উদ্বোধন
৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের স্মৃতিফলক
৪. মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে স্মৃতিফলক
৫. জাতীয় স্মৃতি সৌধের ভিত্তিস্থাপন

৬. সাভার ও কুষ্টিয়া দু'টি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ
৭. রায়ের বাজারে স্মৃতিফলক
৮. জগন্নাথ হলে স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি।

এছাড়া দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করছেন, মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর হবে। শহীদদের হাড়, স্মৃতিচিহ্ন, রক্তমাখা পোষাক সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আরো ঘোষণা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ। মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছিল। এ জন্য ১৩ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

ঐ একই সময়ে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা হয়েছিল। [১৪.১.১৯৭২]। ১৩ জানুয়ারির প্রতিবেদনে দেখি মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের জন্য শোক দিবস ও ৩রা মার্চ বিপ্লব দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সময় নেয়া কিছু উদ্যোগ এখন আর কারো মনে নেই। পরবর্তীকালে কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল সেখানে বঙ্গবন্ধুর নাম স্মরিত হয়নি। ৩রা মার্চ বিপ্লব দিবসও হারিয়ে গেছে।

কিছু প্রতিবেদনে এমন কিছু তথ্য পাই যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্তু সেই সব তথ্য আমাদের কাছে আবার যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরে। যেমন, চার লাখ শিশু অনাথ হয়েছিল যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কয়েকশ লোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল।

'মুক্তিযোদ্ধা' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা বেশি। ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন বেরিয়েছে তারপর তা হ্রাস পেয়েছে। এ প্রতিবেদনগুলি (পঞ্জি) পর্যবেক্ষণ করলে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপর সমাজের অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব বোঝা যাবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সব বাঙালির মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আশা আকাঙ্খাও ছিল প্রবল। তারা দাবি করেছে অনেক কিছু, কিছু কিছু দাবি মেটানো হয়েছে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তবে, মুক্তিযুদ্ধের সনদ বিতরণ নিয়েই সমাজে সূক্ষ্ম বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা পরে ফাটলে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও সুযোগ সুবিধায় কারো আপত্তি ছিল না কিন্তু, যখন রাষ্ট্রে স্বীকৃত হলো মাত্র লাখ খানেক মুক্তিযোদ্ধা, বাকীরা কী? অথচ এ যুদ্ধে কিছু লোক ছাড়া সবাই যার যার সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য করেছে। আসলে উচিত ছিল রাজাকারদের তালিকা করা এবং বাকী সবাই মুক্তিযোদ্ধা এই স্বীকৃতি দেয়া। এভাবে রাষ্ট্র হীনম্মন্যতা চাপিয়ে দিয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ওপর। অন্যদিকে উপাধি প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা গেল বৈষম্য। বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি পেলেন শুধু তাঁরা যাঁরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলোতো বটেই, রাষ্ট্রে সামরিক আধিপত্যের সূচনা হলো সূক্ষ্মভাবে যা রাষ্ট্রনায়করা তখন অনুধাবন করেন নি।

১৯৭২ সালে সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও শহীদ পরিবারের সাহায্যের ব্যাপারটি গ্রহণ করেছিল। অনেক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে বিদেশ পাঠানো হয়েছিল

চিকিৎসার জন্য বিশেষ করে রাশিয়া এবং জার্মানিতে। শহীদ পরিবারবর্গকেও সাহায্যের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল অফুরন্ত ও প্রবল। বিপরীতে সামর্থ্য প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলে, সন্তুষ্ট করা যাচ্ছিল না কাউকেই। তবে, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছিল। তখন দেখা গেছে ট্রাস্ট মুনাফা করছে। চাকুরিতে ১৯৭২ সালেই মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার ঘোষণা করা হয়েছিল।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যবসাও শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়েও অনেকে সুযোগ নেয়া শুরু করেছিল। এদের বলা হতো ষোড়শ বাহিনী। এরকম কিছু প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে 'ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা' শিরোনামে। তবে, ক্রমেই দেখা গেছে, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি সংহত হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের কারণে তা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষোভ ও করুণ পরিণতি সম্পর্কিত দু'টি প্রতিবেদন এর উদাহরণ। যেমন, ১৯৭৪ সালে দেখা যাচ্ছে, জাপানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের খুলি চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। ১৯৭২ সালেই ক্ষোভে মুক্তিযোদ্ধারা বলছেন-'মুক্তিযোদ্ধাদের লইয়া তামাসা করা চলিবে না।' দুঃখের বিষয় তাই হয়েছে যার জন্য মুক্তিযোদ্ধারাও অনেকাংশে দায়ী।

'রণাঙ্গন' শিরোনামের প্রতিবেদনগুলি ভিন্ন ভাবে দেখতে হবে। এখানেই আসবে পঞ্জি/সংবাদ ব্যবহারের পদ্ধতিগত প্রশ্ন। এ সময়ের অধিকাংশ প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর। সেই সময় হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ক্ষমতায়। পত্রিকাগুলিকে তাদের সরবরাহকৃত সংবাদ ছাপতে হতো। কিন্তু সেই সময়ই পত্রিকা পড়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের অনেক কিছু জানতে পারতাম। যেমন-'অস্ত্র সজ্জিত ছয়জন দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার' বা 'ভারতীয় চর' গ্রেফতারের অর্থ হলো মুক্তিযোদ্ধা গ্রেফতার। 'দুষ্কৃতিকারীর হামলা' হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা। যেমন, 'অসামরিক এলাকায় ভারতের বিমান হামলা, আদমজী নগরে দেড়শো জন নিহত ও শতাধিক আহত।' এর অর্থ ভারতীয় বাহিনী আদমজীতে পাক-ঘাটিতে হামলা করেছিল যেখানে পাকিস্তানী সৈন্যরা নিহত ও আহত হয়েছিল। তবে, এ শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেদনগুলিতে খানিকটা অতিরঞ্জন ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'রাজাকার' অংশ। একদিক থেকে পঞ্জি ১-এর 'দালাল' এবং 'আলবদর ও যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচার'-এরই অংশ এটি। কারণ, শ্রেণীকরণ করলেও স্বাধীনতা বিরোধীদের আমরা রাজাকার নামেই ডাকতাম। এখনও তাই ডাকি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের 'দৈনিক পাকিস্তানের' সংবাদ অনুসারে "স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।" এর সদস্যরা ছিল পাকিস্তান আদর্শের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এলিট যারা অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে যায়নি। অন্যান্যের তুলনায় শান্তি কমিটির সদস্যরা ছিল বলা যেতে পারে 'নরমপন্থী'। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় বা অংশগ্রহণে তারা নিষ্ক্রিয় ছিল না অনেক ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন পেশায় বা পদে থেকে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সেই সময়, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'কোলাবরেটর' হিসেবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন।

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজাকার'- ফারসি শব্দ। 'রেজা' হলো স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দারাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছিল রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. এ. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় অনুযায়ী - "প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙ্গালি হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়ত যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়ত গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়– এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়েই গঠিত হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী। আবু সাইয়িদ তাঁর সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আজম গ্রন্থে জনৈক রাজাকারের পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছেন যেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

"This is to certify that Mr. Haroon-ur-Rashid Khan, S/o. Abdul Azim Khan. 36. Purana paltan Lane. Dacca-2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is a trained Razaker. He had been issued a Rifle No-776....with ten round ammunition for self-protection.

Sd/-illegible
IN CHARGE
RAZAKAR AND MUZAHID
JAMAT-E-ISLAM
91/92. Siddique Bazar, Dacca."

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

আবু সাইয়িদ জানাচ্ছেন, আল-বদর বাহিনী গঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়। "জামালপুর মহকুমায় আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার

মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান।..... সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।"

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের নিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমি সেই গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় মাত্র উদ্ধৃত করবো।

"মে-জুন মাস থেকে রাজাকারদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তিবাহিনী আবেদন নিবেদন **শুরু করে**। মরহুম হাফেজ্জী হুজুর, 'মওলানা' সিদ্দিক আহমদ, 'মওলানা আজিজুর রহমান নেসারাবাদী প্রমুখ এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে থাকেন। সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আনসারদের রাজাকারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জুন মাসে **'পূর্ব** পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১' জারি করে। এ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে গঠিত আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করা এবং সে বাহিনীর সম্পত্তি, মূলধন ও দায় এবং রেকর্ডপত্র রাজাকার বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। আনসার বাহিনীতে তখন পর্যন্ত থেকে যাওয়া এ্যাডজুট্যান্টদের রাজাকার এ্যাডজুট্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সে আরও বলা হয়, প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করা **হবে** তাদের ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে এবং নির্ধারিত ক্ষমতাবলে রাজাকাররা তাদের দায়িত্ব পালন করবে। আনসার বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনী গঠনের অন্যতম মূল উদ্দেশ ছিল আনসারে ভর্তি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যে সমস্ত কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা ছিল তা দূর করা, যাতে **যে কেউ** রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে পারে। **এর** ফলে অতি দ্রুত সারাদেশের **স্থানীয়** গুণ্ডা, টাউট ও **মাদ্রাসা** ছাত্ররা **এর** অন্তর্ভূক্ত **হয়**। এই অবস্থায় পূর্বতন এ্যাডজুট্যান্টদের ওপর এই বাহিনীর **দায়িত্ব দিয়ে** রাখতে শান্তি কমিটি হয়। ফলে পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর **ছাত্রফ্রন্ট ইসলামী ছাত্রসংঘের** জেলা নেতৃবৃন্দকে স্ব-স্ব **জেলার** রাজাকার বাহিনী **প্রধান করা হয়। ছাত্রসংঘ** নেতা মোহাম্মদ ইউনুসকে রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। রাজাকার বাহিনীর নেতৃবৃন্দ **শান্তি** কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করত এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করত। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ১৪ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির সভার উল্লেখ **করা যেতে পারে। ২১ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে** প্রকাশিত এই সভার খবরে বলা হয়, **'১৪ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির সভা** অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শান্তি কমিটির **আহ্বায়ক মাহমুদুন্নবী** চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পাকিস্তান জমিয়তে **তালাবায়ে আরাবিয়ার** চট্টগ্রাম **শাখার** সভাপতি **হাফেজ মকবুল আহমেদ,** প্রাক্তন

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, শহর ইসলামী ছাত্রসংঘ সভাপতি ও জেলার রাজাকার বাহিনী প্রধান মীর কাসেম আলী প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য মাঠগুলোকে রাজাকারদের প্রধান প্রশিক্ষণস্থল করা হয়। পিপিপি নেতাদের রাজাকার সমালোচনার প্রতিবাদে জামায়াতী নেতাদের ২৮ নভেম্বর তারিখে বক্তব্য থেকে জানা যায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যন্ত জুনিয়র নেতৃত্ব ছিল রাজাকারদের নিজেদের, এর ওপরের নেতারা ছিল ছাত্রসংঘ কর্মীবৃন্দ। এরা একই সাথে ছিল রাজাকার এবং আল-বদর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এদের ট্রেনিং দেওয়া হত। ঢাকায় এই উচ্চপদস্থ রাজাকারদের ট্রেনিং মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন মাঠ এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আল-বদর হেডকোয়ার্টারের মাঠে অনুষ্ঠিত হত।

আগস্টের শুরুর দিকে রাজাকার বাহিনী মোটামুটিভাবে একটি আধাসামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এসময় এদের সাংগঠনিক পরিচয় দিতে ১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবসে' শান্তি কমিটির মিছিলের আগে আগে কুচকাওয়াজকারী রাজাকার দলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৫ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তানে এই মিছিলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, 'মিছিলে কয়েকশত পুরো ইউনিফর্ম, বাহুতে ব্যাজ, মাথায় সবুজ টুপিধারী সশস্ত্র রাজাকার দৃপ্ত পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায়।'

রাজাকার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য আবুল কাসেম বলেন, 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রে সজ্জিত রাজাকারের সংখ্যা এখন ৫৫ হাজার। রাজাকারদের সংখ্যা ১ লক্ষে বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে পর্যাপ্ত রাজাকার মোতায়েন করা হবে, এছাড়া পুলিশ বাহিনীতো থাকবেই।

রাজাকার বাহিনীও এসময় সাংগঠনিক ভাবে এত শক্তিশালী হয় যে ২৩ নভেম্বর রাজাকার ডিরেকটরেটের এক হ্যান্ড আউটে রাজাকারদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে মুজাহিদদের সমান করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয় নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকাররা সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের মতো ফ্রি রেশন পাবে। ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকারদের বেতনের হার নির্ধারণ করা হয় কোম্পানি কম্যান্ডার রেশনসহ ৩০০ টাকা ও রেশন ছাড়া ৩৫৫ টাকা; প্লাটুন কম্যান্ডার রেশনসহ ১৩৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৮০ টাকা; সাধারণ রাজাকার রেশনসহ ৫৭ টাকা ও রেশন ছাড়া ১২০ টাকা। সে সময়কার দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী এই উচ্চ বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বিপুল সংখ্যায় রাজাকারে ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করতে।

রাজাকার বাহিনীতে নানা শ্রেণীর লোক ভর্তি হলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল জামায়াতের হাতে। ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা ছিল স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান। সে সময় রাজাকারদের সমালোচনার জবাবও সে কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত হতে পারে–

.....ঠিক একারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ, ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাকসেনানায়করা মায় সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।
পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল পিপলস পার্টি ও তার মুখপত্র মুসাওয়াত সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল নিষিদ্ধ আওয়ামী বিদ্রোহীদের সুরে সুরে মিলিয়ে রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছে। এমনকি সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সংগৃহীত রেজাকারদের দল বিশেষের নামে চালিয়ে এ আধা সামরিক সরকারি বাহিনীতে রাজনীতি ঢুকাবার অবৈধ প্রয়াসের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের অখণ্ডত্বের জন্য আত্মোৎসর্গী একমাত্র নির্ভর যোগ্য স্থানীয় বাহিনীর বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।
যে রেজাকারদের সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সামরিক সরকারই বাছাই করেছেন এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়েছেন তারা কি করে দল বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্যান্য দলের কর্মীদের খতম করছে ভাবতে অবাক লাগে। অপবাদ মূলত সামরিক সরকারকে কি দেওয়া হচ্ছে না?
সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেজাকাররা যখন শুধু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের খতম করছে, তখন তা যদি অন্য কোনও দলের কর্মী নিপাত করা হয়ে থাকে তো মানতে হবে, সে দলের কর্মীরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় দালালী করছে।"
উপর্যুক্ত বিবরণের প্রমাণ এই পঞ্জি, যে সব কুখ্যাত রাজাকার মানুষ মেরেছে তারা পুনর্বাসিত এবং এখনও তাদের কাজ করে যাচ্ছে যার প্রমাণ বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মান্ধ, উগ্র, ক্ষমতালোভী ও আধিপত্য বিস্তারকারী জঙ্গী ইসলামী সংগঠনগুলির উদ্ভব ও বিকাশ।

ছয়

২৬ মার্চ আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। ঐ দিন (২৫ মার্চ মধ্যরাতে) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে, পাকিস্তানের সঙ্গে যাবতীয় আলোচনার ইতি হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁকে গ্রেফতারের আগে তিনি একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন ইপিআর ট্রান্সমিটারে প্রচারের জন্য। বার্তাটি ছিল নিম্নরূপ—
"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last your fight must go on until the last **soldier of Pakistan** occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[১]
এই বার্তা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত করেন। ২৬ তারিখের সিলসহ এ ধরনের বার্তার একটি টেলিগ্রাম আমি দেখেছি যা পাঠান হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা থানার ওসির কাছে। অবশ্য, ভাষণটি ছিল ভিন্ন।

বিভিন্ন তথ্য প্রমাণে এটিই প্রতিভাত হয় যে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা ও সংবিধানে এর ভিত্তি আছে। সে জন্য ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস।

এই স্বাধীনতা দিবসটি ক্রমেই বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের নজির নেই যে কোনও জাতি তার স্বাধীনতা দিবস অস্বীকার করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি এই উদ্যোগ নিয়েছে, বিএনপির স্থপতি জিয়াউর রহমানকে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

প্রথমে, এ কথা বলা হতে লাগল যে, জিয়া ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এখন বলা হচ্ছে ২৬ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ মিথ্যা তথ্য সংযোজনের জন্য পুনর্মুদ্রিত স্বাধীনতার দলিলপত্র ও সমস্ত পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করা হয়েছে। এর নজিরও পৃথিবীতে নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকে ২৬ মার্চ বিতর্কিত করার প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে চাই যা জরুরি।

প্রাক ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিএনপি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, নতুন শতকে পাঠ্য পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সে রকমই আছে। আগে বিএনপি খানিকটা সংযম দেখিয়েছে কারণ, বিরোধীদল হিসেবে সংসদে আওয়ামী লীগও ছিল শক্তিশালী। সে জন্য মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান আড়াল করতে চাইলেও তা আড়াল করা যায় নি। এবং লিখতে হয়েছে জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিয়েছিলেন। এবার জামায়াত বিএনপি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। ফলে, পাঠ্যপুস্তকে তাদের মতাদর্শ প্রচারে আর রাখঢাক রাখা হয়নি। তারা যা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাই করা হয়েছে। এর ভিত্তি মিথ্যা না সত্য তাতে কোনও গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

জোট সরকার পরিবর্তন এনেছে যেখানে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্বাধীনতার নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও সে ঘোষণার তারিখ। এবং বিতর্ক সেখানেই। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি কথাই বার বার ফিরে এসেছে। জিয়াউর রহমান, হ্যাঁ, সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তারিখটা ২৭ মার্চ নয়, ২৬ মার্চ। গত শতক পর্যন্ত ছিল ঘোষক/পাঠক জিয়াউর রহমান এবং তারিখ ২৭ মার্চ। মনে হচ্ছে, পুরো জাতির ইতিহাস আটকে আছে একটি তারিখের হেরফেরের মধ্যে। এ জাতি এগুবে কী ভাবে?

এ ছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের আগে বাঙালির ভালোবেসে দেয়া উপাধি 'বঙ্গবন্ধু' সব জায়গা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকে যতটা সম্ভব তুচ্ছ করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। আমরা অনেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে অপছন্দ করতে পারি। সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু তাঁকে তুচ্ছ করার দরকার কী? বাংলাদেশের ইতিহাস কি তাঁকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব হবে? এবং লিখলেও কি তা স্বীকৃত হবে?

যেহেতু জোট সরকারের অংশীদার জামায়াত ইসলাম সেহেতু, যেখানে আলবদর, আল শামস, তাদের গণহত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা আছে সে সব অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়া হয়েছে।

পাঠ্য বইয়ে জোট সরকার ঘোষণা করেছে "প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"
হ্যাঁ মেজর জিয়া 'প্রভিশনাল কমান্ডার ইন চিফ অব দি বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স নাম নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।
তবে, তা ২৭ মার্চ, স্বাধীনতার দলিলপত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের এই দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছিল জেনারেল জিয়ার আমলে।
জোট সরকারের সমর্থক, জিয়ার সহযোদ্ধা, বিএনপি নেতা মেজর জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী *দলিলপত্র* - এর তৃতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন- আমার জানামতে সবচাইতে প্রথমেই বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠেই লোকে প্রথম শুনছিলেন। এটা ২৬ মার্চ, ৭১ অপরাহ্ন দুটার দিকে হতে পারে।...কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তা হলে আমি বলব যে, চট্টগ্রামের হান্নান ভায়ের ঘোষণা শুনে।"
এম এ হান্নান জানাচ্ছেন, "২৭শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"
প্রয়াত ঐতিহাসিক আজিজুর রহমান মল্লিক জানান, "২৭শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা শুনেই আমি হান্নান সাহেবকে টেলিফোনে বলি যে, ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম যোগ করা আবশ্যক। নইলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হবে না। মেজর জিয়া পরবর্তী ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে, তাঁর পক্ষ থেকে।"
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৪.৪.১৯৭১ তারিখে দেশবাসীর প্রতি বেতারে ভাষণ দেন, তাতে বলেন- "২৫ মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্ত লোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন, তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"
তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? স্বাধীনতার ড্রাম তত্ত্বের উদ্ভাবক জেনারেল শওকত ও অন্যান্য, এমনকি ইয়াহিয়া খান নিজেও বলেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ। এমনকি জেনারেল জিয়াও স্বীকার করেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তিনি ২৭ মার্চ। আর ২৭ মার্চ হতে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান যদি কার্যত বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধানই হন তা'হলে দেশ বিদেশের সংবাদপত্র, রাষ্ট্রনায়করা কেন বারবার খোঁজ করে বলেছিলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়?" তারপর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন কোনো বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে জেনারেলের কথা নেই?
১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জেনারেল জিয়া এক বক্তৃতায় বলেন, "এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ২৭ মার্চের কথা যেদিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে

আমার বলার সুযোগ হয়েছিল। সেই একই জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।"

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছিলেন, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্র অস্বীকার করার অর্থ স্বাধীনতা অস্বীকার করা যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। সংবিধানে সঙ্কলিত এই বীজমন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে—'যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান..."এবং আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণা পত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"

পাঠ্য বইয়ে তথ্য বিকৃতকারী কাজী সিরাজউদ্দিনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁর এই তথ্যের ভিত্তি কী?

তিনি সদুত্তর দিতে পারেন নি। তবে বলেছেন, সৈয়দ আলী আহসানের একটি লেখা তাঁর তথ্যের ভিত্তি।

কী লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান? তিনি লিখেছেন, ২৬ মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সে দিন "কালুরঘাট ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেয়েছিলাম।"

"সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহূর্ত ছিল"। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও দেবদাস চক্রবর্তী।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহকর্মী ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের। তিনি বলেন, ২৬ তারিখ তাঁর জন্মদিনে কাউকে ডাকলে আমাকে ডাকতেনই। অন্তত রশীদ চৌধুরী বা দেবদাসের আগে। কিন্তু সেদিন তাঁর জন্মদিনে আমাকে ডাকেন নি। আর দেবদাস চক্রবর্তী ঐ সময় ঢাকায় ছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর বাসায়।

অধ্যাপক মনসুর মুসা এখন মতাদর্শের দিক থেকে বিএনপির কাছাকাছি। কিন্তু তিনিও বলেছেন, "সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের স্মৃতিচারণ ঠিক নাও হতে পারে। ২৬ মার্চ ছিল কড়া কারফিউ। ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত কেউ খোলেন নি। তাই অনেকে ২৬ মার্চকে পূর্ণাঙ্গ দিবস হিসেবে দেখার সুযোগ পান নি। যে কারণে, ২৭ মার্চের সঙ্গে ২৬ মার্চকে গুলিয়ে ফেলার এবং স্মৃতিবিভ্রম ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।"

উল্লেখ্য, সৈয়দ আলী আহসানকে বেগম জিয়া শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক দিয়েছেন। সামান্য সুযোগ সুবিধার জন্য আমরা অনেকে যে আত্মা বিক্রি করে দিতে কসুর করি না উপর্যুক্ত ঘটনাগুলি তার উদাহরণ।

সুতরাং পাঠ্য বইয়ে ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে যা সংযোজিত হয়েছে তা মিথ্যা এবং অবৈধ। এ অংশটুকু যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা অন্যায় করেছেন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করে। ফলে কোনও শিক্ষক ও ছাত্র এ তথ্য গ্রহণে বাধ্য নয়। একজন শিক্ষক তিনি যে মতাবলম্বীই হোন না কেন, ক্লাসরুমে সৎ শিক্ষক হিসাবে এমন তথ্য ছাত্রদের দিতে পারেন না যা সংবিধান বিরোধী ও অসত্য। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আমি শিক্ষকদের অনুরোধ জানাব।

জোট সরকারের এই মিথ্যা তথ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্ররা। পরীক্ষার খাতায় এই মিথ্যা উত্তর ভুল বলে বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনও অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে এই তথ্য গ্রাহ্য হবে না। এরা সবাই জামায়াত ও বিএনপির ক্রীতদাস—এটা ভাবা ঠিক হবে না। যাঁরা গবেষণা করবেন, ইতিহাস লিখবেন দলিলপত্রের ভিত্তিতে তাঁদেরও কোনও উপায় থাকবে না এ তথ্য ব্যবহারের। যেমন, এক সময়ের আওয়ামী লীগ, তারপর জিয়া ভক্ত, এরপর এরশাদের অনুসারী, বর্তমানে আবার বেগম জিয়ার দক্ষিণহস্ত মওদুদ আহমদ পর্যন্ত যখন শেখ মুজিবের সময়কাল শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি লেখেন, তখন বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এভাবে– "শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চেয়েও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। "গবেষক হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করা যায় না।"

কয়েকটি প্রজন্মকে কীভাবে বিভ্রান্ত করবে এই সংযোজন, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার বন্ধুপুত্র দীপ ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হবে। তাঁর বাবা-মা তাকে শিখিয়েছেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ভর্তি পরীক্ষার ঠিক আগে কাগজে এ সম্পর্কিত বিতর্ক দেখে, তাকে আবার শেখানো হলো, স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন জিয়াউর রহমান। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বন্ধু তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, যদি জিজ্ঞাসা করে স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন, তখন কী বলবে?" ত্রিশ সেকেন্ড চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে সে উত্তর দিল—"আগে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এখন করেছেন জিয়াউর রহমান"।

শুধু তাই নয়, একটি সরকার একটি প্রজন্মকে মিথ্যা শেখাবে। শিক্ষকরা যদি বিবেক বন্ধক রেখে এই পাঠ্য বই অনুসরণ করেন তা হলে তারাও পরিণত হবেন মিথ্যাবাদীতে। ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব দ্বিখণ্ডিত হবে। জাতিতো হবেই। রাজনৈতিক বিতর্ক বৃদ্ধি পাবে, সমাজে সৃষ্টি হবে টেনশনের। স্বাধীনতার ঘোষণাই যদি অস্বীকার করা হয় তা'হলে স্বাধীনতার বীজমন্ত্রকেই অস্বীকার করা হবে। যে কারণে, জাতি স্বাধীন হয়েছিল সে কারণটি অস্বীকার করা হবে। তা'হলে জাতির গৌরব বোধ, সম্মান এ সব কিছুই থাকবে না। ইংরেজীতে যাকে বলে 'অবমাননা' করা তাই করা হবে পুরো জাতিকে। জাতি যখন হীনমন্যতায় ডোবে, সম্মান বোধ থাকে না তখন তাকে শাসন করা সহজ। কারণ সে জাতির আর তখন কোনও আত্মা থাকে না।

দুঃখের বিষয় সংশোধিত সংস্করণে লেখক/সম্পাদক হিসেবে যাঁদের নাম আছে তাঁরা বলেছেন এ ব্যাপারটি তাঁরা জানেন না। কিন্তু, এখন জানলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করলেন কই? কারণ, এখনও ভবিষ্যতে এসব বইয়ের রচয়িতা হিসেবে তাঁদের নামই থাকবে, অন্য কারো নয়। এসব ভুল তথ্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব তাঁদেরও। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ইতিহাসের শিক্ষক আছেন কয়েক হাজার। ইতিহাস বিষয়ক সমিতি আছে দু'টি ইতিহাস সমিতি ও পরিষদ। আছে এশিয়াটিক সোসাইটিও। কেউ কোনও প্রতিবাদ করে নি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে অনেকে মনে করেন এগুলি নিয়ে কথা বললে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে। এগুলি রাজনৈতিক বিষয়। হায়! এসব নিয়ে জাতি এগুবে? অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমেদ লিখেছিলেন, "আমাদের জীবিতকালে আমাদের চোখের সামনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যে বিকৃতি ঘটছে বা ঘটান হচ্ছে সেটাকে রোধ করার দায়িত্ব কেবল দেশের ইতিহাসবিদদের নয়, এ দায়িত্ব গোটা বাঙালি জাতির।"

ইতিহাস জাতীয় উন্নয়নে হাতিয়ার হতে পারে। ইতিহাস বিকৃতি স্থবির করে দিতে পারে জাতিকে। পাকিস্তানের অধ্যাপক ওয়াসিম বলেছেন, পাকিস্তানে, ইতিহাস বিকৃতি সৃষ্টি করেছে 'ফসিলাইজ মাইন্ডসেট'। বর্তমানে, আমাদের দেশে ইতিহাস নিয়ে যা চলছে তাতে মনে হচ্ছে সেই পাকিস্তানীকরণের দিকে রওয়ানা হয়েছি আমরা।

দৈনিক পত্রিকাতে দেখুন ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস বা ২৬ মার্চ সম্পর্কিত কোনো বিতর্কমূলক বা বিকৃত প্রতিবেদন নেই। কেন নেই? এটিই প্রমাণ করে ১৯৭৫ এর পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সামরিকায়ন করার প্রক্রিয়ার একটি ধাপ ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা বদলে ফেলা।

সাত

স্বাধীন হওয়ার পর পরই বাংলাদেশকে অভূতপূর্ব সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যা মানুষ ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের আগে কল্পনা করেনি। সম্পূর্ণ দেশটি বিধ্বস্ত। আমেরিকা, চীনের মতো বড় শক্তিগুলি শত্রু ভাবাপন্ন। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি পাকিস্তানের সমর্থক। প্রচুর বাঙালি আটকে আছে পাকিস্তানে। বাংলাদেশে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষুব্ধ ভারতীয় সেনারা তখনও বাংলাদেশে। দেশটি তখনও কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয় নি। কিন্তু ১৯৭৫ এর মধ্যেই দেখা যায় বঙ্গবন্ধু সরকার সে সব সমস্যা কাটিয়ে উঠছে।

'যুদ্ধ ঘোষণা'য় অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেদনগুলি দেখলে তখনকার সমস্যার ধরনগুলি বোঝা যাবে। দেখা যাবে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আমেরিকা কী ধরনের বিরোধিতা করছে। কোন দেশগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বাংলাদেশকে বিবেচনা করছে। ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামনে মূল সমস্যা কী ছিল সেটি সম্পর্কেও ধারণা করা যাবে।

ভারতীয় সৈন্য বা মিত্রবাহিনীর কথা আজ সবাই বিস্মৃত। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। বস্তুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহায়তা না পেলে মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না। আসলে

নয় মাসে কোনো দেশই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম।

'ভারতীয় সৈন্য (মিত্র বাহিনী)' শীর্ষক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেদনগুলি মাত্র দুই বছরের ১৯৭১-৭২। এখানে দু'ধরনের প্রতিবেদন লক্ষ করা যাবে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় চর' এবং সীমান্ত সংঘর্ষে প্রায়ই ভারতীয় সৈন্য হত বা হটে গেছে। এ ধরনের সংবাদ ছিল হয় মিথ্যা নয় অতিরঞ্জিত। অন্যদিকে, ১৬ ডিসেম্বরের পরের সংবাদগুলিতে দেখা যায় কীভাবে মানুষ ভারতীয় সৈন্যদের বরণ করছে। আজ ত্রিশবছর পর, বিশেষ করে জিয়া-এরশাদ আমলে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে বিষয়টি কল্পনাতীত। এই সৌহার্দ্য থাকলে, বাংলাদেশকে সৈন্য ও অস্ত্রের পেছনে বিশাল অংকের টাকা খরচ করতে হতো না। দেশটি পরিণত হতো সমৃদ্ধশালী দেশে।

১৩ ও ১৪ মার্চ ১৯৭২ সালের পূর্বদেশের দু'টি প্রতিবেদন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি উদাহরণ হিসেবে—মিত্রবাহিনীর বিদায় উপলক্ষে কুচকাওয়াজে সালাম নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন "আপনাদের কীর্তি ইতিহাসে আমাদের স্মৃতিতে চির অম্লান," প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল–

'বিদায় বন্ধু ভালোবাসা নিয়ে যাও,' অন্যদিকে পরের দিন (১০৩) মিত্রবাহিনীর বিদায় ভাষণের শিরোনাম ছিল–'বিদায় বাংলাদেশ তুমি অপূর্ব—ভুলিবার নয় জয়বাংলা।'—

আরো উল্লেখ্য কাদের সিদ্দিকী তখন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন মিত্রবাহিনীকে খেতাব প্রদানে (১০-৩-১৯৭২)। এ দাবি ছিল যৌক্তিক যা তৎকালীন সরকার উপেক্ষা করেছে।

যৌথ কমান্ড নিয়ে পরবর্তীকালে অনেকে নানা কথা লিখেছেন, তথ্য বিকৃত করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনুরোধ জানাব ১৮-১২-১৯৭২ সালে সংবাদে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুলের মন্তব্য। মুক্তিযুদ্ধপূর্ব চুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন-

"যৌথ কমান্ড বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় যুদ্ধ করেছিল।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আটক করা হয় ২৫ মার্চ রাতেই। তাঁর এই গ্রেফতার হওয়া নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক চলছে। আওয়ামী লীগ বিরোধীদের প্রধান প্রশ্ন, কেন তিনি পালিয়ে গেলেন না। ইচ্ছাকৃতভাবেই কি তিনি গ্রেফতার বরণ করলেন। ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল, ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমাকে হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, ওরা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপসের আলোচনা করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো, না বেরুনো নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তানি বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি স্থির করলাম : আমি মরি, তাও ভালো, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।

শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর বিচারের আয়োজন করতে থাকেন। অন্যদিকে, তাজউদ্দীন আহমদের

নেতৃত্বে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। অন্যদিকে, ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন দেশদ্রোহী হিসেবে শেখ মুজিবের বিচার করা হবে। ১১ আগস্টে বিচার শুরু হয় এবং ইয়াহিয়া আরো ঘোষণা করেন 'খেয়াল বশে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া যায় না।'

শেখ মুজিবকে নিয়ে সারা বিশ্বে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। ভারতের রাজনৈতিক দল শুধু নয়, সিভিল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপও এর প্রতিবাদ জানাতে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়ে লেখালেখি হতে থাকে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রবল বিশ্বচাপ এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুদণ্ড আর কার্যকর সম্ভব হয় নি। এ দিকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে। কিন্তু, বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশতো বাঙালি চায়নি। সেই আবেগ বোঝা যাবে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের এক সংবাদে- "৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি না দিলে পাকিস্তান আক্রমণ করা হইবে : মুক্ত বাংলার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রথম জনসভার রায়।"

অবশেষে ৪ জানুয়ারি এ দেশের মানুষ জানতে পারে বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন এবং মুক্তি পাচ্ছেন। দৈনিক পূর্বদেশের শিরোনাম ছিল (৪.১.১৯৭২) - 'হে বীর হে নির্ভয় তোমারই হলো জয় মুজিবের মুক্তি।' ১০ জানুয়ারি স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার (প্রবাসী সরকার/মুজিবনগর হিসেবেও পরিচিত) গঠিত হওয়ার পর থেকেই তা স্বীকৃতির চেষ্টা করেছে। সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আবেদন করে বলেন, "জাতি সত্ত্বা অর্জনে আমাদের সংগ্রামে বস্তুগত এবং নৈতিক সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে আবেদন করছি। প্রতিদিনের বিলম্বে হাজার জীবনের অবসান ঘটছে এবং বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদের ধ্বংস সাধিত হচ্ছে। মানবতার আহ্বানে এখনই সাড়া দিন এবং আমাদের অবিনশ্বর বন্ধুত্ব লাভ করুন। ... কোনো জনগোষ্ঠী আমাদের চাইতে কঠোর সংগ্রাম করেনি এই অধিকার অর্জনের জন্যে।[৪]

অন্যদিকে, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বারবার দাবি তুলছিল বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য যদিও এক ধরনের defact স্বীকৃতি ভারত দিয়েছিল।[৫] কারণ, ভারত বাংলাদেশ সরকারকে সরকার গঠন করতে দিয়েছিল তার মাটিতে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছিল ও অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে যাচ্ছিল। এগুলি ছিল defact স্বীকৃতিরই অংশ যদিও আইনগত স্বীকৃতি ভারত তখনও দেয়নি। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করছিল যা ছিল এক ধরনের স্বীকৃতি। যুদ্ধ শুরু হলে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তারপর ভূটান। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে স্বীকৃতির আবেদন জানায়। 'স্বীকৃত শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত ১৯৭২ সালের খবরগুলি অধিকাংশ

স্বীকৃতির আবেদন সংক্রান্ত এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে সব দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে তার খবর।

বাংলাদেশের আইনগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তান ছিল অন্তরায়। পাকিস্তান ঘোষণা করেছিল, যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে পাকিস্তান সরকার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এরকম দশটি দেশের সঙ্গে পাকিস্তান সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল বড় দেশগুলি ছাড়া, যেমন, অস্ট্রেলিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামী দেশ ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে সময় নিয়েছিল।

'অস্ত্র সমর্পণ' ছিল সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের সংবাদে দেখি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অস্ত্র জমাদানে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা ও অনেকের হাতে তখন প্রচুর অস্ত্র ছিল এবং দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে তা ছিল অন্তরায়। অধিকাংশই অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন, তবে অনেকে দেননিও। ১৯৭২ এর পর বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ এইসব জমা না দেয়া অস্ত্র ব্যবহার করেছিল বলে অনুমিত। 'অস্ত্র সমর্পণ' শিরোনামে এ সংক্রান্ত খবরের শিরোনামগুলি সংকলিত হয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। বিজয় দিবস সংক্রান্ত আবেগপূর্ণ সব প্রতিবেদনের সংকলন '১৬ ডিসেম্বর'।

আট

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকহারে হত্যা করেছিল পাকিস্তান বাহিনী, তাদের সহযোগী জামায়াত ইসলাম ও তাদের অঙ্গসংগঠন আলবদর, আলশামস প্রভৃতি। এই বুদ্ধিজীবী হত্যা ও হত্যাকারীদের বিচার নিয়ে নানা বিভ্রান্তি বিরাজ করছে কারণ সমন্বয়ের রাজনীতির নামে ১৯৭৫ সালের পর বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর পর বুদ্ধিজীবী হত্যা ও এর বিচার গুরুত্বপূর্ণ ছিল (এখনও আছে)। এই শিরোনামে সংকলিত সংবাদগুলি এর উদাহরণ।

"আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।..."

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা ....মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।....

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক-যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী একবছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। সংকলিত 'বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা'- একটি উদাহরণ। এ উদাহরণটি অবশ্য অনন্য কারণ, বধ্যভূমি থেকে কেউ ফিরে আসে না, আসে নি। ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি, যেখানে আমাদের বরেণ্য

বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা যাদের প্রধান অংশ ছিল জামায়াতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকারবাহিনী, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর ও আল শামস বাহিনী। এখনো ত্রিশ বছর পেরোয় নি ঐসব নৃশংস ঘটনার। কিন্তু, বাংলাদেশ যেন এসব মনে রাখে নি।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না তা সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। আমার সামনে ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ কিছু সংখ্যা। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং একসময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়ত, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক নয়, খুনিদের বিচার না-হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

১৪ ডিসেম্বর কেন আলাদাভাবে বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় তা নিয়েও যে গোড়া থেকেই প্রশ্ন ওঠে নি তা নয়। উঠেছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে তারই একটি অংশ বুদ্ধিজীবী হত্যা। পার্থক্য শুধু একটি থাকতে পারে। তা হলো, সাধারণ মানুষদের যত্রতত্র বধ করা হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের খবর নিয়ে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। দুটো প্রক্রিয়াই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তবে ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আরো জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরিকল্পিত উপায়ে তাদের তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। 'বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।'

পাকিস্তানীরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারে নি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণীর প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ষাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলো সত্যি, যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকের চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানীরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, একধরনের বিশেষ ক্রোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হলো, যদি বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কোষগ্রন্থ'-এ যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত- 'এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নিবীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।'

'স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি.আই.এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদরবাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হলো : বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু-দেশ।"

['একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' থেকে উদ্ধৃত]

বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদরবাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদরবাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বাচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছে তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও আছে জামায়াতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, আবদুল কাদের মোল্লা, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আশম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে ছিল খালেক মজুমদার, 'মওলানা' মান্নান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঈনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোট আলবদর ছিল [সংকলন দেখুন]। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। জানার বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয় নি। ১৪-৯-৭১ তারিখে জামায়াতের মুখপত্র সংগ্রামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল–

"আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।"

আল-বদর ও আল-শামস গঠিত হয়েছিল প্রধানত জামায়াতে ইসলাম ও ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা। সারাবছর ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালালেও, পরাজয় আসন্ন জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা মরণ-কামড় দেয়। এ সম্পর্কে সে-সময়কার দৈনিক বাংলায় ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন—

"এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামায়াতে ইসলামীর আল-বদর। 'শহরের কয়েকশ' বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।"

'গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমণ্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহুসংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ-পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই। গত একসপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয় নি।

"ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর সেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত একসপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।"

সমন্বয়ের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের হয়ত এ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নাও মনে হতে পারে। কারণ তা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে একটি দৈনিকে। সে-জন্য তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)–

...বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডির কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা: যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়।

'শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃত্যুদেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পাড় ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।'

'...এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন; তাদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের ওপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে: ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

'বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গির্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।"

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে চিহ্নিত কেউ সাজা পায়নি। আগেই উল্লেখ করেছি বরং তাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আজকাল মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখা যায় তিন জনকে বিচারের (একজন মারা গেছে) জন্য ঢাকা আনা হবে। এরা ছোট আল-বদর। কিন্তু ঢাকার বড় আল-বদররা এখনো পত্রিকা বের করে মুক্তিযুদ্ধকে গালাগাল দেয়, সংসদে বসে বিতর্কে অংশ নেয়, প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় কেন সরকার, রাজনৈতিক দল বা আমরা ঘটা করে প্রতি ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি?

নয়

বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচার কি দাবি করা হয় নি? ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকেই বিচার দাবি করা হয়েছে। নিবন্ধের শেষে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সংবাদাবলী সংকলন করা হয়েছে। এ সব সংবাদ তুলে ধরে যুদ্ধাপরাধীদের কার্যাবলীর বিবরণ যার অনেক কিছুই আমরা ভুলে গেছি। শুধু তাই নয়

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে সবসময় দাবি করে আসা হচ্ছে সংকলিত সংবাদগুলিই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। কিছুই হয়নি।

বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) দৈনিক বাংলা লিখেছিল–

"আল-বদরবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে একসপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।"

অবশেষে বুদ্ধিজীবীরা নিজেই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আশ্বাসে কাজ শুরু করেন। কমিটির আহ্বায়ক জহির রায়হান নিজেই এরপর নিখোঁজ হয়ে যান। এর পরের ঘটনা উদ্ধৃত করছি। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' থেকে—

"৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে যে-সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছিল কোলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক ভারতে নিয়ে চলে যান।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক ব্রিটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউজ ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মি. স্টোনহাউজ বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ-বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমাদের অনেকের ধারণা ডিসেম্বরেই বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল। আসলে তা নয়। ২৫ মার্চ থেকেই তা শুরু হয়েছিল। এর প্রমাণ, ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করা। সারা বছর ধরেই এ অপহরণ ও হত্যা চলেছে। আল-বদর, আল-শামস গঠিত হবার পর এ

হত্যাকাণ্ড জোরদার হয়ে ওঠে মাত্র। সংকলিত সংবাদে দেখা যাবে, অনেকে ডিসেম্বরের আগেই অপহৃত হয়েছেন কিন্তু তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগী আল-বদর ও আল-শামসরা কতজন বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে? এর সঠিক হিসাব কিন্তু এখনো পাওয়া যায় নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি। কিন্তু কারা শহীদ হলেন, খুনি কারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয় নি। এখনো সে চেষ্টা নেয়া হয় নি। এসব যখন মনে হয় তখন আমাদের পুরো শ্রেণীটির প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে, আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং তারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে-কাজটি করা হয় তাহলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক বাংলায় আবেগময়ী এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল—"পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আল-বদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংসতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু ক্ষমা করা হয়েছে শুধু নয়, তাদেরকে এই দেশেরই প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, এমপি করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা-জাদুঘর হয় নি কিন্তু একদশক আগে সামরিক-জাদুঘর হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে শহরের এলাকায় তা স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এসমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের একাংশের সহযোগিতার কারণে। এর ফলে দেশে দীর্ঘদিন কায়েম থেকেছে প্রগতিবিরোধী শাসন, থাবা বিস্তৃত হয়েছে মৌলবাদের। প্রায় সময় আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম-প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছিল। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে অপমানিত বোধ করে নি। তাদের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

দশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার জার্মানিতে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করেছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেই প্রথম বৃহৎ আকারে গণহত্যা ও সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। এই প্রজন্মের পরিকল্পক পাকিস্তানি

সামরিক জান্তা এবং প্রোগ্রাম কার্যকর করার দায়িত্বে ছিল স্থানীয় অবাঙালি ও বাঙালিরা যারা ছিল আল-বদর বা আল-শামসের সঙ্গে যুক্ত।

সামরিক জান্তার পক্ষে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক। এ অনুমান আমাদের তো বটেই, বাইরের অনেকেরও। রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে আমি ফরমান আলীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন তবে একপর্যায়ে স্বীকার করেন ৯ কি ১০ তারিখ তিনি পিলখানা গিয়েছিলেন, এবং সেখানে বেশ কিছু গাড়ি পার্কিং করা অবস্থায় দেখেছিলেন। তার একটি নোটে লেখা আছে- 'আল-বদরদের বিভিন্ন গ্রুপকে গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা তিনিই করেন এবং আল-বদররা এসব গাড়িতে করে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করে। যাদের অপহরণ করা হয়েছিল তাদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অপহরণ করার জন্য গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সময় যানবাহনের অভাব ছিল। এসব গাড়ি না-পাওয়া গেলে হত্যা-পরিকল্পনা সম্পন্ন করা যেত না। আলতাফ গওহর ইসলামাবাদে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন, কবি সানাউল হকের নাম ছিল তালিকায়। তার এক বন্ধুর মারফত রাও ফরমান আলীকে অনুরোধ করায়, তার ভাষায় 'ফরমান ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে তার নামটি কেটে দেন।'

এ-বিষয়ে ১৯৭১ সালে গঠিত বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। ভারতের সাপ্তাহিক 'নিউ এজ' পত্রিকায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে জানান-

"আল-বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা এই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইয়ের দেহের অবশেষ ঢাকায় বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

'আল-বদরবাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে থাকে সব লেখক ও অধ্যাপকই একরকম ছিলেন। জহীর রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌছানো যায় যে, আল-বদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?

'সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদেরকে আল-বদরবাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

'পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়রিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হলো হেইট (Height) ও ডুসপিক (Dwespic)।

'এদের নামে পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউ.এস.এ. (U.S.A.) ও ডি.জি.আই.এস. (D.G.I.S.) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে- 'রাজনৈতিক ৬০-৬২, ৭০। অপর এক জায়গায় লেখা আছে- এ দু'জন আমেরিকান পি.আই.এ-র একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।
'হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কোলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি.আই.এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গতবছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।
'নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল-বদরবাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।
এই দশ জন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা-সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয় নি। এদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ সরাসরিভাবে পরিচালনাকারী দুই অফিসার জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ২০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ বিমানে কোলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর কড়া সামরিক প্রহরায় কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিসারকেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।
বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে ৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদমিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতোপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের পরিবারের সদস্যদেরও তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেন নি।
পত্রিকায় সংবাদ থেকে জানতে পারি ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, তারপর এ মামলার কী হলো তা জানি না। ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আল-বদর আবদুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মওলানা' ও 'ইনকিলাবের' একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়'। সে রায় বাতিল হয়ে যায় হাইকোর্টে।

মুক্তিযুদ্ধকে অন্যভাবেও বিচার করতে পারি। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসন, ছিল জনপন্থীদের শাসন যা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল। ১৯৭১ সালে সে শক্তির সহযোগী মুসলিম লীগ বা জামায়াতও সে ঘরানার। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐক্য হয়েছিল মধ্যপন্থা ও বামের। শেষোক্ত ধারা জয়লাভ করেছিল।

ঔপনিবেশিক, প্রগতি বিরোধী, রক্ষণশীল, সাম্প্রদায়িক বা সামরিক ধারা সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে না। এ ধারার যারা পৃষ্ঠপোষক বা সমর্থক তাদের স্বার্থেই কাজ করা হয়। তবে সাধারণ মানুষ যারা এ ধারার সমর্থক, তারা আবার এ ধারা থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা তেমন পায় না। তাদের লাফালাফিই সার। সুবিধা পায় একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চক্র। এর বিপরীতে আবার নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত বা এলিট দিলেও সাধারণ মানুষ এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সুবিধাটা ভোগ করে বেশি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে মধ্যপন্থা ও মধ্যবামের চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে যার অন্য নাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

১৯৭৫ এর পর থেকে এ পর্যন্ত মাঝের পাঁচ বছর বাদ দিলে বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে জনপন্থিদের ধারা। এবং পর্যালোচনা করলে দেখব, দক্ষিণপন্থা সবসময় দেশের বিপর্যয় ডেকে আনে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ জেড এম আবদুল আলীর একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে চাই (যুগান্তর, ২.১২.০৫)। তিনি দেখিয়েছেন ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশ কতটা এগিয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের মূল ভিত্তি ইউএনডিপির বার্ষিক মানবউন্নয়ন সূচক। সেখানে সাফল্যের ফলকটির প্রতীক ধরা হয়েছে ১ কিলোমিটার। এই দৌড়ে অংশ নিয়েছে ১৭৭টি দেশ। ২৮ বছরে দৌড়ে এগিয়ে আছে নরওয়ে, তারা পৌঁছে গেছে ৯৬৩ মিটারে। আর ৩৭ মিটারে এগুলেই তারা পৌঁছে যাবে ফিনিশিং লাইনে। সবশেষে আছে নাইজার, তারা পেরিয়েছে ২৮১ মিটার। বাংলাদেশ পৌঁছেছে ২৮ বছরে ৫২০ মিটারে।

বিষয়টি এখন অন্যভাবে দেখা যাক। জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় তখন বাংলাদেশ ছিল ৩৪৫ মিটারে। পাঁচ বছরে এই লৌহমানব বাংলাদেশকে নিয়ে এগিয়েছিলেন মাত্র ১৯ মিটার। এরশাদ প্রথম পাঁচ ও দ্বিতীয় পাঁচ বছরে অতিক্রম করেন ২০ ও ৩০ মিটার। জিয়াউর রহমান থেকে প্রথম পাঁচ বছরে তিনি এগিয়েছিলেন মাত্র ৫ মিটার। খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশ ৪১৯ মিটারে। তিনি তাঁর আমলে সামনে এগিয়ে ছিলেন মাত্র ৩৩ মিটার। এরশাদ থেকে মাত্র ৩ মিটার বেশি। শেখ হাসিনার আমলে (মধ্যপন্থা) সময়কাল রিপোর্ট অনুযায়ী (১৯৯৫-০০) সূচক দাঁড়ায় ৪৫২ থেকে ৫০৬-এ। তিনি এগিয়েছিলেন ৫৪ মিটার। বেগম জিয়া থেকে ২১ মিটার বেশি। আর তারপর বেগম জিয়ার সূচক ৫২০ মিটার। জামায়াত ও বিএনপি অর্থাৎ চরম ডান ও ডানের শাসনে বাংলাদেশ এগিয়েছে মাত্র ১৪ মিটার। এত কম উন্নয়ন গত ত্রিশবছরে আর হয়নি। এর ফল ডান মানেই বিপর্যয়, চরম ডান মানে ভয়ংকর বিপর্যয়। আমি বা আমরা বারবার যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনার কথা বলি তা ঐ একটি কারণেই।

অনেকে বলেন, এত বছর পর আজ এসব প্রশ্ন কেন? যারা এ কথা বলেন, ধরে নিতে হবে তারা স্বজনহারা হন নি। বাংলাদেশের অগণিত শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধী ও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে উগ্র মৌলবাদী আন্দোলন চলছে তার সমর্থক। যুদ্ধাপরাধী তো বটেই, এদের প্রতিরোধও বাঞ্ছনীয়। এক ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেছেন, যে জাতি তার অতীত ভুলে যায় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কারণ সে তার আত্মপরিচয় হারায়।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে, শান্তি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার এ চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে সময় এখনো ফুরিয়ে যায় নি। সারাবিশ্বে আবার মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আহ্বান হবে, বাংলাদেশে বড় আল-বদরদের বিচারের দাবি তোলা।

অনেকে বলেন, কেন আপনারা এখনো এসব বিষয়ে লেখালেখি করেন। এত বছর পর কেন আবার রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করেন? পুরোনো ক্ষত জাগিয়ে লাভ কী? আপনারা ক'জন এগুলো করে নিজেদেরও বিপদাপন্ন করেছেন। বিএনপি বা জাপা এসব বিষয়ে কেয়ার করে না জানি। আওয়ামী লীগও কি করে? তা ছাড়া রাজনীতির এমন অবস্থা হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের কথা যিনি বলেন, তাঁকেই অভিধা দেয়া হয় আওয়ামী লীগার বলে।

আমি জানি না, রাজনৈতিক দলগুলো এসব বিষয় নিয়ে ভাবে কিনা বা কেয়ার করে কিনা। আমি তা জানতেও চাই না। কিন্তু আমি কেয়ার করি। আমরা যাঁরা লিখছি তাঁরা কেয়ার করি, যাঁরা এ লেখা পড়ছেন তাঁরা কেয়ার করেন। অজস্র মানুষ হয়ত প্রকাশ্যে সে কথা বলেন না বা মিটিং মিছিলে আসেন না। এ প্রসঙ্গে তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদের চলচ্চিত্র 'মুক্তির কথা' এর একটি দৃশ্য মনে পড়ছে। সেখানে সামান্য এক মানুষের জবানবন্দি বিধৃত হয়েছে। তাঁর গ্রামে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এক রাজাকার। সে মানুষটি বলছেন, যদি আমরা রাজাকার নির্বাচন করে থাকি তাহলে আমরা ৯০ ভাগই তো রাজাকার হয়ে গেছি। 'কুত্তার মতো হয়ে গিছি!' না হলে রাজাকার চেয়ারম্যান বানাই!

এ ধরনের মনোভাব নিয়ে অজস্র মানুষ বসবাস করছেন। যদি সে সংখ্যা অজস্র নাও হয়, তাহলেও অন্তত আমরা ১০০ জন হলেও কেয়ার করি এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন হিসাবে, ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসাবে, একজন লেখক হিসাবে আমি কেয়ার করি। তাই যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই। তাই, মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ত স্মরণ করি।

এই সব পত্রিকার পাতা ওল্টালে অনুধাবন করা যাবে ১৯৭২ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যেমন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা পাকিস্তানী বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন ইস্যু, নন-ইস্যুতে তারা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। অনেক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা হত্যাও শুরু হয়েছিল। সামরিক বাহিনী, বেসামরিক আমলাতন্ত্র, ছাত্র সংগঠনগুলিতে

এর অভিঘাত লক্ষ করা যাচ্ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানী বাঙালি ও ধর্মান্ধ ধর্ম ব্যবসায়ীদের শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই নয়, রাজনৈতিকভাবেও ক্ষমতাশালী করে তোলেন যে কারণে আজ বাংলাদেশ দীর্ণ। এখন যে আবার ১৯৭১ সালের পটভূমিকা তৈরি হচ্ছে না কে জানে।

৩৫ বছরের মাথায়ই আজ মুক্তিযুদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কোনও স্মৃতি বা প্রতীক রক্ষায়, গবেষণা বা গ্রন্থ প্রকাশে কারো পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা হয় না। এমনকি ধনী মুক্তিযোদ্ধা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদেরও। তবুও আমরা মনে করি, যে ভাবে যতটা সম্ভব আমাদের আজ কাজ করে যাওয়ার।

আমরা এ ভাবে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে যেতে চাই। শুধু তাই নয়, আমি এও মনে করি, আমাদের এসব কথা বলে যেতে হবে। আপনাকেও বলতে হবে আপনার সন্তানদের। এসব কথা সোনালি শস্যের মতো বেড়ে উঠবে, ঘিরে ধরবে একসময় নতুন প্রজন্মকে। মনে করিয়ে দেবে তাদের যখন আমরা থাকব না, যে স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে তাদের, কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

২০০৮

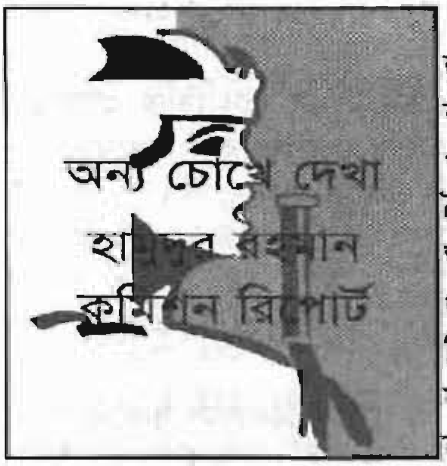

১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কী তদন্ত করতে বলা হয়েছিল কমিশনকে? পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান তার সৈন্যসামন্তসহ কোন পটভূমিকায় আত্মসমর্পণ ও অস্ত্রসমর্পণ করেছিলেন তা নির্ণয়ের জন্যে কমিশনের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে। কমিশনের অন্য দুজন সদস্য ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এস. আনোয়ারুল হক ও সিন্ধু এবং বালুচিস্তানের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুর রহমান। কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল আলতাফ কাদির। এ তদন্ত কমিশনই পরিচিত হামুদুর রহমান কমিশন নামে।

ছয় মাসে ২১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে ১২ জুলাই ১৯৭২, কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে প্রেসিডেন্টের কাছে। কমিশন বলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণের যে কারণগুলো খুঁজে পেয়েছে তা আপাতত স্থিরীকৃত বা টেন্টটেটিভ। ঘটনার কুশীলবরা যুদ্ধবন্দি। তারা ফিরে এলে আরো কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাহলে রিপোর্টটি আরো সংহত হবে।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে যুদ্ধবন্দিরা দেশে ফেরে। কমিশন তখন আবার কাজ শুরু করে। এ সময়, ঘটনার বা ১৯৭১-এর পাকিস্তানি নায়ক জেনারেল নিয়াজী, ফরমান আলী প্রমুখের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের শেষে সম্পূরক রিপোর্ট পেশ করা হয়। সম্পূরক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মূল রিপোর্টে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে সম্পূরক রিপোর্ট শুধু তা জোরদার করবে। সুতরাং মূল ও সম্পূরক রিপোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ এক। তবে, শেষোক্ত রিপোর্টে 'পূর্ব পাকিস্তান' সম্পর্কে অনেক তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট কখনও প্রকাশিত হয়নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন কমিশন করেছিলেন? তাহলে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে হবে।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানে টেলিভিশনে ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি দেখানো হয়েছিল। পাকিস্তানের অনেকে আমাকে বলেছেন, সে দৃশ্য দেখে পাকিস্তানিরা উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠেছিল। টেলিভিশনে সে দৃশ্য আর দেখানো হয় নি। ক্ষমতায় বসে ভুট্টো বুঝেছিলেন, পাকি-বাহিনীর আত্মসমর্পণ পাকিরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সুতরাং, কেন জেনারেলরা আত্মসমর্পণ করল তার কারণ খুঁজে বের করার জন্য কমিশন করা হলো। যদিও যুক্তিযুক্ত হতো পাকিস্তান কেন ভাঙলো তার কারণ অনুসন্ধান করলে। রিপোর্টটি ভুট্টো প্রকাশ করতে চান নি কারণ তিনি তা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তিম হাতিয়ার হিসেবে রেখেছিলেন। আরেকটি কারণ থাকতে পারে

সেনাবাহিনী ভুট্টোকে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুতরাং রিপোর্টটি প্রকাশ করে তিনি সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হতে চান নি।

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, রিপোর্টে কী আছে মোটামুটি অনেকেই তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। ভুট্টোর পর অনেক শাসক এসেছেন পাকিস্তানে, কিন্তু কেউ রিপোর্টটি প্রকাশ করেন নি। পাকিস্তানে অনেকের ধারণা মূল রিপোর্ট নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সম্পূরক রিপোর্টের কপি হয়তো কারো কাছে ছিল। সেটি ভারতে পাচার করার পর 'ইন্ডিয়া টুডে' তা প্রকাশ করে। এখন বেনজির ভুট্টো থেকে অনেকে দাবি করছেন রিপোর্টটি প্রকাশ করতে এবং জেনারেল মুশাররফ তা অস্বীকার করেছেন।

করাচিতে এক সাক্ষাৎকারে (১৯৯৮) বেনজির ভুট্টোকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, "আমার বাবার কাছে একটি রিপোর্ট ছিল। তাতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সামরিক শাসকরা যখন তাঁকে গ্রেফতার করে তখন কপিটিও নিয়ে যায়।" তিনি আরো বলেছিলেন, "এখন [নওয়াজ শরীফ তখন প্রধানমন্ত্রী] যখন রিপোর্ট নিয়ে কথা উঠছে তখন তা প্রকাশ করা উচিত।"

"আপনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তা করলেন না কেন?" জিজ্ঞেস করি আমি।

"বাধা ছিল।"

বেনজির ভুট্টো অবশ্য এটি বললেন না যে তাঁর যেমন বাধা ছিল রিপোর্ট প্রকাশে, নওয়াজ শরীফেরও তেমন বাধা থাকতে পারে। সে বাধাটি হলো সেনাবাহিনী। বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তানের ওপরে আল্লাহ, নিচে মিলিটারি। এ ছাড়া আছে সামন্ত জমিদার ও আমলারা, যারা পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করে।

আলমদার রাজা আবেগপ্রবণ মানুষ। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ঢাকার কমিশনার। এখন তিনি আইন ব্যবসা করেন। ১৯৯৭ সালে লাহোর হাইকোর্টে তিনি একটি রিট পিটিশন করেন। রিটে তিনি দাবি তুলেছিলেন 'ওয়ার কমিশন' বা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য। তাঁর দাবি, ২৫ বছর পর সরকারি নথিপত্র জাতীয় অভিলেখগারে পাঠানোর নিয়ম কিন্তু এ সংক্রান্ত নথিপত্র এখনও পাঠানো হয় নি। যারা দোষী তাদের শাস্তি দেয়া হয় নি। সুতরাং, যারা দোষী তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। তাঁর আরজিটির কয়েকটি যুক্তি তুলে দিচ্ছি যেখানে প্রকাশ্যে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তিনি ছিলেন তৎকালীন ঢাকার সিভিল প্রশাসনের প্রধান। সুতরাং, তাঁর কথা গুরুত্বহীন নয়। কমিশনের সামনে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং রিপোর্টে কী আছে তাও খুব সম্ভব জানতেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন যা পাকিস্তানে তখনও কেউ বলেছিল কিনা সন্দেহ—

"g. That large scale extra judicial and custodial killings, looting, raping was not stopped and the culprits were not punished.

j. That the persons guilty of major crimes of vivisection of the country surrender of the eastern command, killing, raping and looting were protected and no action was taken against them.

o. That on an average about half a million people have lost their lives and Pakistans basic concept has been eroded. The wave of crimes let loose in East Pakistan still continues in Pakistan."

আলমদার রাজা ইসলামাবাদে আমাকে বলছিলেন, তিনি যখন আদালতে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন বিচারপতি বারবার বলছিলেন, "এটা কি সত্যি?" তারপর পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক এক তরুণী ধর্ষণের ঘটনা যখন তিনি বর্ণনা করছেন তখন বিচারকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি রিট পিটিশন গ্রহণ করে জানান আগামীকাল রায় দেবেন। সেই আগামীকাল এখনও আসে নি। আসবেও না। কারণ, পাকিস্তানের উচ্চ আদালত সামরিক বাহিনীর কাছে জিম্মি।

এ ছাড়া, গত ২৫ বছর অনেকে চেয়েছেন এ রিপোর্ট অবমুক্ত হোক। হয় নি। এখন সম্পূরক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আসল রিপোর্ট প্রকাশিত না হলেও কিছু আসে যায় না। পাকিস্তান জুড়ে হৈচৈ চলছে। বাংলাদেশেও আলোড়ন তুলেছে এ রিপোর্ট। ঢাকার এমন কোন পত্রিকা নেই যে রিপোর্টটির অনুবাদ ছাপে নি। পাকিস্তানে হৈচৈ ফেলার কারণ আছে। কারণ, এই রিপোর্টে কোনো-না কোনোভাবে হত্যা, লুট, ধর্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে যা পাকিস্তানিরা কখনও স্বীকার করতে চায় নি।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কী ঘটেছিল বাংলাদেশে? যারা চল্লিশোর্ধ্ব বা তার কাছাকাছি তারা তা জানেন। ১৯৭১ সালে সমগ্র বিশ্বও তা জানত। সে সময় এমন কোনো দেশ খুব কমই ছিল যেখানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ওঠে নি। কিন্তু মনে হয় জানত না একটি দেশ এবং এর অধিবাসীরা। সে দেশটির নাম পাকিস্তান।

অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু যদি এ ধারণা সত্যি হয় তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে কী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিচার করত বাঙালিদের। অর্থাৎ বাঙালিরা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। অবশ্য, আক্ষরিক অর্থে, এ বক্তব্য গ্রহণ না করাই ভালো। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দখলে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এ জন্য যা যা করা দরকার তা-ই করেছে। কারণ, তাদের ভাষায়, তাদের দরকার ছিল মাটি, মানুষ নয়। আর এ বিষয়টি তাদের দেশের কেউ জানে না, তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে, ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের অনেকের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। এর সহজ সরল উত্তর পাওয়া যায় নি। উত্তরগুলোর ধরন এ রকম—১. জানতাম কী হচ্ছে; ২. কী ঘটছে তার কিছু কিছু জানতাম, সবটা নয়; ৩. [জানতেন কিন্তু এখন বলছেন] কিছুই জানতাম না।

১৯৯৮ সালে পাকিস্তান সফরে যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের অধিকাংশ অবশ্য বলেছেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানতেন না ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কী ঘটছে। নিতান্ত 'দায়িত্ববান' ব্যক্তিরাও তা বলেছেন। এর কারণ কী? উত্তর হচ্ছে—১. রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচার; ২. সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ।

প্রশ্ন উঠতে পারে [১৯৭১ সালে] মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কি পাকিস্তানের 'মধ্যবিত্ত'র কাছে রেডিও বা ট্রানজিস্টার ছিল না। তবে, পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো 'রেডিও'তে

তারা আগ্রহী ছিল না। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান কওম নিয়ে বাঙালিরা যত চিন্তিত ছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানিরা কখনই তত চিন্তিত ছিল না। পাকিস্তান বলতে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানকেই বুঝত। পূর্ব পাকিস্তানকে নয়। এ বিষয়ে তাদের কোন দ্বিধা ছিল না দেখে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাদের নীতির কখনও পরিবর্তন হয় নি এবং ১৯৭১ সালে এ দেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালাতেও তাদের বাঁধে নি। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম দেখে আমাদের ভুগতে হয়েছে, মাশুল দিতে হয়েছে। তৎকালীন হানাদার বাহিনীর জনসংযোগ পরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) এ আর সিদ্দিকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল করাচিতে। তিনি বলছিলেন, সরকার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক তা প্রচারে ব্যগ্র ছিল এবং নিয়ত তা প্রচার করছিলও। ২৫ মার্চের ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী যে এত তীব্র হবে তা শাসকরা অনুধাবন করেন নি। সরকার একদিকে বলছিল সব স্বাভাবিক এবং এ খবরও দিচ্ছিল 'দুষ্কৃতিকারী'দের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে : [বা হয়েছে] এবং তাদের দমন করা হচ্ছে। এ প্রচারে যে স্ববিরোধিতা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। গড়পড়তা পশ্চিম-পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করেছে; সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে খাসা কাজ করছে এবং এ কারণে নিয়ত তারা প্রশংসার যোগ্য। সদ্য প্রকাশিত তাঁর বইয়ে সিদ্দিকি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—
"Most people in the west wing sang hosannas to him and wished him all the luck and success in his mission.

১৯৭১ সালে কী ঘটেছিল এখন তাদের তা জানতে হচ্ছে, এটি তাদের ভালো লাগার কথা নয়। রাজনীতিবিদরা, বিশেষ করে বেনজির ভুট্টো এখন তৎকালীন সামরিক কর্মকর্তাদের বিচার দাবি করছেন কারণ সামরিক বাহিনী ক্ষমতায়। এভাবে তিনি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত সংঘটিত করছেন। পাকিস্তানের বাঁ ঘেষা রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা অনেক আগেই, সেই ৭১ সালেই সামরিক অ্যাকশনের বিরোধিতা করেছিলেন সুতরাং ধরেই নিতে পারি এখন তারা সোচ্চার হবেন।

অন্যদিকে বাঙালিদের একটা কৌতূহল ছিল এই রিপোর্ট সম্পর্কে। অনেকে মনে করছেন, যাক এ রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, যে হত্যা লুট ধর্ষণ হয়েছে। কিন্তু অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু, পাকিস্তানের স্বীকার অস্বীকারে আমাদের কী আসে যায়? সারা বিশ্ব কী দেখে নি ১৯৭১ সালে কী ঘটেছিল বাংলাদেশে। হামুদুর রহমান কমিশন বরং সেই সব ঘটনাকে আড়াল করেছে। কিছু হত্যা লুট ধর্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। না করলে তো রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকত না। প্রকৃতপক্ষে হামুদুর রহমান কমিশন বাংলাদেশের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করে নি, সম্ভবও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দল আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিষোদগার করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে মিথ্যাবাদী রূপে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অন্ধ কিছু সেনা কর্মকর্তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টকে আমাদের এখানে বিবেচনা করা হয় নি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ।

দুই

সম্পূরক রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম—'পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত অফিসারদের মধ্যে মারাত্মক নৈতিক স্খলন'। মূল রিপোর্টে এ কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছিল জে. ইয়াহিয়া খান, জে. আবদুল হামিদ খান, মে. জে. খুদাদাদ খান, লে. জে. এ.এ.কে. নিয়াজি, মে. জে. জেহানজেব এবং ব্রিগেডিয়ার হায়াতুল্লাহ্‌কে। শেষোক্ত তিনজন ছিলেন বাংলাদেশে। এই তিনজনের নৈতিক স্খলনের প্রমাণস্বরূপ যে সব তথ্য তারা জেনেছিলেন সেগুলোই রিপোর্টে বিবৃত হয়েছে। ১৪ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে অভিযোগগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

১৪ থেকে ২০ অনুচ্ছেদ ব্যয়িত হয়েছে জেনারেল নিয়াজির অবৈধ ব্যবসা ও যৌন কাতরতা নিয়ে। পাকিস্তানের উচ্চতর মহলে বিষয় দুটি জানত। ঢাকা থেকে পান পাচার করতেন নিয়াজি। তাঁর যৌন কাতরতা নিয়ে অনেক কথা শোনা যাবে পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে। লাহোরে জেনারেল নিয়াজিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। স্বাভাবিক কারণেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে না বাচক উত্তর দিয়েছিলেন যেমনটি দিয়েছিলেন কমিশনের সামনে। কমিশন তার কথা বিশ্বাস করে নি। আমাদেরও বিশ্বাস করার প্রশ্ন আসে না। রাও ফরমান আলী রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, এপ্রিলের দিকে এক বেসামরিক কর্মকর্তার স্ত্রী নিয়াজির কাছে এসেছিলেন তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয় জানতে। নিয়াজি সেই অসহায় মহিলাকে অফিস কক্ষেই ধর্ষণ করেন। বিষয়টি সবাই তখন জানত।

৩৬ ডিভিশনের প্রাক্তন জিওসি মে. জে. মো. জামসেদের বিরুদ্ধেও তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার, এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে ঐ তহবিল অডিটের আওতার মধ্যে পড়ে না। একই অভিযোগ ছিল মে. জে. ফরমান আলীর বিরুদ্ধে। কিন্তু, তাকে এই অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার জেহানজেব আরবাবসহ ৩৬ ডিভিশনের বেশ কিছু অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে লুট ও ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ১,৩৫,০০,০০০ রুপি চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে।

কমিশনে বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন তা নতুন একটি বিষয়। এম.ভি. নকভী আমাকে বলেছিলেন, এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর অবধি পূর্ব পাকিস্তান থেকে সৈন্যরা মানি অর্ডারে বাড়তি [বেতনের বেশি] টাকা পাঠিয়েছে। এই টাকাটা তো এসেছে লুটপাট থেকে। ধরা যাক, একজন সৈন্য তার বেতন অনুসারে প্রতিমাসে পরিবারকে একশো টাকা পাঠাত। এপ্রিল থেকে দেখা গেল সে দুশো বা তিনশো টাকা পাঠাচ্ছে, পরিবার-পরিজনরাও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন টাকাটা কী ভাবে আসছে। লুটের খবর ওদের দফতরও জানত। হয়তো, ভাগ-বাটোয়ারার অংশ তারাও পেত। বা তাদের মনে হয়েছিল 'বিজিত দেশ'-এ লুট জায়েজ। ১৫ এপ্রিল (১৯৭১) নিয়াজী এক মেমোতে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা ধর্ষণ, লুট ও হত্যায় ব্যস্ত। এবং তাঁর ভাষায়—

> It is not uncommon in history when a battle has been lost because troops were over indulgent in loot and rape."

সুতরাং, কয়েকজন জেনারেল মাত্র নয়, সেনাবাহিনীর প্রায় সব সদস্য কোনো-না কোনোভাবে লুটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ অধ্যায়ের উপসংহারে কমিশনের বক্তব্য-

সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসাধুতা ও নৈতিক স্খলনের বিরুদ্ধে তদন্ত করার ইচ্ছে কমিশনের নেই। পাকিস্তানের মুসলিম সেনাবাহিনীর নৈতিকতা, ঐতিহ্য ইত্যাদি রক্ষা করতে হলে তাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানে লক্ষণীয় 'মুসলিম' শব্দটি। কারণ, ভারতীয়রা হিন্দু, বাঙালিরাও হিন্দু, তাদের সেনাবাহিনী বা মুক্তি ফৌজও হিন্দু। পাকিরা তো এদের থেকে আলাদা, মুসলমান। হামুদুর রহমান কোথাও এই প্রশ্ন রাখেন নি, মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিনা কারণে মুসলমানদের হত্যা, মুসলমান রমণীদের ধর্ষণ করতে পারে কি না?

তিন

মূল রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৪০টি অনুচ্ছেদ। অর্থাৎ নতুন সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে কমিশন বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি আলোচনা করেছে। এর কারণও আছে। কমিশন জানত, সারা বিশ্ব এই গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করছে। খুনি হিসেবে পাকিস্তানিরা পরিচিত হয়েছে। রিপোর্ট পড়লে বোঝা যায় কমিশন একটি বাতাবরণ তৈরি করতে চাচ্ছে। যাতে, বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে, একটি যুদ্ধ হলে তো কিছু লোক নিহত হবেই। তার জন্য তাকে গণহত্যা বলা যায় না। কমিশনের এই অধ্যায়টি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ের প্রতিটি বাক্য ও শব্দ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কমিশন পাকিদের হত্যাযজ্ঞ প্রায় অস্বীকার করেছে।

এই অধ্যায়ের শিরোনাম 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথিত নৃশংসতা'। লক্ষ্য করুন, 'কথিত' শব্দটি। অর্থাৎ এই নৃশংসতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পাকিস্তান বাহিনী যখন 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল তখন বিভিন্ন মহল থেকে তা বেশ সমালোচিত হয়েছিল। মূল রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫-৮ অনুচ্ছেদে তা বিবৃত হয়েছে। নতুন সাক্ষ্যের আলোকে সম্পূরক রিপোর্টে বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ্য 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি' শব্দ দুটি। দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সরকার আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। সে জন্য ব্যবহার হয়েছে 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি' শব্দ দুটি। এ শব্দ দুটি ব্যবহারের মাধ্যমে কমিশন ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী, এককথায় বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমিকা অস্বীকার করেছে।

এর পরের অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'আওয়ামী লীগের চরম পন্থীদের দুষ্কর্ম'। পুরো বাক্যটিই পক্ষপাতদুষ্ট। অর্থাৎ কমিশন পাঠকদের আগেই বলে রাখছে আওয়ামী লীগ দুষ্কর্ম করেছে। সাক্ষ্য প্রমাণের আগেই রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তৎকালীন পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক বা গণসংগঠন হিসেবে নয়। এর অর্থ এরা শত্রুপক্ষ এবং যেহেতু শত্রুপক্ষ সেহেতু তাদের সমস্ত কার্যকলাপই দুষ্কর্ম।

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে তা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কমিশনের মতে, ভুলে

যাওয়া উচিত হবে না জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ১ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা ভায়োলেন্স ও নিষ্ঠুরতার পথ বেছে নেয়। এ অভিযোগ করছে কমিশন। অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান বা সামরিক জান্তা যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের দাবি অস্বীকার করেছে তা মৌল বিষয় নয়। আওয়ামী লীগাররা কী ভায়োলেন্স বা নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল? আমরা কেন, সারা পৃথিবীর সেই সময়কার সংবাদপত্র দেখলে দেখা যাবে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর পর ঐ প্রথমবারের মতো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়।

অথচ, কমিশন বলছে, ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি, খুলনা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া, নওগাঁ, শান্তাহার ও অন্যান্য এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ চালায়। এ কাহিনীগুলো বর্ণনা করেছে ব্যাপক সংখ্যক বিহারি ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা যারা পালিয়ে এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের সেনা ইউনিটগুলোতে পশ্চিম-পাকিস্তানি অফিসারদের পরিবাররা পেয়েছে অমানবিক ব্যবহার এবং অনেক ('লার্জ নাম্বার') পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের হত্যা করেছে তাদের পূর্বতন বাঙালি সহকর্মীরা।

এ পরিপ্রেক্ষিত কমিশন একজন পাকি সাংবাদিক ও তার লেখা একটি বইয়ের উল্লেখ করেছে। সাংবাদিক, কমিশনের ভাষায় "renowned journalist of high standing"। নাম কুতুবউদ্দিন আজিজ। তার সম্পাদিত বইয়ের নাম 'ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার্স'। পূর্বাঞ্চল থেকে প্রত্যাগত বিহারি, পাকিস্তানিদের জবানবন্দি হচ্ছে বইটির ভিত্তি। আজিজ লিখেছেন, মার্চ-এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা সারা দেশে ১০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ লোক হত্যা করেছে। কমিশন কুতুবউদ্দিনের বইকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। এ বিশ্বাসযোগ্যতার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সেখানে বসবাসরত অবাঙালিদের পাকিস্তান ফেরৎ পাঠাতে চাচ্ছে যা তুলে ধরে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে।

এই ছোট অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়।

প্রথম, সারা বাংলাদেশ জুড়ে এতোসব ধ্বংসযজ্ঞ হলো কিন্তু বিদেশী কোনো পত্রিকা দূরে থাক, পাকিস্তানের কোনো পত্রিকাও খবরগুলো ছাপাল না! কেন?

কমিশন জানত, এই প্রশ্ন উঠবে। তাই, তারা উত্তর দিয়েছে, এ খবরগুলো ছাপা হলে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। সে কারণে তৎকালীন সরকার এসব সংবাদ প্রকাশিত হতে দেয় নি। কুতুবউদ্দিন আজিজও একই কথা লিখেছেন। সেই সঙ্গে তিনিও নাকি এ ধরনের সংবাদ শুনেছিলেন এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কর্মকর্তারা বলেছিলেন এ ধরনের সংবাদ ছাপা যাবে না। [এ নির্দেশ বাঙালি তথ্য সচিবের] কারণ—

> "It would exacerabate the current tension in the relations between the two wings," he argued, "and it would also under-

mine the prospects of a negotiated settlement with the Awami League." The argument had an element of sound logic and a humanitarian veneer. Consequently the news media in West Pakistan faithfully followed the federal governments instructions to suppress all news pertaining to the genocidal frenzy unloosed by the Awami League against the hapless West Pakistanis, Biharis and other non-bengalis in rebellion-hit East Pakistan."

মেনে নিলাম এই যুক্তি। তা বিদেশীরা কী করছিল বাংলাদেশে? তারা কেন সেই সব সংবাদ ছাপায় নি? আজিজ জানেন এ প্রশ্ন উঠবে, তাই এর উত্তরও তিনি দিয়েছেন তার বইতে। ১৯৭০ সালের সাইক্লোনের পর বিদেশীদের সমবেদনা ছিল বাঙালিদের প্রতি। আর আওয়ামী লীগের জনসংযোগ এতো চমৎকার ছিল যে বিদেশীরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আওয়ামী লীগের আর যত গুণই থাক জনসংযোগের গুণটি নেই। বরং, মানুষকে অযথা চটানোর গুণ যথেষ্ট। যা হোক আজিজের ভাষায়ই তার যুক্তি তুলে ধরছি—

"Many of the American Journalist in this motely crowd of foreign reporters (whose souls were saturated with compassion for the Bengali Victims of the November 1970 cyclone tragedy) were so charmed by the public relations operatives of the Awami League that they were just not prepared to belive that their darlings in this fascist organization could commit or instrigate the murder of the non-Bangalis."

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পড়ার পর অনেক খুঁজে পেতে আমি কুতুবউদ্দিন আজিজের সংকলনটি যোগাড় করেছি, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে করাচি থেকে। ঐ সময় ভুট্টো ক্ষমতার শীর্ষে। অবাঙালিদের ফেরত নেওয়ার প্রশ্নটি বারবার উঠছে। যুদ্ধবন্দিরা ফিরছে। বাঙালিদের প্রত্যাগমনও শুরু হবে। সব মিলিয়ে ১৯৭১-এর প্রশ্ন আবার বড় হয়ে দেখা গিয়েছিল পাকিস্তানে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কুতুবউদ্দিনের বই। কুতুবউদ্দিন যে বাঙালি বিদ্বেষী ও একদেশদর্শী ছিলেন তা তার বইয়ের উপশিরোনাম ও উৎসর্গ পড়লেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বইয়ের উপশিরোনাম—

"170 eye-witness accounts of the atrocities committed on West Pakistanis, Biharis and other non-Bengalis and pro-Pakistan Bengalis in 55 towns of East Pakistan by Awami League militants and other rebels in March-April, 1971."

৫৫টি এলাকার ১৭০ জন। গড়ে প্রতি এলাকায় তিনজন। সৈয়দপুর বা ঢাকা শহরের বর্ণনা যদি বিভিন্ন স্থানের মাত্র তিনচারজন দেয় তা কতোটা বিশ্বাসযোগ্য? আর সময়টা হচ্ছে মার্চ এপ্রিল। কুতুবউদ্দিন লিখেছেন, মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে শংকিত ৫০০০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি ও অবাঙালি চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে পৌঁছল করাচি। অথচ, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো পত্রিকায় তাদের দুরবস্থার কথা লেখা হলো না বরং স্থানীয় একটি পত্রিকা জানাল, যারা ফিরে এসেছে তারা জানিয়েছে, অবস্থা সেখানে স্বাভাবিক। এ

কথা লিখে ক্ষোভ জানিয়েছেন আজিজ। এখন ঐ ধরনের হত্যাকাণ্ড না ঘটলে কীভাবে তারা বলবে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে? বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে—

> "To those Hundreds of Thousands of Innocent men, women and children who were killed or Maimed in the Awami Leagues Rebellion and Genocide and the Mukti Bahinis Reign of Terror in East Pakistan in 1971."

কুতুবউদ্দিন অভিযোগ করে বলেছেন, মে মাসে ছয়জন বিদেশী সাংবাদিকের ডেসপ্যাচ ছাপা হয়েছিল যেখানে বিহারি হত্যার বিবরণ ছিল। কিন্তু বাঙালিদের সমর্থক মার্কিন, ভারতীয় ও বাঙালিরা বললেন, ওগুলো মিথ্যা। রিপোর্টে উল্লিখিত গণকবরগুলো বিহারিদের নয়, বাঙালিদের। ধর্ষিতা রমণীরা অবাঙালি নয় বাঙালি। কুতুবউদ্দিনের কাছে সেসব আলোকচিত্র পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে ধর্ষিতা মহিলারা অবাঙালি।

কুতুবউদ্দিনের কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে কার বক্তব্য? কার আবার, জুলফিকার আলী ভুট্টোর। ভুট্টোর 'দি গ্রেট ট্র্যাজেডি' প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে। কুতুবউদ্দিনের কাছে বইটির বক্তব্য সঠিক মনে হওয়ার কারণ—

> "Shed revealing light on the genesis of the East Pakistan crisis, the secessionist ambitions of the Awami Leagues leadership, Sheikh Mujibur Rahman's obdurate and uncompromising stance in the constitutional talks in Dhaka in the third week of March 1971 and the Pakistan Peoples Party's efforts for forging "a Grand Coalition of the majority parties of the two wings" within the framework of a single, united Pakistan. Mr. Bhutto's vindication of the constitutional stand and role of his party was forceful and logical. The Great Tragedy" deserved global circulation on a mass scale which to our loss, was then denied to it."

এই বক্তব্যের মূল নির্যাস হলো : আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব, শেখ মুজিবুর রহমানের একগুঁয়েমীর কারণে ১৯৭১-এর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনা নিরোধে পিপলস পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং ভুট্টো ও তার দলের ভূমিকা ছিল জোরালো এবং যুক্তিযুক্ত [শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে]।

সুতরাং এই বইয়ের অপক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ কথা কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। এবং কমিশন এ বইটিকেই বেছে নিয়েছিল ১৯৭১-এর সেনাবাহিনীর নৃশংসতার যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য। কমিশনের সঙ্গে ভুট্টোর জোরালো যোগাযোগ এ পরিপ্রেক্ষিতে অস্বীকার করা দুরূহ।

মার্চ-এপ্রিলে বিহারি হত্যা হয়েছিল না বাঙালি হত্যা? মার্চ, ১৯৭১ সালে লন্ডনের অবজারভারে সিরিল ডানের এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কার্ফু ভঙ্গের জন্য মানুষকে গুলি করা হচ্ছিল। এবং কার্ফু কারা ভঙ্গ করছিল? বিহারি না বাঙালিরা? ডান লিখেছেন—

> "Our correspondent puts the death toll at 'about 200' and says this relatively low figure is due to the restraint so far shown by the army, even though angry crowds are everywhere defying the

curfew imposed on the province. The Sheikh has appealed to his people to calmdown and to do nothing to aggravate the crisis unless they get his orders to behave differently."

বিহারি হত্যার প্রসঙ্গটা বিস্তৃত আকারে উল্লেখ করার কারণ আছে। সমস্ত পাকিস্তানিরা এ বিষয়টি বিশ্বাস করে কারণ ১৯৭১ সালে তাদের তাই বোঝানো হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

মার্চের শেষ সপ্তাহে আমি মিরপুর ছিলাম। বিহারিরা কীভাবে বাঙালিদের কচুকাটা করেছে তা আমরা দেখেছি। ঢাকায় [এবং মীরপুরেও] যারা ছিলেন তাদের কাছে কমিশনের বক্তব্য হাস্যকর মনে হবে না? বিহারিদের একটি বড় কলোনি ছিল সৈয়দপুরে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ.টি.এম. হামিদুর হোসেন তারেক 'জল ছবি' ৭১-এ লিখেছেন—

> "... ১৯৭১-এর দিনগুলোতে স্থানীয় বিহারিদের বাঙালি বিদ্বেষপ্রবণতা প্রকটভাবে দেখা দেয়। প্রায়ই কোনো-না কোনো অজুহাতে বাঙালি 'কতল' করার ফন্দি ওরা খুঁজে বেড়াত। এরই জের হিসেবে ৪ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে স্থানীয় বিহারিরা সৈয়দপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে মলমূত্র লেপে রাখে। পরের দিন, এই সংবাদ সব গলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লে সৈয়দপুরের বাঙালিরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি অন্যদিকে বিহারিরা পাল্টা মিছিল বের করে। শহরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়।" ২৫ মার্চ "গোপন সূত্রে খবর এলো অনেক বাঙালিকে রেলওয়ের ওয়ার্কশপের জ্বলন্ত বয়লারে পুড়িয়ে মেরেছে।
> ভোর রাতে বিহারিদের আক্রমণ এলো। ওরা বাড়ির প্রায় চতুর্দিক থেকে 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' বলে আক্রমণ করল। শটগান ও রাইফেলের অবিরাম গুলি চালাতে লাগল বাড়ি লক্ষ করে।"

এরপর আসে বিহারিদের পাকিস্তান চলে যাওয়ার প্রশ্ন। ১৯৭২ সাল থেকে তারা পাকিস্তান যেতে চাচ্ছে। যে বিহারিদের জন্য এতো দরদ সেসব সাংবাদিকদের তারা তাদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো সময় কিছু লেখেনি। পাকিস্তানের কোনো সরকারও তাদের নিতে চায় না। বাংলাদেশই তাদের মানবেতর জীবন থেকে বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানকে বারবার অনুরোধ করেছে এদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। আর কমিশন তার কী ব্যাখ্যা দিয়েছে?

এ পরিপ্রেক্ষিতে কুতুবউদ্দিন আজিজের বইয়ের বিবরণ যখন কমিশন 'অথেনটিক' (authentic) মনে করেন, বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে ১,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ বিহারি বা অবাঙালি হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ এবং এ কারণে সেনাবাহিনী কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তখন একজন বিচারক হিসেবে হামুদুর রহমানের [ও অন্য দুইজন বিচারক] নিরপেক্ষতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে।

চার

কমিশনের রিপোর্টে একটি মাত্র বইয়ের ওপর ভিত্তি করে কেন পটভূমিকা রচিত হলো? এর উত্তর বিচারকরাই দিয়েছেন। তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, উপযুক্ত যুক্তি তারা

পাকিস্তান বাহিনীর কথিত নৃশংসতা ও অন্যান্য অপরাধের যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য দেন নি, বরং একটি সঠিক বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যাতে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাবলি বিচার করা যায়। ঘটনাবলির একটি হলো আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতিকারীদের [আগে বর্ণিত] আচরণ ক্ষুব্ধ করেছিল পাক-বাহিনীকে। আওয়ামী লীগ বা মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তাদের যে অজ্ঞতা পাহাড় প্রমাণ তা বোঝা যায় ভুট্টোর কন্যা বেনজীর ভুট্টোর কথায়। করাচিতে তার সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি বলছিলেন :

"বাবা মার্চ মাসে আলোচনার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। যে হোটেলে ছিলেন মুক্তিবাহিনী তা সিল করে দিয়েছিল।"

"সে সময় মুক্তিবাহিনীর সৃষ্টি হয়নি," জানাই আমি, "ওরা ছিল পাকিস্তানি।"

"ওরা পাকিস্তানি!" খানিকটা বিব্রত হয়ে বললেন বেনজীর, "আমাদের ধারণা ছিল তারা মুক্তিবাহিনীর। আসলে, আমি বলতে চাই পাকিস্তানি সৈন্যরা উধাও হয়ে গিয়েছিল আর ...।"

"আপনি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কথা বলছেন?" জিজ্ঞেস করি আমি।

"তা নয়, আমি সশস্ত্র সামরিক লোকজনের কথা বলছি।"

"এরকম সশস্ত্র লোকের অস্তিত্ব তখন ছিল না," শান্তস্বরে জানাই আমি।

বিব্রত বোধ করে প্রসঙ্গ পাল্টালেন বেনজির।

আরো আছে। পাকিস্তানি বাহিনীকে অপমান বা 'হিউমিউলেট' করা হয়েছে। এটিই মূল বক্তব্য। আল্লাহর পর জমিনে তো মিলিটারি, তাদের অপমান করেছে বাঙালিরা। কীভাবে? ক্যান্টনমেন্টে কোনো ঠিকাদার খাবার দিচ্ছিল না। সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে আসতে পারছিল না। তাদের সাথীদের অপমান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারণ ছাড়া হত্যা করা হচ্ছিল। কমিশনের ভাষায়—"

> "... but were also subjected to the severest of humiliations. They had seen their comrades insulted, deprived of food and ration and even killed without rhyme of reason."

প্রশ্ন হচ্ছে ২৫ মার্চের আগে পাকি সৈন্যদের কোথায় হত্যা করা হয়েছে? বরং, পাকি সৈন্যদের গুলিতে নিরস্ত্র বাঙালিরা নিহত হয়েছে। কমিশন উল্লেখ করেছে [চতুরতার সঙ্গে এখানে কোনো সময় উল্লেখ করা হয়নি] অনেক ইউনিটের পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও তাদের পরিবার পরিজনদের পাইকারিভাবে হত্যা পাকিস্তানি বাহিনীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারাও তো মানুষ, কমিশনের ভাষায়, "আফটার অল হিউম্যান"।

অর্থাৎ পাকিস্তানের অপরাধ বর্ণনার আগে কমিশন সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখছে। এর অর্থ পাকি সৈন্যরা কিছু কাজ করেছে কিন্তু কেন করেছে? কারণ, তারা তো মানুষ। এই পটভূমিকার পর তারা অপরাধীদের অভিযোগগুলোর বিচার করেছে।

প্রায় সব পাকিস্তানিই এ কথা বিশ্বাস করে। আরো বিশ্বাস করে, ভারত [হিন্দু] পাকিস্তানকে [মুসলমান] ভাঙার জন্য কাজ করেছে দীর্ঘ দিন, বাঙালিরা ছিল হিন্দুঘেঁষা। অর্থাৎ, এদের বিরুদ্ধে জেহাদ উত্তম। আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতিকারীদের বাড়াবাড়ি না করলেও চলত [অর্থাৎ ভুট্টোর সঙ্গে সমঝোতা করা উচিত ছিল, না করাটাই বাড়াবাড়ি]।

এসব বিষয়ের ইঙ্গিতও আছে কমিশনে। কমিশন বলতে চেয়েছে, এ সব কিছুই পটভূমি তৈরি করেছে। এবং সৈন্যদের মন-মানসিকতায় প্রভাব ফেলেছে সেই পটভূমিকা।
উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপের বিবরণ উদ্ধৃত করছি।
পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ লেঘারিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসত এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো তাহলে কি সংকট অতিক্রম করা যেত?
"আমার মনে হয়", লেঘারি উত্তর দিলেন, "কারণ ফেরার পথ আর তখন ছিল না। পাকিস্তানি আর্মি অ্যাকশান, তারপর পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়েছে। হয়েছে গৃহযুদ্ধ, ভারতের হস্তক্ষেপ। সেনাবাহিনী অ্যাকশনে গেছে ঠিকই, তবে পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে ঐ অ্যাকশনে যেতে। কারণ, মুক্তিবাহিনীর তখন আবির্ভাব হয়েছে, সেনাবাহিনীর অ্যাকশনে না গিয়ে কি উপায় ছিল?" লক্ষ্য করুন ২৫ মার্চ আর্মি অ্যাকশনে গেছে। মুক্তিবাহিনীর আবির্ভাব আরো মাসখানেক পরে। তাহলে কী আর্মি মে মাসের আগে অ্যাকশনে যায় নি?
জেনারেল নিয়াজী জানালেন এক সাক্ষাৎকারে, "মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা যখন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করলেন তখন ইয়াকুব নীরব ছিলেন। তাঁর উচিত ছিল অংকুরেই সব বিনাশ করে দেয়া। ... এরপর টিক্কা পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। তখন বাঙালিরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করছে, উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা চলছে। ... টিক্কা আসার পর গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেলেন মুজিব ২৫ তারিখ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তাই টিক্কা কঠোর অ্যাকশন দেন।"
প্রখ্যাত সাংবাদিক খালেদ আহমদ আমাকে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের ডানপন্থী মানসিকতা কখনও বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি এবং করেও না। এদের কাছে ১৯৪৭-এর পর আর কোনো ইতিহাস নেই। আর এই মানসিকতার কেন্দ্রস্থল পাঞ্জাব। ... শাসকরা সব সময় মনে করেছে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে ডুবিয়েছে, সুতরাং সে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানকার ইতিহাসগুলোতে সে ধারণাই বিধৃত হয়েছে।"
লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী আলী কাজেম বলেছিলেন, "আমার তখন মনে হয়েছিল, মুক্তিবাহিনীর ব্যাপার-স্যাপার বোধহয় ঠিক নয়, আমার কেন, এখানকার অনেকেরই সে মত ছিল।"
বেনজীর ভুট্টোর মতে, "আমাদের ধারণা ভুল হতে পারে, কিন্তু আপনাদের ওখানে যে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন চলছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। অনেকে ভেবেছিলেন, সামরিক অ্যাকশন নেয়া হলে দম ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। কিন্তু কী হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি নি।"
সাংবাদিক এম.ভি. নকভি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল ঢাকায়। তাঁর ভাষায়, "একটি ঘটনার কথা বলি। আমাদের তথাকথিত একটি রিফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে রাখা হয়েছিল বিহারিদের। বাঙালিদের অত্যাচারের অনেক কথা শোনানো হলো।

কমান্ডার বললেন, এ সব কথা শুনতে শুনতে যখন আমার রাগ লাগে, ক্লান্ত লাগে তখন গ্রামে গিয়ে কিছু মানুষ মেরে আসি।"

এ বিষয়ে ভুট্টোর ঘনিষ্ঠজন ও একসময়ের মন্ত্রী রফি রাজা যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "উই ডিডনট ওয়ান্ট টু নো অর উই ডুনট নো—যেভাবেই নেন। পিপলস পার্টির লোকেরা ভেবেছিল, আর্মি অ্যাকশনের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেঙ্গলিস কুড বি সর্টেড আউট। কিন্তু হয় নি। তবে এ ঘটনায় নো বডি ইন দা আর্মি রিগ্রেটেড ইট।" তারপর আপন মনেই বললেন, "উই হ্যাভ এ ভেরি ব্রুটালাইজড সোসাইটি আফটার দ্যাট।"

এ কথা যে সত্যি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হামুদুর রহমান কমিশন তার একটি প্রমাণ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণত যে সব অভিযোগ করা হয় কমিশন তারপর সেগুলো উল্লেখ করেছে—

১. ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে শক্তি প্রয়োগ ও গুলি ব্যবহার করা ["ইউস অব ফোর্স অ্যান্ড ফায়ার পাওয়ার"]।
২. গ্রামাঞ্চলে নির্বিচারে লুট ও খুন ["সেন্সলেস অ্যান্ড ওয়ানটন"]।
৩. নিরস্ত্র বা বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে ইবি আর, ইপি আর, পুলিশ হত্যা।
৪. সামরিক আইন কার্যকর করার সময় বেসামরিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া।
৫. ইচ্ছাকৃত প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তান বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের বিরাট সংখ্যক মহিলা ধর্ষণ।
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা।

এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি আছে কী না কমিশন এরপর তা বিচার বিশ্লেষণ করেছে। সাক্ষীসাবুদে অনেকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন, বলেছেন লুট ধর্ষণের কথা। হিন্দুদের হত্যার জন্য মৌখিক আদেশ দেয়া হয়েছিল তাও কেউ কেউ বলেছেন। রাও ফরমান আলী যে 'সবুজ লাল করে দেওয়ার' কথা নোটে লিখে রেখেছিলেন সে প্রসঙ্গও এসেছে।

জেনারেল নিয়াজী যেমন বলেছেন, কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। রাও ফরমান আলীও বলেছেন, লুট, ধর্ষণ ও হত্যা ইত্যাদির কথা শুনেছেন এবং লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন ভালো ব্যবহার করে মানুষের হৃদয় জয় করার। এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্যটি লক্ষ্য করার মতো—"I wrote out an instruction to act as a guide for decent behaviour and recommended action required to be taken to win over the hearts of the people." লুট, ধর্ষণ, হত্যা বন্ধের জন্য সুস্পষ্ট করে কিন্তু লিখিত কোনো নির্দেশ দেন নি।

ব্রিগেডিয়ার শাহ আবদুল কাসিম বলেছে, ২৫ মার্চ ঢাকায় কোনো সংঘর্ষ হয় নি। সে রাতে অত্যাধিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধান্বিত হয়ে তারা 'অপারেশন' চালিয়েছে। বিগ্রেডিয়ার মিয়া তাসকিনউদ্দিন বলেছেন, দুষ্কৃতিকারী দমনের অছিলায় অনেক জুনিয়র অফিসার নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল।

মেজর জেনারেল নজর হুসাইন শাহ, কর্নেল বোখারী, লে. কর্নেল নঈম স্বীকার করেছেন, বাঙালিদের তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। রংপুরে দুইজন অফিসারসহ ৩০ জনকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সময় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ মারা পড়েছে। লে. কর্নেল মনসুরুল হকের সাক্ষ্যটি বেশ চমকপ্রদ। তিনি বলেছেন, যে কোনো বাঙালিকে যদি মুক্তিবাহিনী বা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে সন্দেহ করা হতো তাহলে তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হতো। বিনা বিচারে হত্যার সাংকেতিক নাম ছিল বাংলাদেশে পাঠানো। ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মীর মোহাম্মদ আশরাফও একই কথা বলেছেন, তার সাক্ষ্য সামগ্রিক অবস্থা বা পাকিদের ভূমিকা কী ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"There was no Rule of Law in East Pakistan. A man had no remedy if he was on the wanted list of the Army ... Army officers who were doing intelligence were raw hands, ignorant of the local language and callous of Bengali sensibilities."

ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক মে মাসে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন হিন্দুদের হত্যা করার জন্য। বলেছেন লে. কর্নেল আজিজ আহমদ খান।

এইসব সাক্ষ্যসাবুদ সত্য যদিও তা ১৯৭১-এর ভয়াবহতা তুলে ধরে না। একটা কথা আমরা ভুলে যাই, পশ্চিম পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা কখনও বাঙালিদের মানুষ হিসেবে গণ্য করে নি। করাচির একজন নামকরা আলোকচিত্র শিল্পী ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ আন্দোলনের নেতা আমাকে বলেছিলেন, "আসলে মনোভাবটা তখন কী রকম ছিল বলি। ড. মুবাশ্বির হাসান ছিলেন ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ। ফেডারেল মন্ত্রী হয়েছিলেন তার সময়ে। ২৫ মার্চ ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন ঢাকায়। ঢাকা থেকে ফেরার পরপর তার সঙ্গে আমার দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী, কী হচ্ছে সেখানে? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, '৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্য লাখ খানেক মরেছে, এখনও না হয় মরবে, তাকে কী?"

এ মনোভাব তখন নয়, পরবর্তীকালেও ছিল। না হলে ৩০নং অনুচ্ছেদে কী ভাবে কমিশন মন্তব্য করে সে সব অভিযোগ [হত্যা, লুট, ধর্ষণের] করা হয়েছে তা চূড়ান্ত নয়। শেষোক্ত শব্দটি লক্ষণীয়। তারপর বলা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানি ব্যক্তিদের নিরস্ত্র করার সময় হয়তো আরো কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং, সেনা কর্তৃপক্ষের উচিত একটি তদন্ত করে সত্য নিরূপণের মাধ্যমে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ।

পাঁচ

কতো মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে? এ ক্ষেত্রে কমিশন চূড়ান্ত ভণ্ডামীর পরিচয় দিয়েছে। আশ্রয় নিয়েছে চতুরতার, বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে বিশ্ববাসীকে [যদি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় সে পরিপ্রেক্ষিতে], আশ্বস্ত করতে চেয়েছে জেনারেল ও রাজনীতিবিদদের।

এ প্রসঙ্গে একই অধ্যায়ের ৩১নং অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি তুলে ধরছি।

হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিমাণ নির্ধারণ করাটা কঠিন। কারণ ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করে। সেখানে আওয়ামী লীগের চরমপন্থী এবং পরে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংস ও হত্যার সঠিক পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আরো মনে রাখতে হবে, ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনী অ্যাকশনে যাওয়ার পর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও আওয়ামী লীগ 'স্পনসরড' মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত গ্রামগুলোতে হত্যা, ধর্ষণ, লুট চালিয়েছে। তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছে। আরো চেয়েছে যারা পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের শায়েস্তা করতে। সুতরাং, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর কথিত নৃশংসতার পরিমাপ করতে গেলে সম্পূর্ণ সময়ে আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা যে মৃত্যু ঘটিয়েছে ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং তাদের ভাইবোনদের ওপর যে নৃশংসতা দেখিয়েছে তাও মনে রাখতে হবে। কমিশনের ভাষায়—

> "In any estimate of the extent of artocities alleged to have been committed on the East Pakistani people, the death and destruction caused by the Awami League militants througout this period and the atrocities committed by them on their own brothers and sisters must, therefore, always be kept in view."

এখানে বাক্য গঠন ও শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ১লা মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কতদিন আওয়ামী লীগ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে আর পাকিস্তান চালিয়েছে কতদিন? বাক্যটি এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, পড়লে মনে হবে সারাটা সময় আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা মারমার কাটকাট করেছে, কোনো একটা সময় পাকিরা এসেছিল, অর্থাৎ তাদের ভূমিকা গৌণ।

২৫ মার্চের পর আওয়ামী চরমপন্থী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা [অর্থাৎ হিন্দুরা] লুটপাট, হত্যা করেছে। এবং পাকি বাহিনীর নৃশংসতা হচ্ছে কথিত। কমিশন এ ভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ, মুক্তিবাহিনীর ওপর দায় চাপিয়েছে বাংলাদেশের গণহত্যার। কোনো সভ্য দেশের সভ্য বিচারক বা বিচারকবৃন্দের এমন কাজ করা সম্ভব কিনা জানি না।

পাকিস্তানে যদি কেউ কোন কিছু না-ই জানবে তাহলে ১৯৭১ নিয়ে পাকিস্তানে প্রতিবাদ হয়েছিল কেন? এবং কী নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছিল? প্রতিবাদ কম হতে পারে, প্রতিবাদে সোচ্চার সাধারণ মানুষ বা রাজনীতিবিদের সংখ্যা কম হতে পারে কিন্তু হয়েছিল তো। আমরা অবশ্য সে সম্পর্কে কম জানি। আর নীতি নির্ধারকরা যদি কিছু নাই জানেন তবে নিয়মিত পাকি সৈন্যদের ঢাকায় পাঠান হচ্ছিল কেন? ইয়াহিয়া খানই বা কাদের মে মাসে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন? উপনির্বাচনই বা কেন হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে? এবং কেন-ই বা বেসামরিক গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে পাকিস্তানে প্রতিবাদের ধরনটি উল্লেখ করছি। এ ধরন দেখলেই বোঝা যাবে, লুট, ধর্ষণ, গণহত্যার বিষয়টি নীতিনির্ধারক বা রাজনীতিবিদদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না।

১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী সংঘটিত কার্যাবলির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

সাহিত্যিক আহমদ সেলিম ইসলামাবাদে আমাকে বলেছিলেন, ২৭ মার্চ লাহোরে সূফি লাল হুসেইনের মাজারে মিছিল করে যাওয়ার সময় তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আহমদ সেলিম লিখেছিলেন কবিতা—

"হে লাল হুসেইন! লালনের ভাই
জেগে ওঠ! বাংলায় হত্যা করা হচ্ছে তোমার মধুদের
বারবার তারা গুলিবিদ্ধ করেছে লালনের গান
আটচল্লিশে, বায়ান্নতে এবং তারপরেও
আর আজ প্রজ্বলন্ত
রবি ঠাকুর ও নজরুলের গান
জেগে ওঠ লাল হুসেইন, মধু আজ নিঃসঙ্গ,
আলিঙ্গন করো তাকে
তার দিকে ছুটে আসা বুলেটের মোকাবিলা করো
তোমার গান দিয়ে
জেগে ওঠ লাল হুসেইন
বাংলার ভাইরা এগিয়ে আসছে
জেগে ওঠ কবি, কোথায় তোমার বন্দুক?"

[মফিদুল হক অনূদিত]

আহমদ সেলিম ও তাঁর বেশ কিছু সাথিদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেলিম জানিয়েছেন, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তানে অনেকে কবিতা/গান লিখে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন যার সংকলন করলে বেশ মোটাসোটা একটি বই হবে। কিন্তু কেউ এর খবর জানে না। বিখ্যাত কবি হাবিব জালেবি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাকে জেলে পোরা হয়।

লাহোরের তাহেরা মজহার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী মিলে মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিবাদও কিছু হয়েছে যা আমাদের জানা নেই। যেমন ড. তারিক রহমান। ১৯৭১ সালে ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাডেট। তিনি কমিশন পাওয়ার পরপর পদত্যাগ করেন। কোর্ট মার্শাল হতো তাঁর। কিন্তু বাবা ব্রিগেডিয়ার হওয়ায় বেঁচে যান। এখন ইসলামাবাদের কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল ইসলামাবাদে। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, এতে সাহসের কোনো ব্যাপার নেই। মানবিকতার বাইরে আমি যেতে পারি না। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তাই সংহতভাবে লিখেছেন আহমদ সেলিমের একটি বইয়ের ভূমিকার উপসংহারে—"আসুন আমরা সবাই মিলে লিখি, কথা বলি, ছবি আঁকি—স্মরণ করি ১৯৭১ সালকে এর সকল নির্মম বাস্তবতাসমেত। আসুন আমরা ক্ষমা চাই মৃতদের কাছে। আসুন আমরা সচেষ্ট হই সমঝোতা ও ক্ষমা অর্জনে। এতে করে অতীত পাল্টে যাবে না তবে হয়তো ভবিষ্যৎ বদলাতে পরে। এটা সহায়তা করবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন গড়তে এবং আরো যা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের সাহায্য

করবে আরেকটি বাংলাদেশ সৃষ্টি পরিহারে।" বর্তমান পাকিস্তানে যে-সহিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এ মন্তব্য করেছেন।
সাংবাদিক আই এ রেহমানের কথা আগে বলেছি। ঐ সময় যেমন, এখনও তেমন কঠোর ভাষায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, হিন্দু ও ব্রিটিশরা যে পরিমাণ মুসলমান হত্যা করেছে আমরা মুসলমান হিসাবে তার থেকে বেশি মুসলমান হত্যা করেছি। কথাটি সত্য। কিন্তু এই সত্য বলার সাহস আছে কয়জনের?
আই এ রেহমান বলেন, "অনেকে বলে ১৯৭১-এ কী হয়েছে এখানকার বাসিন্দারা তা জানত না। এগুলো খোড়া যুক্তি। কমবেশি তারা জানত। কারণ তারা Supported the massacre of their compatriots in the eastern wing. With a very few honourable exceptions, the West Pakistan population, led by politicians, academics, bureaucrats and opinion makers, choose to back the senseless carnage, and there were many who fought over the spoils."
সুতরাং, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশে কী ঘটছে তা জানতেন না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য না। জানতেন, কিন্তু, কমিশনে তা তিনি উল্লেখ করতে পারেন না। বরং হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা হ্রাস এবং তাকে ঘিরে বাতাবরণ তৈরি করাই ছিল কৌশল। সে প্রচেষ্টাই তিনি নিয়েছেন রিপোর্ট রচনার সময়।
এই অধ্যায়ের উপসংহারে কমিশন বলছে, (অনুচ্ছেদ ৩৮) ২৫ মার্চের সময় এবং পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনী যে অতিরিক্ত করেছে তা ঠিক তবে ঢাকা কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্ক যে বিবরণ ও পরিসংখ্যান বলে তা অতিরঞ্জিত ও কল্পনাপ্রসূত। কথিত কিছু ঘটনা ঘটেই নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কল্পনারঞ্জিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বিশ্বের সহানুভূতি অর্জন করা যায়। আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে প্রবলভাবে প্ররোচনা যুগিয়েছে। তা ছাড়া কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য কঠোর সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও কমিশন মনে করে পাকিস্তানি বাহিনী অতিরিক্ত যা করেছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং, যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।
মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আসল ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি পাকিস্তানিরা এড়াতে চায়। ভান করে যে, তারা কিছুই জানত না। তৎকালীন পাকিস্তানের তথ্য সচিব রোয়েদাদ খান, নিরাপত্তা পরিষদের সচিব জেনারেল উমর, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো, পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজী—সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, ২৫ মার্চ বা তার পরবর্তীতে বাংলাদেশে কি ঘটেছে তা তারা জানেন কী না? সবাই অস্বীকার করেছেন বা এড়িয়ে গেছেন।
জে. উমর ছিলেন নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব, ইয়াহিয়ার দক্ষিণ হস্ত। ২৫ মার্চ ঢাকায় ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কয়েকবার এসেছেন ঢাকায়। করাচিতে তাঁর বাসভবনে গেলাম দেখা করতে। আমাদের দেখে তিনি এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যাতে মনে হলো তিনি হারানো স্বজনদের খুঁজে পেয়েছেন।

বললেন, আমাদের অর্থাৎ বাঙালি ভাইদের জন্য তিনি এতক্ষণ কোরান শরীফ পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। কী থেকে যে কী হয়ে গেল।
জিজ্ঞেস করলাম, "২৫ মার্চ সম্পর্কে কিছু জানেন?"
নিষ্পাপ ভঙ্গিতে বললেন, "না"।
"২৫ পরবর্তী ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছু জানেন?"
"না।"
"আপনি নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব ছিলেন। এবং আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন যে, কিছুই জানেন না।"
"আমি কাউন্সিলের সামান্য সদস্যসচিব ছিলাম। কাউন্সিলের কোনো মিটিং-ই ডাকা হতো না, কোনো ক্ষমতাও ছিল না।"
রফি রাজা পিপিপি করতেন এবং ঘনিষ্ঠ ছিলেন ভুট্টোর। ২৫ মার্চ ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন ঢাকায়। করাচিতে তাঁর বাসায় আলাপকালে এ প্রসঙ্গ এল। তিনি বললেন, "উমর জানে না মানে? ঢাকা থেকে আমরা রওনা হয়েছি। প্লেনে ঢুকল সে একটা ভাব নিয়ে। ভুট্টো বা আমাকে চেনে বলে মনে হলো না। কাউকে দেখেও দেখল না। ঢাকায় কী হয়েছে সে জানে না?"
আলতাফ গওহর ইসলামাবাদে তাঁর বাসায় চা খেতে খেতে বললেন, "শোনেন, রোয়েদাদ এবং উমর প্রায়ই যেত ঢাকায়। ফিরে এসে, বিকেলে আমার বাসায় আড্ডা দিত। কী ঘটছে ঢাকায় তার বর্ণনা দিত। আপনারা রোয়েদাদকে আমার রেফারেন্স দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন এ কথা সত্য কি না?"
ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকিও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। ২৫ মার্চের আগে এবং পরে জেনারেল উমরের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। লিখেছেন তিনি, এবং বলেছেনও যে, উমর ছিলেন ইয়াহিয়ার প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা। ২৫ মার্চের ঠিক আগে, ঢাকার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিদ্দিকিকে বলেছিলেন, তুমি কী ধরনের পাবলিক রিলেশনস ডিরেক্টর যে "Can't even control these bastards."
জে. ফরমান আলি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বই লিখেছেন। [ঢাকার ইউপিএল-এর অনুবাদ প্রকাশ করেছে] তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁকে গণহত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, "গণহত্যা? না, গণহত্যা হয়নি।"
"আচ্ছা, মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানুষ মারা গেছে?"
"গেছে।"
"কত জন মারা যেতে পারে বলে আপনার ধারণা, ত্রিশ-চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার?"
"হ্যাঁ, তা হবে।" বলেই তিনি বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।
"জেনারেল," বললাম, আমি "পঞ্চাশ হাজার লোক হত্যা গণহত্যা নয়?"
নিয়াজির সঙ্গে কথা বলে মনে হলো তিনি গণহত্যা বিষয়টিই বুঝছেন না। মানুষ মারা গেছে কি না সে সম্পর্কেও জানেন না। খুব সম্ভব এ ভাবটি লোক দেখানো। কারণ,

তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি ২৫ মার্চের ঢাকা অভিযানকে হালাকু খানের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রোয়েদাদ খান ছিলেন তখন তথ্য সচিব এবং প্রভাবশালী। পরে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বাংলাদেশে কী ঘটছে তা বহির্বিশ্বে জানাবার ভার ছিল তার ওপর। ২৫ মার্চ তিনি ছিলেন ঢাকায়।

ইসলামাবাদে তার সঙ্গে দেখা করি। না। তিনি কিছুই জানেন না। "না, আমি জানি না কী হয়েছে। অন্তত রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত আমি কোনো বন্দুকের আওয়াজ শুনি নি।"

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি ২৫ মার্চের ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা হয় এবং ধরে নেয়া হয় পাকিস্তানের খারাপ ইমেজ তারাই সৃষ্টি করেছে এ কারণে। কিন্তু, একদিক থেকে, লিখেছেন তিনি, বহিষ্কার করে ভালোই হয়েছিল। কারণ, "Dhaka, on March 26 and for several day to come, was virtually a media men's paradise. It was the picture of death and desolation. Every dead body by the road side, every bombed out building, every barricade, every tank, truck and Jeep, was a story for the avaricious TV man and news photographer, and they missed nearly all that."

এবার দেখা যাক, মূল বিষয় গণহত্যা সম্পর্কে কমিশন কী মনে করে?

কমিশনের মতে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মতে পাকিস্তানি বাহিনী ত্রিশ লক্ষ বাঙালি ও দুই লক্ষ রমণী ধর্ষণ করেছে। এ সংখ্যা যে অতিরঞ্জিত তা বোঝাবার জন্য যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষেও এতো হত্যা ও ধর্ষণ সম্ভব নয়। কারণ, পাকিস্তানি বাহিনী সব সময় মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও পরে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ব্যস্ত ছিল তারা যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা ও ৭ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর কাজে। সুতরাং ঢাকার কর্তৃপক্ষ গণহত্যা ও ধর্ষণের যে হিসাব দিচ্ছে তা হাস্যকর ও কল্পনারঞ্জিত ['Fantastic and fanciful]।

তাহলে, হত্যার পরিমাণ কতো? কমিশন অনেক ভাবনা চিন্তা করে জানাচ্ছে, সদর দফতর যে হিসাব দিয়েছে সেটিই গ্রহণযোগ্য, নিহতের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের বেশি নয়।

এ বিষয়ে বাকবিতণ্ডা পাকি ও বাংলাদেশী পাকিরা করতে পারে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই তা নিয়ে বিতর্ক করবে না। তবুও নতুন প্রজন্ম ও যারা বাংলাদেশের পাঠক নয় তাদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি উদাহরণ দেব।

সম্প্রতি, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইন্সটিটিউট থেকে আমরা খুলনার চুকনগর গিয়েছিলাম তথ্য সংগ্রহে। সেখানে আমরা গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া দুশো জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। চুকনগরে ১৯৭১ সালের মে মাসে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টায় কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এতো কম

সময়ে এতো মানুষ হত্যার নজির বিরল। খালি কী ঢুকনগরে? বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে, বড় শহরে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড হয়েছে।

বেশ কিছু দিন আগে মাঠ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য বরিশালের স্বরূপকাঠির গভীর এক গ্রামে গিয়েছিলাম। ছোট গ্রাম। কয়েক ঘর চাষী বাস করেন। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ১৯৭১ সালে পাকিরা এখানে এসেছিল কিনা? তারা জানালেন, গানবোটে করে এসেছিল এবং মানুষ হত্যা করেছিল। আমি যখন ঐ অঞ্চলে যাই তখন যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তারপরও সে গ্রামে পৌঁছতে আমার বেশ সময় লেগেছে। ১৯৭১ সালে সে গ্রামে পৌঁছা আরো কষ্টকর ছিল। তারপরও পাকিরা সেই গ্রামে গিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল। অর্থাৎ, বাংলাদেশের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে পাকি ও তাদের অনুচররা গিয়ে মানুষ হত্যা করেনি। ৬৪ হাজার গ্রামে গড়ে ১০ করে হত্যা করলেও তো সে সংখ্যা হয় প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। আমাদের হিসাব বাদ দিই, রাও ফরমান আলীও তো পঞ্চাশ হাজারের কথা স্বীকার করেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানের দুই নম্বর ব্যক্তিটিই যদি একথা বলে তখন কমিশনের ২৬০০০ সম্পর্কে আর কী বলব?

এখানে আরো উল্লেখ্য, কমিশন কিন্তু বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য প্রথমেই একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলেছে গণহত্যার বিষয়টি কল্পনারঞ্জিত। বিচারের শুরুতেই রায় দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানি বিচারকদের এটি অবশ্য একটি ঐতিহ্য।

ছয়

তারপর আসে ধর্ষণের বিষয়। কমিশন বলছে, শেখ মুজিব যে বলছেন, বাংলাদেশে দু'লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছে তা ভ্রান্ত। কারণ, গর্ভপাত ঘটানোর জন্য ১৯৭২ সালে ব্রিটেন থেকে যাদের [ডাক্তারদের দল] তিনি এনেছিলেন তারা একশো বা তার কিছু বেশি গর্ভপাত ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ শেখ মুজিব যে ত্রিশ লক্ষ হত্যা ও দুই লক্ষ ধর্ষণের কথা বলেছেন তা মিথ্যা।

যৌন নির্যাতনের বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই কম পাওয়া গেছে। কারণ নির্যাতিত কোনো মহিলা তার ওপর নির্যাতনের হুবহু বর্ণনা দিতে পারেন? তবুও কোনো কোনো বিবরণে এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। রাবেয়া খাতুন নামে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এক সুইপার এ রকম একটি বিবরণ দিয়েছেন। তাঁকে ২৬ মার্চই হানাদার সেনারা খুঁজে পায় এবং ধর্ষণ শুরু করে। পুলিশ লাইনের ময়লা পরিষ্কার না হতে পারে বিধায় তাকে আর প্রাণে মারা হয়নি। তিনি বলেছেন, এরপর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিশোরী, তরুণী, মহিলাদের দলে দলে ধরে আনা হতে লাগল পুলিশ লাইনে এবং—

"এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙালি নারীদের ওপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবি সেনারা কুকুরের মতো জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগল। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে

ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। ... উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা এই নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই—আমি দেখলাম পাকসেনারা সেই মেয়েদের ওপর পাগলের মতো উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারালো দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্যত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

সে সকল বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করল দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবি সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দু'জনে দু'পা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম। পাঞ্জাবিরা যে কোনো কুকুরের মতো মদ খেয়ে সবসময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল।

শুধু সাধারণ পাঞ্জাবি সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবি সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মতো হয়ে দুই হাত বাঘের মতো নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মহিলাদের ওপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণকাজে লিপ্ত থাকত। কোনো মেয়ে, মহিলা যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্য মেয়েরা আরো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করত।

যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের হাসি-তামাশায় দেহ দান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের ওপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মতো লাথি মারতে মারতে, পশুর মতো পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চারতলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবি সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভিতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যেত। এরপর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়—প্রতিদিন পাঞ্জাবিরা সেখানে যাতায়াত করত সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস ব্যাটন দিয়ে উন্মত্তভাবে

আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোন যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত বক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করত। কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে, শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবি সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত।

প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না একমুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করত—আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতাম।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙালি যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবী সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায়ও সেখানে সেসব বন্দি মহিলাদের পুতগন্ধ, প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপরতলা হতে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙালি যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবি সেনারা প্রহরা দিত। কোনো বাঙালিকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনো সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।"

বিস্তারিত বিবরণটি উদ্ধৃত করলাম একটি কারণে। যারা সমন্বয়ের রাজনীতি করেন, যেসব যুবক বলেন, ১৯৭১ সালে কী হয়েছিল কে জানে বা যেসব তরুণী স্টেডিয়ামে প্ল্যাকার্ড বহন করে পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে বিয়ে করতে চায় তারা যেন জানুক তাদেরই প্রতিবেশীরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল। বা একটু যেন ভাবে তাদের পরিবারের কেউ এভাবে নির্যাতিত হলে কেমন লাগত।

নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন। হামুদুর রহমান কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছে শ'খানেকের মতো। এ সংখ্যা কখনও নির্দিষ্ট করা যায় নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এ দেশেও। তাই আমি 'বাংলার

বাণী'তে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান মহিলার প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তাঁর নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ঐ সময় সিডনি থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি নির্যাতিত নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয় এবং সেই হিসাবের তিনি একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন—"ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিসের মতে এই সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলার গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ...

ধর্ষিত মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাবরক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে।"

সাংবাদিক এম.ভি. নকভী করাচিতে আমাকে বলেছিলেন, টিক্কাখান যখন ঢাকা থেকে ফেরেন তখন সাংবাদিকরা তাকে ধর্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, যতোটা শোনা যাচ্ছে ততোটা নয়। হাজার তিনেকের মতো মেয়ে হয়তো ধর্ষিত হয়েছে। নকভী বললেন, ভেবে দেখুন, তিন হাজার রমণী ধর্ষিত হয়েছে, সেটিও তাদের কাছে কিছু নয়! হামুদুর রহমান কমিশন অন্তত এই সংখ্যাটি উল্লেখ করলেও বুঝতাম যে কমিশন পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু, হামুদুর রহমানরা ধর্ষণের কথা স্বীকার করতে রাজি হন নি। অথচ, জেনারেল নিয়াজি লিখেছিলেন, সৈন্যরা এমন উন্মত্ত হয়ে ধর্ষণ করেছে যে পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলারাও ধর্ষিত হয়ে যেতে পারে।

সাত

সব শেষে আসে ১৪ ডিসেম্বর বা বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রসঙ্গটি। ফরমান তার বইতে এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন কমিশনেও তাই বলেছেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে তার সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় আমি তাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে', বললাম আমি, 'জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন যে, বাগদাদে চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান যে রকম নির্মমতা দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে হবে। তিনি বলেছিলেন, তিনি মাটি চান, মানুষ নয়। শুধু তাই রাও ফরমান আলী সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। আপনার ডায়েরিতেও লেখা ছিল—বাংলার সবুজকে লাল করে দিতে হবে।'

'দুটি আলাদা ব্যাপার', বললেন রাও ফরমান আলী, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে যে, জেনারেল নিয়াজী একজন মিথ্যাবাদী। সবুজ রঙ লাল করার কথায় আমি ...'

'সেটি আপনার বইতেই বলেছেন', বলি আমি।

'আপনি কাজী জাফরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে, টঙ্গীতে ঐ সময় এ বিষয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন কিনা।' জানালেন ফরমান, 'আরও ছিলেন দুই তোয়াহা, একজন জামায়াতের, আরেকজন মার্কসবাদী। তিনি বক্তৃতায় বলতে চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে কমিউনিস্ট ধারণায় বা লাল ঝাণ্ডায় রূপান্তরিত করবেন। জেনারেল ইয়াকুব বিষয়টি আমাকে জানালে আমি ডায়েরিতে তা লিখে রাখি। একটি বাক্যই ছিল সেখানে। একটি বাক্য দিয়ে কী পুরো একটি পরিকল্পনা করা যায়। জেনারেল নিয়াজী এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। বইটি মিথ্যায় ভরা। বইটি তিনি নিজে লেখেনওনি। আপনি তাঁকে ঐ বইটির একটি পৃষ্ঠা না দেখে তাঁকে লিখতে বলুন। তিনি যদি পারেন তাহলে মেনে নেব বইটি তাঁর লেখা। টিক্কা কখনও ঐ ধরনের উক্তি করেননি যা আপনি বলেছেন। গভর্নর হিসাবে তিনি ছিলেন চমৎকার, অথচ দুর্ভাগ্য যে, বেলুচিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর একই দুর্নাম রটেছে।

'আরও কী যেন বলছিলেন নিয়াজী সম্পর্কে', তাঁকে মনে করিয়ে দিই।

'নিয়াজী যেদিন দায়িত্ব নিলেন', ফরমান আবার শুরু করলেন, 'সেদিন বললেন, মনে হয় দুশমনদের দেশে আছি। আমরা কিন্তু কখনও মনে করি নি আমরা দুশমনদের দেশে আছি, বরং আমরা মনে করেছি পাকিস্তানে আছি। তিনি আরও সব ভয়ঙ্কর কথা বলেছিলেন। যেমন এখানকার মানুষের পরিচয় বদলে দেব।'

'বলা হয়ে থাকে আপনি রাজাকার বাহিনী গড়েছিলেন।' জিজ্ঞেস করি আমি।

'না, আমার মনে হয় মার্শাল ল' সদর দফতর তা গঠন করেছিল।' বললেন ফরমান।

'আইডিয়াটা কার?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'ফোর্স কমান্ডারের।'

'তিনি কে?'

'নিয়াজী। তিনি আল শামস ও আল বদরের স্রষ্টা।'

'তার বইটিও তিনি তাদের উৎসর্গ করেছেন।' বলি আমি।

'তিনি তাদের স্রষ্টা, ব্যবহারকারী সব।' বললেন ফরমান।

'নিয়াজী লিখেছেন, আল বদর ও আল শামস নেতাদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছিল', জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি জানি না।' উত্তর দিলেন ফরমান।

'আপনি তো দেখছি কিছুই জানেন না', খানিকটা বিদ্রূপের সুরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'দেখুন, আসল ঘটনা হলো ঐ সময় কর্তৃত্ব ভেঙে পড়েছিল। আমি আর তখন কেউ না। গভর্নর মালেক পদত্যাগ করেন ভারতীয় আক্রমণের মুখে, আমার আর কোনো কিছু করার ছিল না।'

এরপর রাও ফরমান আলী ও আমার মধ্যে দ্রুত কিছু বাক্য বিনিময় হয় যা ছিল নিম্নরূপ : আমি জিজ্ঞেস করি—

'এ ঘটনা কী ১৩ ডিসেম্বর, বুদ্ধিজীবী হত্যার আগের দিন।'

'হ্যাঁ, নিয়াজী ওদের হত্যার জন্য দোষারোপ করেছে ... সকলেই আমাকে এজন্য দোষারোপ করে?'

'তারা কেন, আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমগুলোও এজন্য আপনাকে দায়ী করেছে। কেন?'

'আমি জানি না। আমি তো একাই ছিলাম, তখন ...'

'আপনি যে বুদ্ধিজীবী হত্যার একজন তার তো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে এবং কেউ সেগুলো এখনও অস্বীকার করে নি।'

'আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আমি এগুলো দেখি নি।'

'বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। আমার জানা মতে ঢাকার নটরডেম কলেজের সামনে একজন ডাক্তারকে হত্যা করা হয় অক্টোবরে। অনেক আগেই বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয় যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৪ ডিসেম্বর। তাছাড়া নিয়াজী ব্যস্ত ছিলেন রণাঙ্গন নিয়ে আর আপনি ছিলেন প্রশাসনের ক্ষমতায়।'

'নিয়াজী ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক।'

'আপনি ছিলেন বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনীতির দায়িত্বে। যেমন গোলাম আযম বা আবদুল মান্নানের সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তারা আপনার সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করত, বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করত। সুতরাং আপনার জানার বাইরে ঐ সময় কিছু ঘটবে কী করে। আপনি আমার এ মন্তব্যের সঙ্গে একমত?'

'কেন একমত হব?'

'কেননা আপনিই তো ...'

'কিছু না বলতে কি হত্যাকে বোঝায়?'

'আপনি প্রশাসনের ক্ষমতায় ছিলেন।'

'না, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর দৃশ্যপট বদলে যায়। এ আইনে গভর্নর হাউসের নিজস্ব কোনো স্থান ছিল না। গভর্নর হাউসের নিয়ন্ত্রণ ছিল শুধু সচিবালয়, পুলিশ ও রাজাকারের ওপর। সেনাবাহিনী, ইপিসিএএফ ছিল সামরিক আইন প্রশাসক ও কোর কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে। আমার অধীনে কিছুই ছিল না।'

'তাহলে সব কিছুর জন্য জেনারেল নিয়াজী দায়ী?'

'জেনারেল নিয়াজী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী।'

'কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে বলে জানি ...'

'শুনুন।' আমাকে থামিয়ে বিশাল বর্ণনা শুরু করেন রাও ফরমান আলী, 'জেনারেল শামসের ছিলেন পিলখানার দায়িত্বে। তিনি আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি জানান, আমাদেরকে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাধারণত আমাদের কোনো বৈঠক হয় না। জেনারেল শামসেরকে বললাম, ঠিক আছে যাব। পিলখানায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সেখানে দেখলাম কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে কেন। তিনি বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাচ্ছি, সেজন্যই গাড়িগুলো এখানে। তারপর বললেন, কয়েকজন লোককে গ্রেফতার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বললেন, কথাটা নিয়াজীকেই তুমি জিজ্ঞেস করো। এতে তোমার মত কী? আমি বললাম, স্যার, এখন কাউকে গ্রেফতারের সময় নয়, বরং এখন কত লোক আমাদের সঙ্গে আছে সেটিই দেখার কথা।'

'কত তারিখের ঘটনা এটা?'

'৯ কিংবা ১০ ডিসেম্বরের ঘটনা। তারপর আমি আর কিছু জানি না।'

'ঢাকার পতনের পর গভর্নর হাউসে আপনার একটি ডায়েরি পাওয়া গেছে সেখানে নিহত বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা ছিল।'

'কাউকে হত্যা করতে হলে কি আমি এভাবে তালিকা সংরক্ষণ করব? অনেকে আমার কাছে এসে অনেকের নামে অভিযোগ করত। যেমন তিনি এটা করছেন, ওকে সাহায্য করছেন। আমি তাদের নাম টুকে রাখতাম, এর সঙ্গে ঐ হত্যার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তার মানে দাঁড়ালো, আপনি বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে জানেন না, বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে জানেন না ...'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ফরমান। বললেন, 'গণহত্যা, গণহত্যা হয় নি।'

'গণহত্যা হয় নি মানে কী বলতে চান?' পাল্টা প্রশ্ন করি আমি।

'গণহত্যা হয় নি।'

'পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে লিখেছে গণহত্যা হয়েছে।'

'না, ঠিক নয়।'

'আচ্ছা জেনারেল', প্রশ্ন করি আমি, 'বসনিয়া, হার্জিগোভেনিয়ায় কী হয়েছে বা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো যে খবর দিচ্ছে তা কি মিথ্যা?'

'সঠিক খবর তারা দিচ্ছে না।'

'আচ্ছা, গণহত্যা হয় নি। কিন্তু মানুষ তো মারা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, এ রকম একটা ঘটনা ঘটলে তো কয়েকজন মারা যাবেই।'

'আচ্ছা কত মারা যেতে পারে। দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার?' পঞ্চাশ হাজারটি জোরের সঙ্গে বলি।

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

আমি এ উত্তরের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ধীর কণ্ঠে বললাম, 'জেনারেল, ৫০ হাজার লোক হত্যা যদি গণহত্যা না হয়, তাহলে গণহত্যা কাকে বলে?'

জেনারেল রাও ফরমান আলীর উত্তর দেওয়ার কিছু ছিল না।

আলতাফ গওহরের সঙ্গে যখন এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি তখন তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁকে খবর দিয়েছিল, বাঙালি-হত্যার জন্য একটি তালিকা হয়েছে। তাঁর এক বন্ধুর নামও সেখানে আছে। আলতাফ গওহর কি কিছু করতে পারবেন? গওহর জানালেন, আমাদের এক পরিচিত যিনি ফরমানেরও পরিচিত তাকে বিষয়টা জানালাম এবং ফরমানের সঙ্গে দেখা করতে বললাম। সে ফরমানের সঙ্গে দেখা করে তালিকা থেকে নামটি বাদ দেয়ার অনুরোধ জানাল। "ফরমান ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে নামটি কেটে দিলেন। সেই নামটি ছিল সানাউল হকের।"

ইসলামাবাদে এয়ার মার্শাল আসগর খানের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। বললাম, ফরমান আলী বলছেন, ১৯৭১ সালে ঢাকায় কী হয়েছিল তা তিনি জানেন না। বলেই হেসে ফেললাম। আসগর খানও হেসে ফেললেন। তারপর মৃদুভাবে বললেন, "দ্যাট ইল ফেমড ম্যান। এখন সব ফিলোসফিক্যাল ও হাই আইডিয়ালের কথা বলছে।"

কমিশন ফরমানকে এই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। কারণ ফরমান দায়ী হলে যুদ্ধটাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়। বরং তিনি লিখেছেন, "আমার আশংকা, পূর্ববর্তী আদেশকে বাতিল করে সম্ভবত নতুন আদেশ আর জারি করা হয় নি এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমি আজও পর্যন্ত জানি না যে, কোথায় রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তাদেরকে এমন কোথ'ও বন্দি করা হয়েছিল, যার প্রহরায় ছিল মুজাহিদরা। আত্মসমর্পণের পর ঢাকা গ্যারিসনের কমান্ডাররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারা মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ মুক্তিবাহিনী নির্দয়ভাবে মুজাহিদদের হত্যা করছিল। পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দি ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকতে পারে। ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই ঢাকা দখল করে নিয়েছিল।" ["They could have been killed by any body execept the Pakistan army as it had already surrendered on 16th December."]

অর্থাৎ তিনি তো ননই, পাকিস্তান হানাদারবাহিনীও নয়, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল মুক্তিবাহিনী অথবা ভারতীয় বাহিনী। এ যে কত বড় মিথ্যাচার তা বলাই বাহুল্য। তিনি কী ভুলে গেছেন বুদ্ধিজীবীদের শুধু ১৪ ডিসেম্বর নয় এর আগে থেকে হত্যা করা হচ্ছিল?

রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে কতিপয় সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার পেশাগত দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন বলেছে, বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ শুনে কমিশন অভিযুক্ত করেছে ছয়জন সামরিক কর্মকর্তাকে। তারা হলেন—

১. লে. জে. আলী আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
২. মে. জে. মোহাম্মদ জামশেদ
৩. মে. জে. এ. রহিম খান
৪. ব্রিগেডিয়ার জি. এম. বাকির সিদ্দিকী
৫. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত
৬. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজী

বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। তারা হলেন—

১. ব্রিগেডিয়ার এস. এ. আনসারী
২. ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমদ
৩. ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান।

এরপর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা হয়েছে, তিনি ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। এবং যুদ্ধের সময় তার ওপর সামরিক কোন দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল না। বিভিন্ন পদে তিনি আন্তরিক, সদিচ্ছাসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান একজন স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন—["Maj. Gen. Farman Ali merely functioned as an intelligent, well-intentioned and sincere staff officer in the various appointment held by him ..."]

সুতরাং ফরমান আলী ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেলেন টিক্কা খানও। এর একটি কারণ, তিনি ঢাকা ছেড়ে অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ভুট্টোর সময় (খুব সম্ভব) প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় ফরমান আলী একটি পদ পেয়েছিলেন। আর টিক্কা খান ভুট্টোর নির্দেশে তখন বেলুচিস্তানে কম্বিং অপারেশন করেন অনেকটা ঢাকা স্টাইলেই। এবং 'বেলুচিস্তানের কসাই' উপাধি লাভ করেন। পাকিস্তানের সম্মানিত রাজনীতিবিদ শেরবাজ খান মাজারির আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। উল্লেখ্য ভুট্টো টিক্কা খানকে সেনাপতি করেছিলেন।

এ ছাড়াও কমিশন আরো কয়েক জনকে অভিযুক্ত করেছে এ কারণে যে তারা ষড়যন্ত্র করে সংবিধান উল্টে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তাদের আচরণও লজ্জাজনক। কমিশনের ভাষায়—

> "... who have brought disgrace and defeat to Pakistan by their subversion of the constitution, usurpation of political power by criminal conspiracy, their professional incompetence, culpable negligence and wilful neglect in the performance of their duties and physical and moral cowardice in anandoning the fight when they had the capability and resource to resist the enemy."

কমিশনের ভাষায় তাদের 'পাবলিক ট্রায়াল' হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ কেউ না করে। কমিশন যাদের 'পাবলিক ট্রায়ালের' কথা বলেছে। তারা হলেন—

১. জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
২. জেনারেল আবদুল হামিদ খান
৩. লে. জে. এস.জি.এম.এম. পীরজাদা
৪. লে. জে. গুল হাসান
৫. মে. জে. মোহাম্মদ উমর
৬. মে. জে. মিঠা।

আট

এ ছাড়াও কমিশন আরো বেশ কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করেছে যা আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু, এতো সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণ করেও কমিশন মাত্র একডজনকে অপরাধী করেছে। যাদের কমিশন অপরাধী করেছে তাদের বিষয়ে আমাদেরও দ্বিমত নেই। এদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ব্যবস্থা নেবে কী না তাও তাদের ব্যাপার।

আমরা বিষয়টিকে অন্যভাবে বিচার করতে চাই। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ১৯৭১ সালকে আবার সামনে নিয়ে এসেছে। ১৯৭৫ সালের পর, এই প্রথমবার গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আমরা করছি সেই ১৯৭২ সাল থেকে। কিন্তু, বিচার হয় নি। যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা পাওয়া যায় নি।

এখন প্রযুক্তি বিকশিত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকাও সরকার তৈরি করেছিল ১৯৭২ সালে তা পাওয়া গেছে [দেখুন : শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি], নতুন প্রজন্মের [বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই তারা] তরুণ-তরুণীরা এদের নাম জানুক এবং প্রযুক্তির সাহায্যে পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে এদের নাম ছড়িয়ে দিক। এবং এদের বিচারের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি করুক। ইন্টারনেটের আর ই-মেইলের সাহায্যে কি সিয়াটলে প্রবল শক্তিশালী বিশ্ব ব্যাংকের সম্মেলন লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হয় নি?

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে ৫০০ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রস্তুত করেছিল। পরে তা হ্রাস করে ২০০তে নামিয়ে আনা হয়। সেই তালিকায় শুধু যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতে ছিল তাদের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে সরকার অভিযোগনামাও তৈরি করেছিল। শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত উপর্যুক্ত বইয়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। নয় জনের বিরুদ্ধে তৈরি অভিযোগনামা পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে নিয়াজী ও ফরমান আলী ছাড়া বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর সংক্ষিপ্ত-সার ও যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা উদ্ধৃত করা হলো।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আমাকে একজন প্রথিতযশা আইনজীবী বলেছিলেন ড. কামাল হোসেন ও এস. আর. পালসহ আরো অনেকে অভিযোগনামা তৈরি করেন। কাগজপত্রসহ ট্রাংকটি এডভোকেট এস. আর. পালের বাসায় ছিল। তারপর এসবের খোঁজ আর কেউ করেনি। এস. আর. পাল এখন প্রয়াত। হয়ত পরে ঐ ট্রাংকটি সরকারি কোন কর্তৃপক্ষ নিয়ে গেছে। হয়তো অবহেলায় কোনো মন্ত্রণালয়ের স্টোরে তা পরে আছে [বিশেষ করে আইন মন্ত্রণালয়ে খোঁজ করে দেখা যেতে পারে]। অনুসন্ধিৎসু যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আছেন তারা হয়তো এ বিষয়ে খোঁজখবর করলে এ বিষয়ে নতুন অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরি করা হয়েছিল এবং যা পাওয়া গেছে তা উদ্ধৃত করছি—

১. নাম : ব্রিগেডিয়ার মনজুর হোসেন আতিক
২. নং : পিএ ৩৫৪৭
৩. ইউনিট
৪. পদ : কুমিল্লার ১১৭ ব্রিগেড কমান্ডার, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ফেনীর উপসহকারী সামরিক আইন প্রশাসক (এর আগে সে বরিশালে লে. কর্নেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে)।
৫. তার বিরুদ্ধে অগণিত অভিযোগসমূহ : বরিশালে নির্যাতন ক্যাম্পে যেসব মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়, তাদের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডে আতিক সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সে এবং তার অধীনস্থ সৈন্যরা এসব এলাকায় যে ব্যাপক ও বর্বর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা প্রচুর তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।
৬. প্রস্তাবিত চার্জ : গণহত্যা, হত্যা, গণহত্যার নির্দেশনা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ পরিচালনা, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লংঘন, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা।

১. নাম : মেজর জেনারেল আনসারী
২. নং : পিএ-৪৪০৪
৩. ইউনিট :
৪. পদ : স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা (২৫ মার্চ '৭২-এর পূর্ব পর্যন্ত)। স্টেশন কমান্ডার, চট্টগ্রাম, ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থলাভিষিক্ত। জিওসি ৯ম ডিভিশন, সেক্টর তিন এর সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক।
৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ : প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী অভিযুক্ত আনসারী ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ সামরিক অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে। গণহত্যা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার মতো অসংখ্য উচ্চ পর্যায়ের স্টাফ ও অপারেশন প্লান বৈঠকে সে অংশগ্রহণ করে। সে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত বাঙালি সৈন্যদের পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করে। ডিভিশনের জিওসি এবং সেকশন তিন-এর উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার কারণে যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল, খুলনা, মংলা পোর্ট, সাতক্ষীরা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভোলা ও বাগেরহাটসহ ব্যাপক এলাকার দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়।
১৯৭১-এর জুলাই মাস থেকে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত এসব অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে সে অথবা তার অধীনস্থ সৈন্যরা যে বর্বর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, নির্যাতন ও বন্দিশালা পরিচালনা করে তার অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে।
৬. প্রস্তাবিত চার্জ : মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা বাস্তবায়ন ও সামরিক অভিযান পরিচালনা নির্দেশ প্রদান, ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন প্রদান।

১. নাম : ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহিদ
২. নং : পিএসএস-৮৪৬৪
৩. ইউনিট : ৩০ এফ এফ
৪. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ : ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে সামরিক পাক-বাহিনী নিরীহ জনগণের উপর হামলার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঢাকা শহরে চাকরিরত ছিল। সেদিন ঢাকায় খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগসহ যেসব দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়, তাতে অভিযুক্তের অংশগ্রহণের প্রমাণ রয়েছে।
৫. উত্থাপিত অভিযোগ : খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা।

১. নাম : মেজর খুরশীদ ওমর
২. নং : পিএ-৪৫৫৩
৩. ইউনিট : (অভিযুক্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টের ৬১৪ ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে সংযুক্ত ছিল)
৪. কর্মস্থল :
৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ : অভিযুক্ত খুরশীদ ওমর '৭১-এর মার্চ মাস থেকে আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টের গোয়েন্দা ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ঐ সময় ঐ এলাকার রাজনৈতিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব ছিল তার ওপর।
গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাঙালি সেনা সদস্য এবং বেসামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা এবং এ সব ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘটনার সাথেও অভিযুক্ত ব্যক্তি জড়িত ছিল। কমপক্ষে ৯০০ ব্যক্তিকে তার নির্দেশে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয় এবং এদের অনেককেই তার আদেশে বা তত্ত্বাবধানে নির্যাতন করা হয়। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে অনেকেই পরবর্তীতে মারা যায়। নির্যাতনের নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল বিশেষজ্ঞ।
৫. উত্থাপিত অভিযোগ : পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা কার্যকর; খুন, নির্যাতন, মিথ্যা গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক রাখাসহ অন্যান্য ঘটনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন।

১. নাম : মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২. নং : পিটিসি-৫৯১১
৩. ইউনিট :
৪. কর্মস্থল : উপ-সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক সাব-সেক্টর-১২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ : ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর-এ অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবজেল থেকে ৫০ ব্যক্তিকে বের করে এনে পায়িরতলা ব্রিজের নিকট হত্যা করে। পরবর্তীতে ওই স্থানের মাটি খুঁড়ে ৪২ জনের লাশ পাওয়া যায়। অনেকে

এ ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পূর্বে লে. জেনারেল নিয়াজী এবং মেজর জেনারেল মজিদ খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ স্থানটি পরিদর্শন করে।
ওই গণহত্যা পরিকল্পনার প্রামাণ্য দলিলপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।
৬. উত্থাপিত অভিযোগ : গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড, মিথ্যা গ্রেফতারসহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

১. নাম : কর্নেল ইয়াকুব মালিক
২. নং : পিএ-৩৮৩৭
৩. ইউনিট : ৫৩ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট (৫৩ ব্রিগেড ১৪ ডিভিশন)
৪. পদ : সিও
৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে তার ইউনিটের অবস্থান ছিল কুমিল্লাতে এবং আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সেটি বাংলাদেশে অবস্থান করছিল। ২৫ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে তার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার-এ ৩০০ বাঙালি সৈন্যকে অস্ত্রহীন করে আটকে রাখে। এর বাইরেও ১৬০০ বেসামরিক লোককে আটক করে। ৩০শে মার্চ বন্দিদেরকে ১৫ জন অথবা ২০ জনের গ্রুপের ভাগ করে, বাইরে এনে গুলি করে হত্যা করে। একই রাত প্যাট্রোমেক্স লাইটের সহায়তায় মৃতদেহগুলোকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে গণকবর দেয়। এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনার পুরো সময়ে অভিযুক্ত কুমিল্লাতে উপস্থিত ছিল। বিশেষ করে যেসব দিনগুলোতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, সে সময় ইয়াকুব মালিক হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করছিল।
৬. প্রস্তাবিত চার্জ : পরিকল্পিত গণহত্যা বাস্তবায়ন, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন।

১. নাম : লে. কর্নেল সামস্-উল-সামস (কর্নেল সামস্ নামেও পরিচিত)
২. নং : পিএ-৩৭৪৫
৩. ইউনিট : ২২ এফএফআর এবং ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন (১০৭ ব্রিগেড. ১৪ ডিভিশন)
৪. পদ : ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত খুলনাতে সহকারী সাব মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।
৫. বিস্তারিত অপরাধসমূহ : ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত অভিযুক্তের কর্মস্থল ছিল যশোর। পরে সে খুলনাতে যায় এবং ধারণা করা হয় কখনও কখনও সে যশোর ফিরে আসত। বাংলাদেশের দুঃসহ দিনগুলোতে সে খুলনাতে ছিল। তার বিরুদ্ধে যশোর ও খুলনাতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় '৭১-এর ৪ মার্চ সে সদলবলে যশোর শহরের চাচড়া মহল্লায় নির্বিচারে গুলি করে ২৫০ জনকে হত্যা করে। ওই বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন দলে প্রায় ২০০০ ব্যক্তিকে নিয়ে আসে, খুলনা সার্কিট হাউস ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্যাতন করে এবং সার্কিট হাউস থেকে ২০০ গজ দূরে ফরেস্ট ঘাটে নিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এ সময়ে অভিযুক্ত সামস্ সার্কিট হাউজেই থাকত এবং সশরীরে নির্যাতন চেম্বার পরিদর্শন করত।
৬. প্রস্তাবিত চার্জ : পরিকল্পিত গণহত্যা বাস্তবায়ন, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুতর লংঘন, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশনসহ অন্যান্য চার্জ।

যুদ্ধবন্দিদের ভেতর অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১	১	পিএ-৪৭৭	লে. জেনারেল	আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী	ইস্ট কমান্ড	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
২	২	পিএ-১১৭০	মেজর জেনারেল	নাজার হোসেন শাহ	১৬ ডিভিশন	ঐ
৩	৩	পিএ-৪৪০৪	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ হোসেন আনসারী	৯ম ডিভিশন	ঐ
৪	৪	পিএ-৮৮২	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ জামশেদ	ডিজিইপিক্যাক	ঐ
৫	৫	পিএ-১৭৩৪	মেজর জেনারেল	কাজী আঃ মজিদ খান	১৪ ডিভিশন	ঐ
৬	৬	পিএ-১৩৬৪	মেজর জেনারেল	রাও ফরমান আলী খান	বেসামরিক বিষয়ক মেজর জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের উপদেষ্টা	ঐ
৭	৭	পিএ-১৬৭৪	ব্রিগেডিয়ার	আব্দুল কাদির খান	৯৩ ব্রিগেড (বিডিই)	ঐ
৮	৮	পিএ-২২৩৫	ব্রিগেডিয়ার	আরিফ রাজা	সিগনাল হেড কোয়ার্টার	ঐ
৯	৯	পিএ-১১০৯	ব্রিগেডিয়ার	আতা মোহাম্মদ খান মালিক	৭ ব্রিগেড	ঐ
১০	১১	পিএ-১৮৯৭	ব্রিগেডিয়ার	বশির আহমেদ	সি এ এফ	ঐ
১১	১২	পিএ-১০০০৮৮	ব্রিগেডিয়ার	ফাহিম আহমেদ খান	ইসি হেড কোয়ার্টার	ঐ
১২	১৩	পিএ-১৭৩৮	ব্রিগেডিয়ার	ইফতেখার আহমেদ রানা	৩১৩ ব্রিগেড	ঐ
১৩	১৬	পিএ-৩৪১৪	ব্রিগেডিয়ার	মনজুর আহমেদ	৫৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৪	১৭	পিএ-৩৫৪৭	ব্রিগেডিয়ার	মনজুর হোসেন আতিক	১১৭ ব্রিগেড	ঐ
১৫	১৮	পিএ-২১১১	ব্রিগেডিয়ার	মিয়া মুনসুর মোহাম্মদ	৩৯ ডিভিশন	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১৬	১৯	পিএ-১১৪৮	ব্রিগেডিয়ার	মিয়া তাসকিন উদ্দীন	৯১ ব্রিগেড	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সংঘটন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
১৭	২০	পিএ-২৭২৯	ব্রিগেডিয়ার	মীর আবদুল নাঈম	৩৪ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৮	২২	পিএ-১৯৯৯	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ আসলাম	৫৩ ব্রিগেড	ঐ
১৯	২৩	পিএ-২১০৩	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ হায়াৎ	১০৭/৪০৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২০	২৪	পিএ-১০৪৪	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ শফি	২৩ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২১	২৫	পিএ-১৭০২	ব্রিগেডিয়ার	এন এ আশরাফ	সিএমডি নাটোর গ্যারিসন	ঐ
২২	২৬	পিএ-৩৪৩০	ব্রিগেডিয়ার	এস এ আনসারী	রংপুর গ্যারিশন	ঐ
২৩	২৭	পিএ-৩৫৪৮	ব্রিগেডিয়ার	সাদ উল্লাহ খান এস জে	২৭ ব্রিগেড	ঐ
২৪	২৮	পিএ-১৮৮০	ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ আসগর হাসান	সিলেট ফোর্স	ঐ
২৫	২৯	পিএ-২১১০	ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ শাহ আবুল কাশেম	সি সি আর্টিলারি ইসিও	ঐ
২৬	৩০	পিএ-২১৩০	ব্রিগেডিয়ার	তাজাম্মল হোসেন মালিক	২০৫ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২৭	৩৫	পিএ-১৮১৭	ব্রিগেডিয়ার	ফজলে হামিদ	৩১৪ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২৮	৩৭	পিএ-৩৭৯৯	কর্নেল	কে কে আফ্রিদি	৯ ডিভিশন	ঐ
২৯	৪৪	পিএ-১৯৬৩	কর্নেল	মোহাম্মদ খান	আই এস আই	ঐ
৩০	৪৫	পিএ-১০০১১৫	কর্নেল	মোহাম্মদ মোশারফ আলী	১৪ প্রশাসনিক ডিভিশন	ঐ
৩১	৫৮	পিএ-২২০০	লে. কর্নেল	আব্দুল গাফফার	হেড কোঃ এসআইজিইএ	ঐ
৩২	৬৭	পিএ-৪৪৮৯	লে. কর্নেল	আফতাব হোসেন কোরায়েশী	৩৩ বেলুচ	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
৩৩	৫৭	পিএ-৩৫৬৮	লে. কর্নেল	আব্দুল রেহমান আওয়ান	সিএএফ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
৩৪	৬০	পিএ-৩৩৪৭	লে. কর্নেল	আব্দুল হামিদ খান	মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার	ঐ
৩৫	৬৫	পিএ-৪০৮৭	লে. কর্নেল	আবদুল্লা খান	ইপিক্যাফ	ঐ
৩৬	৬৮	পিএ-৪৩১৮	লে. কর্নেল	আহমেদ মোক্তার খান	৩০ এফ এফ	ঐ
৩৭	৭২	পিএ-৪০৬২	লে. কর্নেল	আমীর মোহাম্মদ খান	৭ সেকশন মার্শাল ল	ঐ
৩৮	৭৪	পিটিসি-৪৩২৯	লে. কর্নেল	আমীর নেওয়াজ খান	১৩ এফ এফ	ঐ
৩৯	৭৩	পিএ-৫০২৭	লে. কর্নেল	আমীর মোহাম্মদ খান	৩৪ পাঞ্জাব	ঐ
৪০	৫৫	পিএ-৪৭৪৫	লে. কর্নেল	এ সামস উল জামান	২২ এফ এফ	ঐ
৪১	৭৮	পিএ-৪৬০৮	লে. কর্নেল	আশিক হোসাইন	২৪ এফ এফ	ঐ
৪২	৮১	পিএ-৩২৩৮	লে. কর্নেল	আজিজ খান	৩২ বেলুচ	ঐ
৪৩	২০২	পিটিসি-৩২৩৯	লে. কর্নেল	গোলাম ইয়াসিন সিদ্দিকী	স্টেশন হেডকোঃ, ঢাকা এএ এবং কিউ এম জি	ঐ
৪৪	৯৭	পিএ-৩৭১১	লে. কর্নেল	ইসরত আলী আলাভী	১৪ হেডঃ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন	ঐ
৪৫	১৬৭	পিএ-৪৪৪১	লে. কর্নেল	মুক্তার আলম হিজাজী	ইপিক্যাফ	ঐ
৪৬	১৭০	পিএ-৩৬০০	লে. কর্নেল	মুজফ্ফা আনোয়ার	১৫ বেলুচ	ঐ
৪৭	১১৬	পিএ-৪১০০	লে. কর্নেল	এম আর কে মির্জা	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
৪৮	১২৮	পিএ-৪৩০১	লে. কর্নেল	মতলুব হোসেন	১৮ পাঞ্জাব	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
৪৯	১৪০	পিএ-২৭০০	লে. কর্নেল	মোঃ আকরাম	তচি কাউট	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
৫০	১৫২	পিএসএস-২৫৯০	লে. কর্নেল	মোহাম্মদ আকবর	ইপিক্যাফ	ঐ
৫১	১৪৭	পিটিসি-৩৬৪৫	লে. কর্নেল	মোহাম্মদ নেওয়াজ	১৫ বেলুচ	ঐ
৫২	১৬৯	পিএ-৪৪৬৬	লে. কর্নেল	মুস্তাজ মালিক	ইস্ট কমান্ড হেড কোয়াঃ	ঐ
৫৩	১৩৮	পিএ-৪৪১৬	কর্নেল	এম এম এম বাইজ	৮ বেলুচ	ঐ
৫৪	৪৮	পিএ-১০০২০৭	লে. কর্নেল	মোহাম্মদ মতিন	৭২	ঐ
৫৫	১২৯	পিএ-২৯১৭	লে. কর্নেল	মাজহার হোসেন চৌহান	আই এস এস সি	ঐ
৫৬	১৬৮	পিএ-৩৬১০	লে. কর্নেল	মোক্তার আহমেদ সাঈদ	মার্শাল ল এ্যাডঃ হেড কোয়াঃ	ঐ
৫৭	১৭১	পিএসএস-২৮৯৯	লে. কর্নেল	মুক্তাফাজান	মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জোন হেড কোয়ার্টার	ঐ
৫৮	১৭৫	পিএ-২৮২১	লে. কর্নেল	ওমান আলী খান	জরিপ বিভাগ	ঐ
৫৯	১৮০	পিএ-৫০৭৪	লে. কর্নেল	রিয়াজ হোসেন জাভেদ	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৬০	১৭৮	পিএ-৪৫৫০	লে. কর্নেল	রশিদ আহমেদ	ইপিক্যাফ হেড কোয়াঃ	ঐ
৬১	১৯৬	পিএ-৪৮১৭	লে. কর্নেল	শেখ মোহাম্মদ নাঈম	৩৯ বেলুচ	ঐ
৬২	১৯২	পিএ-৩৯৩২	লে. কর্নেল	সরফরাজ খান মালিক	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৬৩	১৮১	পিএ-৪৯২০	লে. কর্নেল	এস এফ এইচ রিজভী	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
৬৪	১৮২	পিএ-৪৫৬০	লে. কর্নেল	এ এইচ বোখারী	২৯ সিএভি	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
৬৫	২০৫	পিএ-৪৩৬৮	লে. কর্নেল	সৈয়দ হামিদ শফি	প্রতিরক্ষা ক্রয়	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
৬৬	২০১	পিএ-৩৮১৭	লে. কর্নেল	সুলতান বাদশা	৮ ইপিক্যাক	ঐ
৬৭	২০০	পিএ-৫১৭৪	লে. কর্নেল	সুলতান আহমেদ	৩১ বেলুচ	ঐ
৬৮	১৯৯	পিএ-৪৫১৮	লে. কর্নেল	এস আর এইচ এস জাফরী	সিগন্যাল ইএ হেড কোঃ	ঐ
৬৯	২১৬	পিএসএস-৩৭৪৩	লে. কর্নেল	জাহিদ আশা খান	ইএক লগ হেড কোয়াঃ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
৭০	২২২	পিএ-৩৮৩৭	লে. কর্নেল	এম ওয়াই মালিক	১৪ ডিভিশন হেড কোয়াঃ	ঐ
৭১	২৩১	পিএ-৭০৫৯	মেজর	আব্দুল গফ্রান	ইস্ট কমান্ড	ঐ
৭২	২৮৪	পিএ-৫৬৪০	মেজর	আনিস আহমেদ	২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেঃ	ঐ
৭৩	২৯০	পিএ-৭২১৪	মেজর	আরিফ জাভেদ	২২ ক্যাভ	ঐ
৭৪	৩০৪	পিএ-৬৭৩৬	মেজর	আতা মোহাম্মদ	২৯ বেলুচ	ঐ
৭৫	২৩৩	পিএসএস-৮৩৯৪	মেজর	আব্দুল হামিদ	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৭৬	৩০১	পিএ-৭২৯৯	মেজর	এ এস পি কোরায়েশী	২৫ পাঞ্জাব	ঐ
৭৭	২৯৪	পিএ-৭৫৩০	মেজর	আশফাক আহমেদ চীমা	৩৯ বেলুচ	ঐ
৭৮	২৪১	পিএসএস-৮৫৪৭	মেজর	আব্দুল খালেক কায়ানী	৬ পাঞ্জাব	ঐ
৭৯	২৫৬	পিটিসি-৪৬৬৪	মেজর	আব্দুল ওয়াহিদ মুঘল	২২ বেলুচ	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
৮০	২৩৫	পিএ-৩৮৩৮	মেজর	আব্দুল হামিদ খটক	মার্শাল ল হেড কোয়ার্টার	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
৮১	২৬২	পিএ-৭২৫১	মেজর	আহমেদ হাসান খান	ইপিক্যাক	ঐ
৮২	২৮৩	পিআরআর-৪৪৩৮	মেজর	আনিস আহমেদ খান	১৫ বেলুচ	ঐ
৮৩	২৫৫	পিএ-৪৯৯০	মেজর	আব্দুল ওয়াহিদ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
৮৪	৩২০	পিএ-৫৮৬৮	মেজর	সি এইচ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	মার্শাল ল এ্যান্ডঃ জেন বি হেড কোয়ার্টার	ঐ
৮৫	৩৪৮	পিএ-৪১২২	মেজর	গোলাম মোহাম্মদ	২ বেলুচ	ঐ
৮৬	৩৫৮	পিটিসি-৪৩৯০	মেজর	গোলাম আহমেদ	ইপিক্যাক	ঐ
৮৭	৩৪৪	পিএ-৭৪৩৯	মেজর	গজনফার আলী নাসির	ইপিক্যাক	ঐ
৮৮	৩৬৩	পিএ-৬৯৫৯	মেজর	হাদী হোসাইন	২৪ এফ এফ	ঐ
৮৯	৩৬৭	পিএ-৬৬৪৬	মেজর	হাসান মুজতবা	৮ বেলুচ	ঐ
৯০	৩৭৬	পিটিসি-৫৭৩৩	মেজর	ইফতেখার উদ্দীন আহমেদ	৩৩ বেলুচ	ঐ
৯১	৩৭৪	পিএ-৬৭২৯	মেজর	ইফতেখার আহমেদ	৮ পাঞ্জাব	ঐ
৯২	৭১২	পিএ-৫২৫০	মেজর	শাহ মোহাম্মদ ওসমান ফারুকী	৭ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
৯৩	৪১৯	পিএ-৪৫৫৩	মেজর	খুরশিদ ওসমান	৮১৪ এফআইইউ	ঐ
৯৪	৪২৩	পিটিসি-৩৯৪৭	মেজর	খুরশিদ আলী	জরিপ বিভাগ	ঐ
৯৫	৪১৪	পিএ-৭৫৭৬	মেজর	খিজির হায়াৎ	৪ এফ এফ	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
৯৬	৪৮৫	পিএ-৭৬৫৭	মেজর	মেহের মোহাম্মদ খান	৩১ বেলুচ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
৯৭	৪৩১	পিটিসি-৫৯১১	মেজর	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান	২৭ ব্রিগেড	ঐ
৯৮	৫৩৩	পিএ-৭২৫৩	মেজর	মোহাম্মদ আফজাল	৮ বেলুচ	ঐ
৯৯	৪৪১	পিএ-৭৪০৫	মেজর	মোহাম্মদ ইসহাক	ইপিক্যাক	ঐ
১০০	৫৫৩	পিটিসি-৩২৪৬	মেজর	মোহাম্মদ হাফিজ রাজা	৩৪ পাঞ্জাব	ঐ
১০১	৫৯৫	পিএ-৬৮৭০	মেজর	মোহাম্মদ ইউনাস	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১০২	৫০৪	পিএ-৬৭৯৩	মেজর	মোহাম্মদ আমিন	১০৭ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১০৩	৪৮১	পিএল-৩৯৩৫? ২৯৩৫	মেজর	মোহাম্মদ লোদী	নাটোর গ্যারিশন	ঐ
১০৪	৪৯৩	পিএ-৬৫৫৪	মেজর	মির্জা আনোয়ার বেগ	৮৮ অর্ডিন্যান্স সিওওয়াই	ঐ
১০৫	৪২৮	পিএ-৪১৫৭	মেজর	এম এ কে লোদী	১৬ ডিভিশন হেড কোয়াঃ	ঐ
১০৬	৪৫৯	পিএসএস-৪২৪৫	মেজর	মাদাদ হোসেন শাহ	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১০৭	৫৪৪	পিটিসি-৩০০৭	মেজর	মোঃ আয়ুব খান	৯৭ ব্রিগেড	ঐ
১০৮	৫৮৬	পিএসএস-৬১১০	মেজর	মোঃ শরীফ আরাইন	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১০৯	৫৫৫	পিএ-৫৯৬৪	মেজর	মোহাম্মদ ইফতিখার খান	২০২ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১১০	৪৫৫	পিএ-২৮১৮	মেজর	এম. ইয়াহিয়া হামিদ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১১১	৫৯২	পিএসএস-৬১৫০	মেজর	মোহাম্মদ ইয়ামিন	এ এস সি	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১১২	৫২৭	পিএ-৫১৪১	মেজর	মোহাম্মদ গজনফার	আই এস এস সি	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
১১৩	৫৮৩	পিএ-৭২৩১	মেজর	মোহাম্মদ সারওয়ার	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১১৪	৫৭৯	পিটিসি-৩০১৬	মেজর	মোহাম্মদ সিদ্দিকী	২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেঃ	ঐ
১১৫	৫৪৩	পিএসএস-৬০৯২	মেজর	মোহাম্মদ আশরাফ	ইপিক্যাক হেড কোয়ার্টার	ঐ
১১৬	৫০৬	পিএসএস-৪৬৩৪	মেজর	মোহাম্মদ আশরাফ খান	৫৩ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১১৭	৬০৪	পিএ-৫৩১২	মেজর	মোহাম্মদ সাকদার	আই এস এস সি	ঐ
১১৮	৪৯৬	পিএ-৬০৬৭	মেজর	এম এম ইস্পাহানি	ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোঃ	ঐ
১১৯	৫৬২	পিএ-৬৪৪০	মেজর	মোহাম্মদ জামিল	ইপিক্যাক	ঐ
১২০	৫৮০	পিএ-৭৫৫৯	মেজর	মোহাম্মদ শফি	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১২১	৫৪৭	পিএসএস-৪৩২০	মেজর	মোহাম্মদ আলী কুরায়েসী কুরেস	আই এস এস সি	ঐ
১২২	৫২৫	পিএ-৬৪৬০	মেজর	মোহাম্মদ জুলফিকার রাথোর	১৩ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১২৩	৬১৫	পিএ-৫৯৬২	মেজর	মুস্তাক আহমেদ	৬৩০ এ এস সি	ঐ
১২৪	৬৩৪	পিএসএস-৭৯৯৬	মেজর	নাসির খান	২৬ এক এফ	ঐ
১২৫	৬৩২	পিএ-৪৭৪৮	মেজর	নাসির আহমেদ	৪০৯ GHQ FIU	ঐ
১২৬	৬৫৪	পিটিসি-৪৬৩২	মেজর	রানা জহুর মোহাইদ্দীন খান	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১২৭	৬৬৬	পিএ-৮৬৫৫	মেজর	রিফাত মাহমুদ	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১২৮	৬৬৭	পিএসএস-৬১৪৮	মেজর	রুস্তম আলী	৩১৪ ব্রিগেড হেড কোঃ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
১২৯	৬৫১	এসিও-৩৯০	মেজর	আর এম মুমতাজ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
১৩০	৭০২	পিএ-৬০৩৬	মেজর	সর্দার খান	মার্শাল ল এ্যাডঃ হেডঃ কোঃ	ঐ
১৩১	৫১০	এসও-২০৯৯	মেজর	মোহাম্মদ আযম খান	১২ এ কে	ঐ
১৩২	৬৮৬	পিআরআর-৩৩৮৯	মেজর	সাইফ উল্লাহ খান	আই এস এস সি	ঐ
১৩৩	৬৭৪	পিএ-৬৮৯৩	মেজর	এস টি হোসেন	৭৩৪ এফআইসি	ঐ
১৩৪	৭৩০	পিএসএস-৪২২৪	মেজর	এস এম এইচ এস বোখারী	২৪ এফ এফ	ঐ
১৩৫	৬৮৯	পিএসএস-৮০১৫	মেজর	সাজিদ মাহমুদ	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১৩৬	৭২৩	পিএ-৭৪১৫	মেজর	শের উর রেহমান	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৩৭	৬৯৫	পিটিসি-৫৯৩০	মেজর	সালামত আলী	ইপিক্যাক	ঐ
১৩৮	৬৯০	পিএ-৬৮৫৮	মেজর	সাজ্জাত আকার মালিক	আই এস আই	ঐ
১৩৯	৬৯৮	পিএ-৫৬৮৪	মেজর	সালিম এনায়েত খান	৫৭ মার্শাল ল হেঃ জোন বি	ঐ
১৪০	৭৩৫	পিএ-৭২৮৯	মেজর	সুলতান সাউদ	ইপিক্যাপ	ঐ
১৪১	৭০৫	পিএ-৬৫৪২	মেজর	সরফরাজ উদ্দীন	আই এস আই	ঐ
১৪২	৭২০	পিএ-৫০৮০	মেজর	শওকাতুল্লাহ খটক	৩৬ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৪৩	৭৩৭	পিএ-৭৪২৮	মেজর	সুলতান সুরখো আওয়ান	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১৪৪	৭০৪	পিএ-৭০৭৬	মেজর	সরফরাজ আলম	ইপিক্যাপ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
১৪৫	৭০৬	পিএ-৬৮৫১	মেজর	সারওয়ার খান	ভচি স্কাউট	ঐ
১৪৬	৭৫৬	পিএ-৬২৭২	মেজর	তাকায়ের-উল-ইসলাম	নাটোর হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৪৭	৭৮৫	পিএসএস-৮১২৪	ক্যাপ্টেন	জাওয়ুল মালুক	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৪৮	৮০৬	পিএসএস-৮৪৬৪-৮৪৬৪	ক্যাপ্টেন	আব্দুল ওয়াহিদ	৩০ এফ এফ	ঐ
১৪৯	৮১৭	পিএ-১০২০২	ক্যাপ্টেন	আফতাব আহমাদ	৩১ বেলুচ	ঐ
১৫০	৮৫৮	পিএএস-৮৮৩৬	ক্যাপ্টেন	আরিফ হোসেন শাহ	আর্টিলারি ইআইজেডআই ইএমডি	ঐ
১৫১	৮১৫	পিএসএস-৯৬৩৪	ক্যাপ্টেন	আবরার হোসেন	৩০ এফ এফ	ঐ
১৫২	৮৫৩	পিএসএস-৯৯৫৯	ক্যাপ্টেন	আমজাদ সাব্বির বোখারী	৩১ ফিল্ড রেজিঃ আর্টিলারি	ঐ
১৫৩	৮৭৬	পিএ-১০১২৯	ক্যাপ্টেন	আওসাফ আহমেদ	৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৫৪	৭৫০৮৯	পিএ-১০১৮৫	ক্যাপ্টেন	আব্দুল কাহার	ইপিক্যাপ	ঐ
১৫৫	৮৬৯	পিএ-১০৯৮৫	ক্যাপ্টেন	আশরাফ মির্জা	১২ একে ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেঃ	ঐ
১৫৬	৮০২	পিএসএস-৯৯০৪	ক্যাপ্টেন	আবদুল রশিদ নায়ার	১৯ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৫৭	৮৪৯	পিএসএস-৮০০৫	ক্যাপ্টেন	আমান উল্লাহ	নাটোর গ্যারিসন হেড কোঃ	ঐ
১৫৮	৮৮২	পিএসএস-৯৩৬৩	ক্যাপ্টেন	আজিজ আহমেদ	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৫৯	২২১	পিএসএস-৯৪৪০	ক্যাপ্টেন	গুলফ্রাজ খান আব্বাসী	২২ এফ এফ	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১৬০	৯৫১	পিএসএস-৮১৪৪	ক্যাপ্টেন	ইকরামুল হক	২৯ ক্যাভ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
১৬১	৯৪৭	পিএ-১০২৪১	ক্যাপ্টেন	ইজাজ আহমেদ চীমা	আই এস আই	ঐ
১৬২	৯৪১	৮৮৬৭	ক্যাপ্টেন	ইফতেখার আহমেদ গোনদাল	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
১৬৩	৯৬৪	পিএসএস-৮৮২১	ক্যাপ্টেন	ইসহাক পারভেজ	২৪ এফ এফ	ঐ
১৬৪	৯৬০	পিএসএস-৯৬১৪	ক্যাপ্টেন	ইকবাল শাহ	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৬৫	৯৭৬	পিএসএস-৬৯১০	ক্যাপ্টেন	জাভেদ ইকবাল	৩৩ বেলুচ	ঐ
১৬৬	৯৭২	পিএসএস-৯৭৬৫	ক্যাপ্টেন	জাহাঙ্গীর কোয়ানী	আর এফ টি ক্যাম্প	ঐ
১৬৭	৯৮৫	পিএ-৭৮৩৮	ক্যাপ্টেন	করম খান	৩১৫ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১৬৮	১০৪৭	পিএ-১১৫৫৪	ক্যাপ্টেন	মনজার আমিন	২৫ এফ এফ	ঐ
১৬৯	১২৫৫	পিএসএস-৯৩৮৭	ক্যাপ্টেন	মোজাফফর হোসেন নাকভী	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৭০	১১৭৮	পিএ-১১৫৫১	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ সাজ্জাদ	৮০ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৭১	১২০১	পিএসএস-৮৮২০	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জাকির রাজা (মোঃ জাকার খান, আর্টিলারি)	আই এস এস বি	ঐ
১৭২	১১২৬	পিএ-৭৮৬২	ক্যাপ্টেন	মোঃ আরিফ	১৪ ডিভিশন হেড কোঃ	ঐ
১৭৩	১১৩১	পিএসএস-৯০১৮	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ আশরাফ	১২ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৪	১১৪৯	পিএসএস-৮৯৭৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ ইকবাল	১২ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৫	১০৯৬	পিএসএস ৯৯২৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ রফী মুনির	১৮ পাঞ্জাব	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১৭৬	১১৫৯	পিএসএস-১০২৮৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জামিল	৬ পাঞ্জাব	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
১৭৭	১২৩৮	পিএসএস-৯০৭৭	ক্যাপ্টেন	নাঈম সাদিক	৪০৯ এফআইইউ হেড কোঃ	ঐ
১৭৮	১৩৫১	পিএসএস-৯৪৫৪	ক্যাপ্টেন	শের আলী	৩৯ বেলুচ	ঐ
১৭৯	১৩২২	পিএসএস-৯০৯৩	ক্যাপ্টেন	সালমান মাহমুদ	২৬ এফ এফ	ঐ
১৮০	১৩২৫	পিএ-১১০০৯	ক্যাপ্টেন	সামশেদ সারোয়ার	আর এল এফ ক্যাম্প	ঐ
১৮১	১৩৪৩	পিএসএস-৭৭৪৫	ক্যাপ্টেন	শহীদ রেহমান	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৮২	১৩২১	পিএসএস-১০৪৩১	ক্যাপ্টেন	সালেহ হুসাইন	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৮৩	১৩৫০	পিএসএস-৯৫০৮	ক্যাপ্টেন	শওকত নেওয়াজ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৮৪	১৩৯৬	পিএ-৭৮৯৮	ক্যাপ্টেন	জাহিদ জামান	৫৩ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১৮৫	১৫০৫	পিএসএস-১১৮৪৩	লেফটেন্যান্ট	মুনীর আহমেদ বাট	৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট	ঐ
১৮৬	১৫৫৩২	পিএসএস-১২১৯১	লেফটেন্যান্ট	জাফর জং	৩৮ এফ এফ	ঐ
১৮৭	৬৪১	পিএসএস-৬১২৭	মেজর	নিসার আহমেদ খান শেরওয়ানী	৩২ পাঞ্জাব	নরহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী
১৮৮	৩৩৮	পিএসএস-৮৫৩৪	মেজর	ফায়েজ মাহমুদ	২৯ বেলুচ	ঐ
১৮৯	৪৮৭	পিএ-৪৯৯২	মেজর	মিয়া ফখরুদ্দীন	৯১ ইনফ্যানট্রি, ব্রিগেড হেঃ	ঐ
১৯০	৯২৪	পিএ-৪৯৯২	ক্যাপ্টেন	হেদায়েত উল্লাহ খান	২৯ বেলুচ	ঐ
১৯১	১১০২	পিএসএস-৮৮০১০৮২৮	ক্যাপ্টেন	মোঃ সিদ্দীক	২৭ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ

ক্রমিক নং	যুদ্ধবন্দি	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১৯২	৯৯৩	১০১৪৭	ক্যাপ্টেন	খলিল-উর-রহমান	সিওডি, ঢাকা	নরহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী
১৯৩	৬২৮	পিএ-৬৭২৬	মেজর	নাদির পারভেজ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৯৪	৯৩৪	পিএসএস-১০৩৮৪	ক্যাপ্টেন	হাসান ইদ্রিস	ইপিক্যাপ	ঐ
পাকিস্তান বিমান বাহিনী						
১৯৫	৬৫৪৮৩	পিএ-৯৫৩	এয়ার কমডোর	ইনাম-উল-হক খান	পিএফ ঢাকা	ঐ
১৯৬	৬৫৪৮৪	পিএএফ-১০৬৯	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	এম এ মজিদ বেগ	পিএফ ঢাকা	ঐ
১৯৭	৬৫৫১০	পাক-৫৩৩২	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	খলিল আহমেদ	পিএএফ	ঐ
পাকিস্তান নৌ বাহিনী						
১৯৮	৭১৭৫৫	পি-১৩৮	রিয়ার অ্যাডমিরাল	মোহম্মেদ শরীফ		ঐ
১৯৯	৭১৭৫৬	পিএন-১০৮	কমোডর	ইকরামুল হক মালিক	পোর্ট ট্রাস্ট	ঐ
২০০	৭১৭৫৭	২১৯	কমোডর	খতিব মাসুদ হোসেন	বেজ কমান্ড	ঐ

নয়

একটি বিশেষ সময়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশনের যারা সদস্য ছিলেন স্বাধীনচেতা হিসেবে তাদের কোনো খ্যাতি ছিল না। থাকলে ভুট্টো তাদের কমিশনের সদস্য করতেন না। কমিশন তাই ভুট্টোর কথা মনে রেখে রিপোর্ট তৈরি করতে চেয়েছে। তারা ভালভাবেই জানতেন যে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কী করেছে। সুতরাং সব কিছু অস্বীকার করলে রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে। তাই তারা কিছু ঘটনা, কিছু হত্যাকাণ্ড, কিছু ধর্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি পটভূমিকা তৈরি করে লুণ্ঠন, হত্যা ও ধর্ষণের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ এটি না হলে ওটি হতো না। ফলে রিপোর্ট নির্যাস হলো আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারী, অনুপ্রবেশকারীদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের ফলেই পাকিদের কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ রিপোর্ট পক্ষপাতমূলক, আংশিক সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বানোয়াট। আমরা এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করি।

এ রিপোর্ট যে পক্ষপাতমূলক তা বোঝা যায় ১৯৭১ সালের ঘটনার জন্য ইয়াহিয়া খান ও কিছু সামরিক অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু, নাটের গুরু জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে কমিশন নীরব। অথচ পাকিস্তানের এলিট ও সাধারণ মানুষরা দোষী করেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোকেও। সামরিক অফিসারদের মধ্যেও ভুট্টো যাদের পছন্দ করতেন তাদের দোষী করা হয়নি। যেমন, টিক্কা খান ও ফরমান আলী।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানে কেন রিপোর্টটি নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে? তার প্রধান কারণ, সেনাবাহিনী। পাকিস্তানিরা সব সময় সেনাবাহিনীকে ভজনা করেছে। পঞ্চাশের দশক থেকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটি ইমেজ গড়ে তোলা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। শাসকরা সব সময় সামরিক বাহিনীর শৌর্য-বীর্যের একটি মিথ গড়ে তুলতে চেয়েছে। তারাই ইতিহাসের স্রষ্টা এ কথা সব সময় তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭১ সালে এ মিথ ভেঙে যায়। পাকিস্তানিরা মানসিকভাবে তা মেনে নিতে পারে নি। এ রিপোর্টে সামান্য হলেও পাকি বাহিনী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তাও সাধারণের মানতে কষ্ট হচ্ছে। মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে গণহত্যার কারণে তারা যে যাতনা বিদ্ধ হচ্ছে তা নয়। তাদের মনে হচ্ছে, কয়েকজন সামরিক অফিসারের কারণেই পাকিস্তানের গর্ব ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। সে জন্য তারা গুটিকয় সামরিক অফিসারের বিচার চাচ্ছে।

অনেক রাজনীতিবিদও এখন সেই সব সামরিক কর্মকর্তাদের বিচার চান। উল্লেখ্য, তারাও বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি এড়িয়ে যান। তারা এখন বিচার চান এ কারণে যে, তাতে সামরিক বাহিনীকে হেনস্থা করা যেতে পারে। তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কারণ, যারা এখন হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হোক চান, ক্ষমতায় থাকতে তারা তা প্রকাশ করেন নি।

অন্যদিকে, পাকিস্তানে আরেকটি ধারা আছে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের ধারা, যারা ১৯৭১ ও তারপরও বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার চেয়েছে এবং এখনও চাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা চান, পাকিস্তান তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক। তারা আন্তরিক। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। আমরাও তাই চাই। ১৯৭২ থেকেই আমরা সে দাবি করে আসছি।

আলমদার রাজা বলেছেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো এত বড় বিপর্যয় থেকেও আমরা কোনো শিক্ষা নেই নি। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি যারা এর জন্য দায়ী তাদের রক্ষা করতে। পুরো সামরিক সম্মানে ইয়াহিয়া খানকে দাফন করা হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। ১৯৫ জন, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে তাদের শাস্তি দেয়া হয় নি।"

আলমদার রাজা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন করেছেন হামুদুর রহমান কমিশন প্রকাশের জন্য যাতে যারা দায়ী তাদের শাস্তি দেয়া যায়। আরজির ৫২নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন যারা বড় ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের শাস্তি না দেয়াতে পাকিস্তান এখন বিশ্বের কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। এবং এর ফল কী হয়েছে, "The internal effect of this has been such that the extra judicial and custodial killing have become a part of national tradition." শেষোক্ত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান নির্বাহী সাংবাদিক আই. এ. রেহমান লাহোরে আমাকে বলেছিলেন, পাকিস্তান যা করেছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। বাঙালিদের জানমালের আক্রমণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। যুদ্ধের নীতির মধ্যে তা পড়ে না। যদি অল্প কয়েকজন মানুষও নিহত হয়ে থাকে বিনা কারণে, যদি একজন নারীও ধর্ষিতা হয়ে থাকে, হত্যা করা হয়ে থাকে কয়েকজন শিশুকে (যার কোনো কারণ নেই) তাহলেও পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তিনি খুব সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে যা মূল ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করছি—

> "If we sincerely believe that in 1971 a great tragedy befell us, then a catharsis of the same order is necessary for the restoration of our mental health and our perception of justice and equity. So long as we believe, and continue to teach our children, that we were not responsible for killing our own innocent people in Bengal, we will never be able to understand what actually happened."

এ প্রসঙ্গে নিজেদের কথাও কিছু বলতে হয়। আমরা পাকিদের হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচারের কথা কতটা মনে রেখেছি? জাতি হিসেবে আমরা কী যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, বিচার চাই তাদের? যদি চাই তাহলে তা হয় না কেন? অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও উল্লেখ করি, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগের মশিউর রহমানকে পাকিরা ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল। হত্যার আগে 'ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। ... এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে

নীতিচ্যুত করার জন্য নানান ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে আগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখানো থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। অত্যাচারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনো তাঁর মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমে নি, সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারব না।"

"সত্যিই তিনি তা পারেন নি। হানাদার বাহিনী যখন তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো একটুও কাঁপে নি। প্রতিদিনে একে একে হানাদার পশুরা যখন তার দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনো একটু কেঁপে ওঠে নি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোঁট দুটো।"

তারপরও কি আমাদের বারবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলতে হবে? হানাদার বাহিনীর সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে? সমন্বয়ের রাজনীতিকে স্বাগত জানাতে হবে। মানুষ হলে তা সম্ভব? যদি আপনার পিতা বা ভ্রাতার ওপর এ ধরনের অত্যাচার চালানো হতো তাহলে কি যুদ্ধাপরাধ মেনে নির্বিকার থাকতেন নাকি আমাদের মতো সোচ্চার হতেন।

পাকিস্তানিরা কি কখনো এসব অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছে বা গণহত্যার কথা? না, কখনোই নয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তা স্বীকার করেন, কিন্তু সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনই নয়। এ প্রসঙ্গে এসে যায় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই. এস. আই.-এর কথা।

১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের নীতি নির্ধারণে আই. এস. আই.-এর ভূমিকা ছিল প্রবল। বাংলাদেশে পরাজিত হওয়ার পর 'হৃতগৌরব' পুনরুদ্ধারের জন্য আই. এস. আই. পাকিস্তানকে নিয়ে যায় আফগানিস্তানে। সেখানে জড়িয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের পরিস্থিতি কী হয়েছে তা পাকিস্তানে গেলেই বোঝা যায়। এখন আবার কাশ্মির নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে উপমহাদেশে। অন্য কথায় বলা যায়, উপমহাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আই. এস. আই. বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কারণ, তাহলে পাকিস্তানে সামরিক জান্তার (নাকি জন্তু) স্বার্থরক্ষা করা যায়, যথার্থতা প্রমাণিত করা যায়।

ইউরোপ, আমেরিকা কথায় কথায় মানবাধিকারের কথা বলে, সন্ত্রাসী সংস্থাকে দমনের কথা বলে। আই. এস. আই. এখন একটি সন্ত্রাসী সংস্থা। বাংলাদেশেও এখন তারা বিভিন্ন ঘটনা সৃষ্টি করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইউরোপ বা আমেরিকা আই. এস. আই. দমনের কথা বলছে না কেন? উপমহাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষের একটি দাবি হওয়া উচিত, অচিরেই আই. এস. আই.কে বিলুপ্ত করতে হবে যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির গেস্টাপো বা এস. এস. সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

সবশেষে, পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী, কবি আহমদ সেলিমের প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ করি। ১৯৭১ সালের ঘটনার প্রতিবাদ করায় ন্যাপকর্মী হিসেবে সে সময় তিনি জেল

খেটেছেন। ইসলামাবাদে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখনও তিনি বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার ও পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করছেন। তিনি বলছিলেন, "বাংলাদেশের অনেকে পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি ও যারা দোষী তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। এটি যৌক্তিক। কিন্তু, যদি প্রশ্ন করি, বাংলাদেশে যারা কোলাবরেটর ও একই রকম দোষে দোষী এবং যুদ্ধাপরাধী তাদের বিষয়ে বাংলাদেশ কী করছে?"
এ প্রশ্ন সেখানে ও বিদেশে আমাকে অনেকে করেছেন। বলা বাহুল্য আমি তার উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু, আমি বা আমরা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। এবং সে প্রশ্নের উত্তর হওয়াটা অনেকাংশ নির্ভর করছে আমাদের সরকারের ওপর।

২০০০

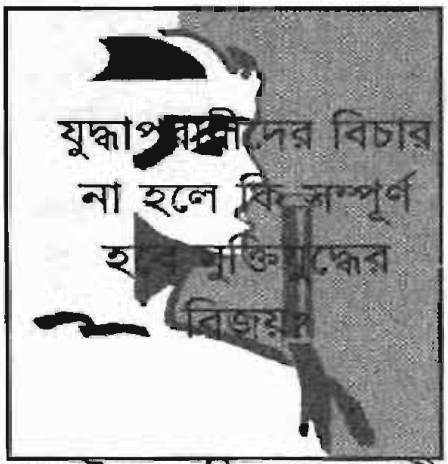

২৭ বছর আগে ১৬ ডিসেম্বর আমরা সমস্ত শোক ভুলে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম, মুখে হাসি নিয়ে স্বাধীনতা বরণ করতে। কারণ এ স্বাধীনতার জন্য কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়—"সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর' আর 'ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।' তখনও দগদগ করে জ্বলছে বুক, রক্তক্ষরণ হচ্ছে অনবরত। কারও স্বামী বেয়নেট বিদ্ধ, সন্তান নিখোঁজ, বোন ধর্ষিত। প্রতিশোধে যে চোখ জ্বলে ওঠেনি, হাত নিশপিশ করেনি তা নয়। সেটিই স্বাভাবিক। তবে প্রায় ক্ষেত্রে সবাই সংযত করেছে নিজেকে। অনেক খুনীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, মাত্র স্বাধীন হয়েছে দেশ। হবে, সবই হবে, ন্যায্য বিচার হবে। ১৯৭৩ সালে বিশাল এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন কি অপূর্ণ থাকবে? পৃথিবীতে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে স্বাধীনতাবিরোধী নামে একটি পক্ষ আছে। অনেক বিদেশী আমাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে স্বাধীনতাবিরোধী আবার থাকে কি করে? পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশে কেন এই শ্রেণীর উদ্ভব হলো? অনেকে বলবেন, বাঙালিরা ক্ষমাশীল, তাই এটি সম্ভব। আমি বলব, না, এটি বাঙালির সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা।

আমার সামনে এখন গত কয়েক দিনের এবং ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার ফাইল। সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় বিজয় দিবসকে বরণের সংবাদ। পুরনো পত্রিকাগুলোর পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের নাম, ছবি। খুনীদের তালিকা, তাদের ধরিয়ে দেবার আহ্বান ছবিসহ। বিচারের দাবি আর বিচারের সরকারি প্রতিশ্রুতি। ১৯৭৩-৭৪ থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং এক সময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরে। সুবিধাবাদটি কি? তা হলো ১৯৭১-এর পর কিছু মুক্তিযোদ্ধা ও প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের সম্পদের বিনিময়ে বিচারের দাবি ত্যাগ। সুবিধাবাদ হলো ১৯৭৫ থেকে খুনীদের বিচারের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়া। সমাজে, রাষ্ট্রে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্রে পরিণত করা। নিষ্ঠুরতা হলো, স্বজনহারাদের কান্না দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। হয়ত এর কারণ এই যে, যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের ৯০ ভাগের স্বামী মারা যায়নি, সন্তান হারায়নি, বোন ধর্ষিত হয়নি, স্ত্রী নিঃস্ব হয়নি। যার যায়নি সে বুঝবে কি করে হারানোর বেদনা! এই হচ্ছে বাংলাদেশ—আমাদের সোনার বাংলা।

বাংলাদেশ যে আজ অস্থিতিশীল তার প্রধান কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়া। সমাজ, রাজনীতিকে এরা দ্বিখণ্ডিত করেছে। সমাজে, রাষ্ট্রে এ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, খুন করলে কি হয়? কিছু না। লুট করলে কি হয়? কিছু না। ধর্ষণ করলে কি হয়? কিছু না। এসব বোধ পরতে পরতে মানুষের মনে জমা হয়, হিংস্রতা বাড়ে। তারপর কি হয়? তার প্রমাণ আজকের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে কখনও বিরত থাকেনি। কখনও উচ্চগ্রামে, কখনও নিচুগ্রামে তা উচ্চারিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তা তীব্র করে তোলে। এখন তা আরও জোরদার। জোরদার আরও হবে এ কারণে যে, পৃথিবীর রাজনীতির অবস্থাটা বদলেছে। অপরাধ করে, লুট করে, ধর্ষণ করে কোথাও আশ্রয় নেয়া আজ অসম্ভব হয়ে উঠছে। চিলির পিনোশে এর উদাহরণ। সুহার্তোকেও দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। স্লাভ নেতাদের বিচার চলছে। বাংলাদেশে তা হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না কেন?

সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা সব সময় বলেছেন, সব রাজনৈতিক হত্যার, খুনের বিচার হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও দাবি করেছিলেন এক সময়। গণহত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়? বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। অনেকে বলছেন, শহীদ পরিবারের কেউ মামলা দায়ের করলে প্রচলিত আইনে বিচার হবে। আমরা বলি, তা হবে না। কেন হবে না তা বলছি।

১৯৭২ সালের একটি সংবাদে দেখি ড. আবুল কালাম আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর এ মামলার কি হলো তা জানি না। ডা. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আলবদর আব্দুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মাওলানা' হিসেবে পরিচিত ও 'ইনকিলাব' নামক মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিপন্থী পত্রিকার একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইবুনালের জজ সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট বিচার করুন এ প্রসঙ্গে—"(I) Circumstances showing that about Khaleque was member of Jamat-e-Islami Nominated the mind and judgement of the prosecution witnesses because impression was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the liberation. Be that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasoning of the witness." তাছাড়া ধরে নেয়া যাক খালেক ধরে নিয়ে গেছে শহীদুল্লাহ কায়সারকে হত্যার জন্য, কিন্তু হত্যা করেছে তার প্রমাণ কি? এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী রায় দিলেন, "In the circumstances, therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accussed and we accordingly give benefit of doubt ..."

১৯৭১ সালে জামায়াত মানুষ খুন করেছে সেখানে কি ইমপ্রেশন হবে আওয়ামী লীগ খুন করেছে? তা হলে ন্যাচারাল জাস্টিস বলে কিছু থাকবে দেশে?

আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি কিন্তু সেই আইনের ব্যাখ্যাও কি বাস্তবতা বিবর্জিত হবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রধান নির্বাচন

কমিশনার ছিলেন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রায় প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে বিচারপতিরাই রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন বৈধ যা সভ্য দেশে জংলী আইন নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সরকারি সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সে আইন মেনেছেন কি?

তাই বলি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব নয়। 'মাওলানা' মান্নান যদি বলে ডা. আলীম আত্মহত্যা করেছে, তখন কি হবে? বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব হয়েছে, কারণ হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা কি তা করেছে? যদিও আমরা জানি সংবাদপত্রে তখন এ সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপা হয়েছে। এ ধরনের বিচারের জন্য সব সময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। সংবিধানেও তার বিধান আছে। সুতরাং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বাধা কি? এবং তাতে সরকারকেই বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। প্রচলিত আদালতে মামলা করলে তাদের মৃত্যু হবে কিন্তু আদালতের রায় শুনে যেতে পারবে না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন সহজ, কারণ, বাংলাদেশের তিনটি দলই নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবি করে। জেনারেল এরশাদকে তো এ কারণে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ 'রণবীর' উপাধিও দিয়েছিল। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে যদি ঐকমত্য না হয় তাহলে আন্তরিকতা ও ভণ্ডামির সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে।

আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে এবং আমরা আজ সেই ৩০ লাখ মানুষের পক্ষ থেকে বিচার চাইছি—যাঁরা তাঁদের বর্তমান বিসর্জন দিয়েছিলেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। আজ সবাই বিজয় দিবসের উৎসবে মগ্ন। একবার কি ভেবেছেন, ত্রিশ লাখের স্বজনের কথা যারা কান্না চেপে দেখছে এ উৎসব। আপনার কি মনে হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়?

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বইপত্র তেমন লেখা হয়নি-এ রকম একটা আফসোস এক দশক আগেও আমাদের ছিল। কিন্তু, স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পর বলা যেতে পারে, খুব একটা কমও লেখা হয়নি। তারপরই অবশ্য প্রশ্ন আসে, কী লেখা হয়েছে? বা যা লেখা হয়েছে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তার মূল্য কী?

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসতত্ত্ব নিয়ে যে খুব একটা লেখা হয়েছে তা নয়। বা কী লেখা হয়েছে তার সালতামামীও খুব একটা পাই না। অনেক আগে, প্রায় দু'দশক হতে চলল, প্রকাশিত হয়েছিল আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের *বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থাবলী*। এরপরও ছোটখাটো কিছু গ্রন্থপঞ্জি বেরিয়েছে তবে, সামগ্রিকভাবে একটি সালতামামি তৈরি করা হয়নি। হলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বইয়ের আলোচনা অনেক সংহত হতো। কারণ, আমরা প্রধানত ঢাকা থেকে প্রকাশিত বই দেখি কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা আমরা দেখিনি। এর মধ্যে অনেকগুলো একেবারে সাধারণ মানুষের লেখা। তৃণমূল মানুষ কীভাবে মুক্তিযুদ্ধকে বিচার করেছেন তার পর্যালোচনার জন্য ওই বইগুলো উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রথমেই 'মুক্তিযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' প্রত্যয় দুটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকে দুটি প্রত্যয়কে আলাদাভাবে বিচার করতে আগ্রহী এবং এতে যুক্তিও আছে। 'মুক্তিযুদ্ধ' প্রত্যয়টির পরিধি ব্যাপক, অন্যদিকে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' প্রত্যয়টির পরিসর সংকীর্ণ। কিন্তু এগুলো অ্যাকাডেমিক আলোচনা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধ একই অর্থ বহন করে। তবে, মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি বেশি পরিচিত ও জনপ্রিয়। আমিও সে দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সরাসরিভাবে যুক্ত বইগুলোকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

অ্যাকাডেমিকস এবং মুক্তিযুদ্ধকে একত্রে দেখতে গেলে প্রথমেই যে বইটির আলোচনা করতে হয়, তা হলো-*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৫ খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সংকলকরা দলিলপত্র সংগ্রহ করে বাছাই করেছেন। সেটি আবার প্রামাণ্যকরণ করা হয়েছে। প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্যরা ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমানের আমলে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় এবং ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয় এরশাদের আমলে।

প্রবন্ধে হাত দিয়ে সম্পাদনা পরিষদ দুটি বিষয় লক্ষ করেছিলেন, "প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব সংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়—বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাই সরকারি হওয়ায় এর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সন্দিহান..... ।"

সন্দিহান থাকারই কথা। কারণ, জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত মতাদর্শকে নিয়ে এগুচ্ছিলেন। কিন্তু তার সামনে সমস্যা ছিল বহুতর যে কারণে খুব সম্ভব ও প্রকল্প নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি। কিন্তু, অদৃশ্য চাপ ছিল। যে কারণে দলিলপত্রে জনপ্রিয় 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ জিয়াউর রহমান তখন এ শব্দটি প্রতিস্থাপিত করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল।

দলিলপত্রে, আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ১৫ খণ্ডের মধ্যে ১০ খণ্ডই প্রবাসী বা বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচিত। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ সে অনুপাতে প্রায় অনুপস্থিত। এর একটা কারণ হতে পারে, তখনো এ ধারণাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, যারা দেশ ত্যাগ করেছিলেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মানুষ না থাকলে যে যুদ্ধ হতো না এ বোধটিই মুক্তিযুদ্ধের লিটারেচারে অনুপস্থিত। বলা বাহুল্য এ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য শুভ কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি।

আরো আছে, তৃণমূল পর্যায়ে কীভাবে গণহত্যা চালানো হয়েছিল বা গড়ে তোলা হয়েছিল প্রতিরোধ তা অনুপস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল অথচ সেখানে স্বাধীনতা-বিরোধীদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে না? চট্টগ্রামের কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নতুন চন্দ্র সিংহের হত্যাকারী ফজলুল কাদের চৌধুরীর পুত্রের পরিচয় বদলে দেওয়া হবে? যদিও একটি পত্রিকা থেকে সেই সংবাদটি ছাপা হয়েছিল এবং তাতে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। বায়ান্নর কিছু কিছু দলিলও ভুল কপি করা হয়েছে। সন্দেহ প্রবণ কেউ হলে আর দোষ কী?

এ পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। দলিলপত্রের প্রামাণ্যকরণ বোর্ডে যারা ছিলেন তারা এর প্রতিবাদ করেননি কেন? আমাদের অ্যাকাডেমিশিয়ানরা সবখানে পদাধিকার বলে বুদ্ধিজীবীর ফলক পেতে চান কিন্তু দায়-দায়িত্ব নিতে চান না। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে দেশের পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গ্রন্থ প্রায় রচনা করেননি আজ ৩৫ বছর পরও। দু'একটি ব্যতিক্রম হতে পারে। অবাস্তব অনেক বিষয় নিয়ে তাদের গবেষণার যে আগ্রহ, কনসাল্টিং ব্যবসা নিয়ে তাদের যত আগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধ বা নিজের দেশের শেকড় অন্বেষার পিছে আগ্রহ তত কম। এতে আমাদের এলিট চরিত্রে কলোনি আচ্ছাদিত উদ্বাস্তু মনেরই পরিচয় পাই।

আরো পরে জামায়াত-বিএনপি আমলে পুনমুর্দ্রিত করা হলো এই দলিলপত্র। এখানে সরাসরি জালিয়াতি করে দলিলপত্র বদলে ফেলা হলো। এখানেও প্রামাণ্যকরণ কমিটি ছিল এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'প্রতিথযসা' শিক্ষাবিদরা। একজনও কোনো কথা বলেননি। তাদের আনুগত্য মুক্তিযুদ্ধ বা দেশের ইতিহাসের প্রতি নয়, ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দলের প্রতি এবং এক্ষেত্রে 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল' ও 'বিপক্ষের দলে' তফাৎ কম। এখানে ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বরং মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চর্চার পরিপ্রেক্ষিত ও কমিটমেন্ট বোঝা সহজ হবে।

এই আমলে (জোট) পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিকৃত, অদলবদল, দখল করা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের

শিক্ষক, ইতিহাস পরিষদ, ইতিহাস সমিতি, এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধারদের কাছে ধর্ণা দিলাম, অনুরোধ জানালাম এ বলে যে, এর একটি প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কারণ, এ ধরনের মিথ্যাচার পাঠ্য বইয়ে থাকলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভুল ধারণা করবে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এবং মুক্তিযুদ্ধের জেনারেশন হিসেবে ন্যূনতম সততা আমাদের থাকা বাঞ্ছনীয়। একজনও এগিয়ে আসেননি। এমনকি সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তিরা যাদের অনেকে কী বলে যেন বামপন্থী এবং মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক হিসেবে খ্যাত তারাও তেমন সাড়া দেননি। এর একটা কারণ এস্টাবলিশমেন্টকে তারা চটাতে চায়নি।

ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র নামে একটি ছোট গবেষণা কেন্দ্র আছে। একবার তারা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের একটি বড় অনুদান পেল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গবেষণা করার। অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমদ আমাকে এর দায়িত্ব দিলেন কেন্দ্রের পক্ষে। আমি আরো দু'জন গবেষক নিয়ে এক বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে তৃণমূল পর্যায়ে এক হাজারজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলাম। প্রকল্পের পুরো ডিজাইনটি করার ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে আমার উদ্যমও কম ছিল না। এক বছরের প্রকল্প যাতে দু'বছর করা যায় সে জন্য টাকা বাঁচিয়েছিলাম। সবকিছু সংগ্রহ হলে, এক বছর পর কোনো কিছু না বলে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। সেই গবেষক দু'জন এবং কেন্দ্রের আরেকজন স্মার্ট ভদ্দরলোক এই কাজটি করেছিলেন। পরে সেই দু'জন গবেষক থেকে আরেকজনকেও সরানো হলো। পরে বাকী ওই দু'জন লোক খণ্ডে খণ্ডে সেই সংকলন করে মুক্তিযুদ্ধের গবেষক হিসেবে কৃতিত্ব নিচ্ছেন। কিন্তু, পুরো বিষয়টি কীভাবে সাজাবো তা নিয়ে যেহেতু আগে পুরোপুরি আলোচনা হয়নি, সে কারণে দুর্বোধ্যভাবে বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একেকটি সংকলন বেরুচ্ছে।

এ দু'টি ঘটনা উল্লেখ করার কারণ দু'টি- আমরা মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে দেখি। এক, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রয়োজন, এ থেকে আমরা যতটা পারি সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করব, দুই, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ উদ্ভূত মূল্যবোধ রক্ষায় আমরা আগ্রহী নই কারণ তাতে ঝুঁকি থাকতে পারে। এ মনোভাবের কারণেই অ্যাকাডেমিশিয়ান-এলিটরা মুক্তিযুদ্ধের লিপ সার্ভিসে যতটা আগ্রহী কমিটমেন্টে নয়। এবং তা ছায়া ফেলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বৃত্তান্ত রচনায়ও। বা মুক্তিযুদ্ধ চর্চায় আগ্রহী নয় এ কারণে যে, এটি এখন *বিতর্কিত*। মুক্তিযুদ্ধ এলে ২৫ মার্চ আসবে তখন আমরা কোন পক্ষ নেব? উদাহরণ স্বরূপ এশিয়াটিক সোসাইটির 'বাংলাপিডিয়া'র কথা বলা যায়। বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোষগ্রন্থ, অথচ এখানে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা কে দিয়েছিলেন তা আমরা জানতে পারি না। এটিও এক ধরনের বিকৃতায়ন।

স্বাধীনতার দলিলপত্র-এর পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতিতে প্রশ্নটিও আলোচনা করা যেতে পারে। এর প্রথম দু'খণ্ড পটভূমি সংক্রান্ত। এবং সে পটভূমির ব্যাপ্তি বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। তাই প্রশ্ন ওঠে, মুক্তিযুদ্ধের বীজ কি উপ্ত হয়েছিল ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সময়? এর অর্থ কি সেই থিসিস যে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ চেয়েছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মুসলমানরা বাংলাদেশ চেয়েছে এবং তারই

ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করেছেন এবং এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছেন? অর্থাৎ, মুক্তিযুদ্ধ কি একটি বিচ্যুতি মাত্র? এ পরিপ্রেক্ষিতে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের একটি মন্তব্য স্মর্তব্য। লিখেছেন তিনি, "এই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের কলোনিয়াল অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবকে বিচ্যুত করা হয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সশস্ত্র সহযোগিতাকে 'ক্ষুদ্র বিচ্যুতি' বলে চিহ্নিত করা হয়। যুদ্ধাপরাধকে বৈধতা দেওয়া হয় 'অতীতের ঘটনা' হিসেবে এবং অতীতের 'বর্তমানের সমস্যা নয়।' ... আওয়ামী লীগকে বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিরোধিতা শুরু করেন ও মুক্তিযুদ্ধকে রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ... মুক্তিযুদ্ধ কি নষ্ট করার যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ধর্ম রক্ষা করার যুদ্ধ ...।"

এ সব বিষয় সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে একটি সিদ্ধান্তে বোধহয় পৌঁছানো যায়, রাষ্ট্র ক্ষমতা আমাদের ইতিহাসকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। অ্যাকাডেমিশিয়ানরা এই প্রভাব বলয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান, তাদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়। পদ্ধতির যেই প্রশ্নটি তুললাম সে প্রসঙ্গে আবার পরে ফিরে আসব।

এ ধরনের দলিলপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত দু'খণ্ডের *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস* যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিন আগে প্রকাশিত মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের দলিলপত্রও উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ডকুমেন্টস মূলত ১৯৭১ সালের ঘটনার ওপরই কেন্দ্রীভূত। প্রাক-বাংলাদেশ পর্বের নথিপত্রও আছে। যেমন, বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা থেকে শুরু। বা ধরা যেতে পারে ৬-দফাকে বাংলাদেশ আন্দোলনের শুরু হিসেবে ধরা হয়েছে যা অনেকটা যুক্তিযুক্ত। খণ্ড দু'টি করা হয়েছিল প্রধানত বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচারমূলক তথ্যের সংকলন হিসেবে। সে কারণে এর বড় একটা অংশ জুড়ে আছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকে বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদাবলীর সংকলন।

রোয়েদাদ খান সংকলন করেছেন *দি আমেরিকান পেপার্স (ঢাকা. ১৯৯৯) ও দি ব্রিটিশ পেপার্স (করাচি, ২০০২)*। প্রথমটিতে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নথিপত্র এবং দ্বিতীয়টিতে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারে গোপন নথিপত্রের সংকলন। উভয় গ্রন্থে ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কিত নথিপত্রও আছে। মূলত দু'টি দেশ এই উপমহাদেশে ঘটনাবলী কীভাবে বিশ্লেষণ করেছে তা গ্রন্থ দু'টিতে পাওয়া যাবে। সুকুমার বিশ্বাস সংকলন করেছে মুজিবনগর সরকারের নথিপত্র *বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, মুজিবনগর গভর্নমেন্ট ডকুমেন্টস, ১৯৭১*, (ঢাকা, ০৫)। এ সংকলন মূলত বাংলাদেশ সরকারের কিছু প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি মুখপত্র *বাংলাদেশ* এর সংকলন। এতে বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে একটি ধারণা করা অবশ্য মুশকিল। তবুও, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী চিন্তা-ভাবনা করেছিল তা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। এ সূত্রে এএমএ মুহিতের *আমেরিকান রেসপন্সেস টু বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার* (ঢাকা, ১৯৯৬) গুরুত্বপূর্ণ। সংকলনটি সুসংহত এবং ভূমিকাটিও প্রয়োজনীয়। মার্কিন সরকার ও মানুষ কীভাবে বিচার করেছে বাংলাদেশ আন্দোলন ও সেখানে বাঙালিরা কী করেছে তা বোঝার জন্য এটি

প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে আরেকটি নথিপত্র সংকলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলো এনায়েতুর রহিম ও জয়েস এল রহিমের *বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড দি নিক্সন হোয়াইট হাউস* ১৯৭১ (ঢাকা, ২০০০)। মুসা সাদিকের *বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম* (ঢাকা, ২০০০)।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বইগুলোকে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, এ বিভাজন খুব একটা বিজ্ঞানসম্মত কিছু নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি যেসব বই দেখেছি তার ভিত্তিতেই এ বিভাজন। প্রকাশিত বইগুলোকে কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি—

১. মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন
২. অবরুদ্ধ দেশ
৩. ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার। সংগঠন
৪. রণাঙ্গন
৫. আঞ্চলিক ইতিহাস
৬. জন প্রতিক্রিয়া
৭. শত্রু কথন
৮. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ

অন্যান্য অনেকে বিভিন্নভাবে বিভাজন করেছেন বা করবেন। তবে, উপযুক্ত বিভাজন বা প্রতিটি বিভাগই স্বতন্ত্র বা নির্দিষ্ট কোনো বিভাজন নয়। কারণ, রণাঙ্গন সম্পর্কিত গ্রন্থেও বর্ণনা আছে প্রবাসী সরকারের, আবার অবরুদ্ধ দেশ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় উল্লিখিত হয়েছে রণাঙ্গন সম্পর্কিত আলোচনা তবে, অধিকাংশ বইয়ে কখনো কখনো সংযোজিত হয়েছে লেখকের স্মৃতিচারণও।

সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস

যদিও এ বিভাগের শিরোনাম সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এসব বইয়ে সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হয়েছে। তবে, সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার যে চেষ্টা হয়নি তাও নয়। অনেকে এ উদ্যোগ নিয়েছেন, এ শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রুপের অবদান, ভূমিকা ইত্যাদি। কারণ, সার্বিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আমি কিছু বইয়ের উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে–

মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা, ১৯৯২)
মাহবুবুল আলম, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত* (চট্টগ্রাম, ১৯৭৬)
সালাহউদ্দীন আহমদ প্রমুখ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা, ১৯৯৭)
রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ঢাকা, ১৯৯২)
আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব* (ঢাকা, ২০০০)
এ এস এম সামছুল আরেফিন (সম্পাদিত) *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা* (ঢাকা, ২০০০)

মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, (ঢাকা, ২০০১)
আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, (লন্ডন, ১৯৮৯)
আব্দুল মতিন, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালী*, (ঢাকা, ২০০৫)
শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান* (ঢাকা, ১৯৯৮)
তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, (ঢাকা, ২০০১)
খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, (ঢাকা, ১৯৯৮)
সুকুমার বিশ্বাস, *জাপান অ্যান্ড দি ইমারজেন্স অব বাংলাদেশ*, (ঢাকা, ১৯৯৮)
এস এ জালাল, *জাপানস কন্ট্রিবিউশন ইন দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ*, (ঢাকা, ২০০২)
রনজিত সিংহ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের মনিপুরী সমাজ*, (ঢাকা, ১৯৯৭)
প্রণব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, (ঢাকা, ১৯৯৩)
মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*
তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে*, (ঢাকা, ২০০১)
আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি*, (ঢাকা, ১৯৯৮)
সুনীল পেরেরা প্রমুখ সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে আমরা, খ্রীষ্টানদের অবদান*
সোহরাব হাসান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা*, (ঢাকা, ১৯৯৯)
এসব বইয়েও আগে উল্লিখিত পদ্ধতিগত কিছু সমস্যা আছে। যেমন, রফিকুল ইসলামের গ্রন্থের শুরু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে। ১৪৩ পৃষ্ঠার বইয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত বিবরণে ব্যয় হয়েছে ৮০ পৃষ্ঠা। শামসুল আরেফিনের বইয়ে যেসব পুলিশ শহীদ হয়েছেন তাদের বিবরণ। এ রকম আরেকটি বিবরণ গ্রন্থ আসাদ চৌধুরীর *যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ*। এসব গ্রন্থে উপাত্ত আছে, সেগুলো বিশ্লেষণ মূল ইতিহাসের উপাদান হতে পারে। হাননানের বইয়ে ১০৪ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে '*আদি বাংলা ও বাঙালীর রাজনৈতিক সংগ্রাম*' থেকে '*উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*' পর্যন্ত। বইয়ের শিরোনামে একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আব্দুল মতিনের বইটি ১৯৮৯ সালে নাম স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২০০৫-এ নাম মুক্তিযুদ্ধ বই প্রায় একই। আসলে, ১৯৭১ সালে যখন লড়াই হয় তখন তা মুক্তিযুদ্ধ নামেই পরিচিত ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। তাই ১৯৭১ সালের লড়াইকে স্বাধীনতা সংগ্রাম না বলে মুক্তিযুদ্ধবলে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়। মনিপুরী সমাজ এর ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৯০১ থেকে।
এ ধরনের বইগুলো রচিত হওয়ার একটি কারণ আছে বোধহয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হতে থাকলে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গ্রুপ নিজেদের উপেক্ষিত মনে করে। সুতরাং, হাতের কাছে পাওয়া তথ্য দিয়েই গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন, যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় নারী মুক্তিযোদ্ধা বা নারী অ্যাক্টিভিস্টরা এগিয়ে আসেন নারী মুক্তিযোদ্ধা ও নারীদের বিষয় তুলে ধরার জন্য। সামরিকায়ন জোরদার হলে বিডিআর, পুলিশরা নিজেদের উপেক্ষিত মনে করেন। সুকুমার বিশ্বাস রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল্‌স্ ও অন্যান্য বাহিনী (ঢাকা, ১৯৯৯)। এটির ইংরেজী ভাষ্য প্রকাশিত হলে তা নিষিদ্ধ করা হয়।
বিদেশী গবেষক/লেখকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কিছু রচনা করেছেন। সেসব গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করছি না, তবে কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করছি–

রিচার্ড সিসোন ও লিও.ই.রোজ. *ওয়ার অ্যান্ড সেসেশন : পাকিস্তান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ*, (করাচি, ১৯৯২)
সুচেতা ঘোষ, *দি রোল অব ইন্ডিয়া ইন দি ইমারজেন্স অব বাংলাদেশ* (কলকাতা)
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সহায়ক সমিতি, *এ ন্যাশন ইজ বর্ণ* (কলকাতা, ১৯৭৮)
সুভাষ সি কাশ্যপ (সম্পাদিত) বাংলাদেশ, *ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড পার্সপেকটিভস* (নিউ দিল্লি, ১৯৭১)
জে.এল.দীক্ষিত, *লিবারেশন অ্যান্ড বিয়োন্ড* (ঢাকা, ১৯৯৯)
উল্লিখিত বইয়ের মধ্যে কয়েকটি বই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস নয় বটে কিন্তু উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতির ওপর রচিত তাজুল মোহাম্মদের *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে* আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এ বইয়ে লেখকের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কমিটমেন্ট বা প্যাশন চোখে পড়ার মতো। বইটি রচিত ১৯৭৫ সালের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। 'পূর্বকথন'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন- "মুক্ত স্বদেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধী তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে প্রথম যেন হোচট খেলাম। '৭৫-এর মর্মান্তিক ঘটনায় হয়ে পড়ি হতবাক। পরবর্তী বছরগুলো ছিল খুবই ঘটনাবহুল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল-আমি ঘুরেছি বিভিন্ন জনপদ। সর্বত্রই চোখে পড়েছে গণকবর। স্বজনহারা মানুষের হাহাকার। প্রথম উপলব্ধি করি, 'সারা বাংলা বধ্যভূমি'।
কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গণহত্যার কাহিনীগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করি আমি। কখন সংঘটিত হয় ঘটনা। এর পেছনের কারণগুলো, এলাকার কোন কোন দালাল বা রাজাকার আলবদরের ভূমিকা ছিল মুখ্য, কতজন নিহত হন, আহত হয়ে বেঁচে আছেন যারা। সম্ভ্রম হারিয়েছেন যেসব নারী, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য ঘটনার শিকার হয়েছেন এমন সব লোকের তালিকাও বেরিয়ে আসে।"
এই ইতিহাসের খোঁজ করতে করতে তিনি নির্মাণ করে ফেলেন তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যা আমাদের জন্য জরুরি।
বিশেষভাবে উল্লেখ্য মুহিতের বইটিও। মুহিতের বইটি সুসংহত এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা। একটি জাতি ও জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব কীভাবে হলো তার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্য এটি প্রয়োজনীয়। তবে, এ ক্ষেত্রে আমি মাহবুব উল আলমের বইটির উল্লেখ করতে চাই। দেশকে কতটা ভালোবাসলে বৃদ্ধ বয়সে আশক্ত শরীরে প্রায় এগারোশ' পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনা করা যায় তার প্রমাণ এই বই। প্রথম আলাদা আলাদাভাবে চারখণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে চারখণ্ড একত্র করে প্রকাশ করেন। তার ভূমিকায় তিনি কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, যা এখনো প্রাসঙ্গিক বা এখনো আমরা সেইসব প্রশ্নই উত্থাপন করি।
১. "আমি রেকর্ড হিসেবে এই ইতিবৃত্ত রচনা করেছি। জাতির জীবনে এই রেকর্ডের প্রয়োজন রয়েছে। আমি যা পারলাম করলাম। আমার উনাশি বৎসর বয়স। পরে যেন কেউ না বলেন, মাহবুব উল আলম তো ছিলেন। একটা রেকর্ড তৈয়ার করলেন না কেন?"

২. "বাংলাদেশ হওয়ার পর এটা ধরা পড়েছে যে, বাংলাদেশের একখানা উপযোগী ও সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা হওয়া প্রয়োজন।... সরকারকে মাসিক তিন হাজার টাকা ব্যয়ের একটা স্কিম দিয়েছি। আমার প্রস্তাব এই যে 'এক্সটারনেল প্রোগ্রাম' আবার চালু করা হোক। ইতিহাসের আঞ্চলিক উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়া এই সঙ্গে শহীদদের তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা হোক।"

রেকর্ড, এই রেকর্ড ১৯৭১ থেকে আমরা যথাযথভাবে রক্ষা করিনি দেখে আজ তথ্যের এতটা অভাব। যেমন ১৯৭১ সালের সরকারের রেকর্ডপত্র সব কোথায়? একটা সরকার গঠিত হলো, তার অধীনে যুদ্ধ হলো, একটা দেশ স্বাধীন হলো তার নথিপত্র সব কোথায়? আজ পর্যন্ত কেউ তার হদিস দিতে পারেনি। এ সম্পর্কে কোনো তদন্ত হয়নি। এই হারিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা একটি বড় ধরনের অপরাধ। কোনো সরকার, ঐতিহাসিক এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। তাতে পুরনো প্রশ্নের সঙ্গে আবার নতুন প্রশ্নও এসে যায়, যারা সরকার গঠন করেছিলেন তাদের সবাই কতটুকু এ দেশটি চেয়েছিলেন? না, না চাইতেই পেয়েছেন? এরপর তিন হাজার টাকার একটা স্কিমও কোনো সরকার নিতে পারল না? এ পরিপ্রেক্ষিতেই আরো জানা যায় ৩৬ বছরে কোনো সরকার মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর করল না। কেমন তা'হলে আমাদের দেশাত্মবোধ? মাহবুব আলম ওই গ্রন্থে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন–

৩. "আমাদের গোড়ার কাজই বাকি। শহীদদের তালিকাই এখনো সংগৃহীত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি মুক্তিযোদ্ধাদের এ কাজে লাগানো হতো তা'হলে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে লাগাতে এবং খেলাতে না পারার দরুন মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্রে যে অপহ্নব (অপবাদ?) ঘটেছে সেটা আর আমাদের দেখতে হতো না। আর তখন তালিকা তৈয়ার করার মতো সম্ভাবনা ছিল।"

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হয়েছে, শহীদ বা রাজাকারদের নয়। এবং মুক্তিযোদ্ধারা পুরস্কৃত হতে চেয়েছেন। কেন পুরস্কৃত হতে চাইলেন এই মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে হয়ত পরবর্তী কালের ঘটনাপ্রবাহের কারণ বোঝা যেতে পারে। এর কারণ কি এই যে বাঙালি চিরদিন ছিল গরিব, বঞ্চিত, আর ভুগেছে অনেক ক্ষেত্রে হীনমন্যতায়। এখনো সেই তালিকা সম্পন্ন হয়নি। বস্তুত এই তালিকা দেশের মানুষকে বিভাজিত করে ফেলেছিল। যা পরে শুভ হয়নি। অবরুদ্ধদেশে জীবনযাপনকারী মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অপাঙক্তেয় করে তোলা হয়েছিল। কথাটি কেউ কখনো অনুধাবন করেনি, এতে মুক্তিযোদ্ধাদের আর লোকাস স্ট্যান্ডি থাকেনি কারণ তখন প্রশ্ন ওঠে, তারা কার জন্য যুদ্ধ করেছিল? যে প্রশ্নটি মাহবুব আলম নিজেকে করেছেন ৩০ বছর আগে, সে প্রশ্নে এখন আমরা নিজেদের করি মাঝে মাঝে–

৪. "মুক্তিযুদ্ধে জয় সত্ত্বেও আমাদের জন্মলগ্নে আমরা সব বিরোধিতার শিকার হয়ে গেছি। যারা যুদ্ধ করেছে তারা ক্ষমতায় আসেনি। আর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা যুদ্ধ করেনি। চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে স্লোগান-সর্বস্ব রাজনীতি করে তারা ক্ষমতায় এসেছিল।"

আসলে, যদি সার্বিক ইতিহাস লিখতে হয় তা'হলে এ রকম প্যাশন নিয়ে লেখা যুক্তিযুক্ত। যে প্যাশন নিয়ে কাজ করেছেন তাজুল মোহাম্মদ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

রচনায় প্যাশন থাকবে না, থাকতে হবে যা অনেকে বলেন কোনো নৈর্ব্যক্তিকতা তা আমি সমর্থন করি না। স্ববিরোধিতা থাকুক, ভুলত্রুটি থাকুক, এটি অস্বীকারের উপায় নেই। সারা দেশের মানুষ একটা প্যাশন নিয়ে একটি দানব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতেছিল। সেই প্যাশন ইতিহাসে না থাকলে তা রক্তশূন্য বাংলাদেশ সরকার সংগঠন ইতিহাস হবে মাত্র।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ছিল বিভিন্ন সংগঠন। তবে, প্রবাসী সরকার তার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধারণা [যার অধিকাংশই বিরূপ] তৈরি হয়েছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার, তার নেতৃবর্গ, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্য সহায়তা বা বিরোধিতা সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। তবে, এ সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যা কম। বিভিন্ন স্মৃতিচারণা বা অন্যধরনের গ্রন্থে, প্রবাসী সরকারের কাঠামো, বিভিন্ন সেক্টর সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং তা সবই একই রকম।

এ ধারার যে বইগুলো আমার নজরে পড়েছে তা হলো-

সুকুমার বিশ্বাসের মুজিবনগর : *গভর্নমেন্ট ডকুমেন্টস ১৯৭১* (ঢাকা, ০৫)

এইচ, টি, ইমামের *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা, ০৪)

শামসুল হুদা চৌধুরীর *মুক্তিযুদ্ধের মুজিব নগর* (ঢাকা, ১৯৮৫)

বেলাল মোহাম্মদের *স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র* (ঢাকা, ১৯৮৫)

মঈদুল হাসানের *মূলধারা '৭১*,

জাহিদ হোসেন প্রধান সম্পাদিত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস (ঢাকা, ০৫) প্রভৃতি। এইচ.টি.ইমাম ছিলেন সরকারের কেবিনেট সচিব, সে হিসেবে সরকারের কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়ে তারই জানার কথা বেশি। তার গ্রন্থটি কিছুটা স্মৃতিচারণা বাকিটুকু সরকারের সংগঠন, কাঠামো, তৎপরতা, অবদান সম্পার্কিত। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে সামগ্রিক একটি ধারণার জন্য তার গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বেলাল মোহাম্মদের বইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গুরুত্ববহ। তিনি এই বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণা যা নিয়ে আজ এত বিতর্ক সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে ওই গ্রন্থে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মঈদুল হাসানের *মূলধারা '৭১*। তিনি ছিলেন যুদ্ধের সংগঠকদের একজন, প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠজন। তাঁর বইতে মূলতপ্রবাসী সরকার, সংগঠন, আওয়ামী লীগের অন্তর্বিরোধই আলোচিত হয়েছে। বাম ঘেঁষা তাজউদ্দীন আহমদ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার টিকিয়ে রেখেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ আছে এ গ্রন্থে। লেখক মূলধারা বলতে হয়তো এটিকেই বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে খোন্দকার মোশতাকের অনুসারী ও অন্য নেতাদের দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদের বিবরণও আছে বইটিতে। তথ্যের দিক থেকেও গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যতগুলো বই পড়েছি তার কোনোটিতে একমাত্র তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে কোনো বিরূপ

মন্তব্য নেই। এতদিন পর আরো স্পষ্ট হয়ে আসছে যে, তাজউদ্দীন আহমদ না থাকলে প্রবাসী সরকারের পক্ষে টিকে থেকে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠত। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পেশাদার অ্যাকাডেমিশিয়ানদের একজন না হওয়া সত্ত্বেও মঈদুল হাসানের বইটি পেশাদার ভঙ্গিতে লেখা।

অবরুদ্ধ দেশ

একটি সময় ছিল যখন মনে করা হতো ১৯৭১ সালে যারা দেশ ত্যাগ করেছিলেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী, দেশে যারা ছিলেন তারা নয়। হয়তো পঞ্চাশ বছর পর সে কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু গত একদশকে অবরুদ্ধ দেশ নিয়ে যথেষ্ট বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে স্মৃতিকাহিনীর সংখ্যা বেশি। আছে নির্যাতন, গণহত্যা নিয়েও। স্মৃতি কাহিনীর আবার রকমফের আছে। শিল্পী সাহিত্যিকদের লেখা, বিদেশীদের লেখা, নারীদের লেখা, মফস্বলের একেবারে সাধারণের লেখা। এতে আমরা উপকৃত হয়েছি। কারণ, তাহলে ইতিহাস বুননে এলিটিস্ট ঝোঁকটা কমবে। প্রথমদিকে, নির্ধারিত নারী, গণহত্যা, ইত্যাদি বিষয়ে লেখকদের নজর পড়েনি। নারীদের বিষয়টি অনেকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যেন এটি লজ্জার। এখন সে এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব কমেছে।
উল্লেখ করব–
সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর* (ঢাকা, ২০০০)
ডা.এসএ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ* (ঢাকা, ২০০১)
আতোয়ার রহমান, *একাত্তরের নির্যাতন*, (ঢাকা, ১৯৯২)
তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা* (ঢাকা, ১৯৮৯)
সুকুমার বিশ্বাস, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিকজান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, (ঢাকা, ২০০১)
নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (ঢাকা, ১৯৯৪)
বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি* (ঢাকা, ১৯৯১)
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্নাল '৭১* (ঢাকা, ১৯৭৩)
জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি* (ঢাকা, ১৯৮৬)
লায়লা সামাদ, *কড়চা '৭১*
আবুল ফজল, *দু'দিনের দিনলিপি ও অন্যান্য চিন্তা*
সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, (ঢাকা, ১৯৮৯)
মন্টু খান, *হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন* (ঢাকা ১৯৯০)
পান্না কায়সার, *মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে* (ঢাকা, ১৯৯১)
বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* (চট্টগ্রাম, ১৯৮৯)
মুহাম্মদ আবদুশ শাকুর, *ময়মনসিংহে একাত্তর* (ঢাকা, ২০০০)
আব্দুল মান্নান খান, *১৯৭১ : এক সাধারণ লোকের কাহিনী* (ঢাকা, ২০০০)
মোঃ হরমুজ আলী খান, *বিস্মৃতির অতলে একাত্তর* (যশোর, ১৯৯৩)
দুলাল ভূষণ মজুমদার, *মিজো পাহাড়ে* (চট্টগ্রাম, ১৪০১)
নাজিম মাহমুদ, *এখন ক্রীতদাস*।

উল্লিখিত বইয়ের মধ্যে জাহানারা ইমামের বইটি এখন ক্লাসিকসের মর্যাদা পেয়েছে। বইটি নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মন্টু খানের বইটি পড়লে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। আনিসুজ্জামান ঠিকই লিখেছেন, "এই লেখাটি পড়তে পড়তে বারংবার স্তম্ভিত হয়েছি, বিস্ময় বিমূঢ় হয়েছি, শারীরিক যন্ত্রণাবোধ করেছি, পড়া বন্ধ রেখেছি। ... বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন একজন মানুষকে কী মূল্য দিতে হয়েছে, সে কথা আমাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য।" এখন ক্রীতাদাসও উল্লেখ্য, হাসান আজিজুল হক মন্তব্য করেছেন, "এ বইটি আগুন আর অশ্রু দিয়ে লেখা... এই বই পড়ার পর আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে বলে মনে হয়। বাসন্তী গুহ ঠাকুরতার বই পড়ে মনে হয়, কীভাবে আমরা ওই দিনগুলো পেরিয়েছিলাম। এখন তো আর তা বিশ্বাস হয় না। মুশতারী শফীর বইয়ে অবরুদ্ধ দেশ বিশেষ করে প্রথমদিকের দিনগুলো এবং প্রবাসীদের জীবনযাপনের বিবরণ আছে। এই বইটি অকপটে লেখা। এ বিবরণে পাই রাজনৈতিক নেতাদের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত যার ফলে শহীদ হন লেখিকার স্বামী ও একমাত্র ভাই, মারা যান পূর্ণেন্দু দস্তিদার। দেখা যায় সেই রাজনৈতিক নেতা শহীদ পরিবারের কোনো খবর না নিয়ে চলে যান কলকাতা। খবর পাই কীভাবে সৈয়দ আলী আহসানকে চট্টগ্রামের জনসভায় মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে আইয়ুব খানের অনুসারী বলে। প্রবাসী সরকারের অনেক নেতা মাতাল হয়ে কীভাবে দিনযাপন করেছেন বা রাজনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ কীভাবে সবার থেকে আলাদা হয়ে আলাদা টিলার এক বৃহৎ বাড়ি নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করেছেন। অবরুদ্ধ দেশ এবং প্রবাসের এ ধরনের চিত্র অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন মুশতারী শফী যা মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন নেতৃবর্গের অবদানের মিথ ভাঙতে সাহায্য করবে।

গণহত্যা, নির্যাতন নিয়ে অনবরত লেখা উচিত। আমার ধারণা, গণহত্যা ও বধ্যভূমি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ এখনো আমরা করতে পারিনি। যদিও ডা. হাসান ও সুকুমার কিছু কাজ করেছেন। নির্যাতন নিয়ে কিছু সংকলন বেরিয়েছে কিন্তু তাও যথেষ্ট নয় বলে আমার ধারণা।

এক কথায় উল্লেখ করা যায়, এসব বইয়ে ফুটে উঠেছে অবরুদ্ধ অসহায় মানুষের ভয়, আর্তি, যাতনা এবং এর বিপরীতে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা, দৃঢ়তা, সাহস ও প্রতিরোধের কাহিনী। এ বইগুলো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে স্বাধীনতা কারো দান নয়, অশেষ আত্মত্যাগের বিনিময়ে তা অর্জিত এবং মুক্তিযুদ্ধ গুটি কয়েক মুক্তিযোদ্ধা, দেশত্যাগীর নয়, মুক্তিযুদ্ধ ছিল গোটা বাংলাদেশের আপামর বাঙালির।

সামরিক ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ গাথার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন বা সাক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিবরণ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত বইয়ের একটা বড় অংশে রণাঙ্গনের বিষয়টি কোনো না কোনোভাবে এসেছে। প্রথমদিকে, এ বিষয়ে অধিকাংশ বই লিখেছেন যারা জড়িত ছিলেন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে। ধরে নেওয়া হতো, যুদ্ধ সম্পর্কে তারাই জানেন বেশি। এবং একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, সামরিক বাহিনীর যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্যই স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৫

সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর এ বিষয়টির ওপর আরো গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সামরিক শাসনের যৌক্তিকতা পরোক্ষ তুলে ধরার জন্য। তবে, আশির দশকের শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে নব্বই দশকে অসামরিক ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযুদ্ধে যাদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি তাদের অনেকে বই লেখা শুরু করেন। ফলে এ বিষয়ে একটি ভারসাম্য ফিরে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে প্রচলিত যুদ্ধ হয়েছে, গেরিলাযুদ্ধও হয়েছে। দু'টি ধারাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে গেরিলা ধারাটি হয়তো বিস্মৃত অধ্যায়ে পরিণত হতো যদি শেষোক্তরা বই না লিখতেন।

সামরিক বাহিনীর যাঁরা বই লিখেছেন, প্রথমে তাঁদের একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ* (ঢাকা, ১৯৯৫) এবং বাংলাদেশ অ্যাট ওয়ার (ঢাকা, ১৯৯৮)

মেজর নাসিরউদ্দিন, *যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা* (ঢাকা, ১৯৯২)

কর্ণেল শাফায়াত জামিল, *মুক্তির জন্য যুদ্ধ* (ঢাকা, ১৯৯৯)

মেজর আখতার আহমেদ, *বারবার ফিরে যাই* (ঢাকা, ১৯৯৪)

মেজর এমএসএ ভূঁইয়া, *মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস* (ঢাকা, ১৯৮৫)

মেজর এমএ জলিল, *সীমাহীন সমর* (ঢাকা, ১৯৭৪),

মেজর রফিকুল ইসলাম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে (ঢাকা,)

এগুলি হলো যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের লেখা। রণাঙ্গন নিয়ে আরো কিছু বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লে, কর্নেল এসআইএম নূরন্নবী খান বীর বিক্রমের লেখা ৬টি বইয়ের একটি সিরিজ। বইগুলো হলো-

অপারেশন ছাতক (ঢাকা, ১৯৯৯)

রৌমারী রণাঙ্গন (ঢাকা, ১৯৯৮)

অপারেশন গোয়াইনঘাট (ঢাকা, ১৯৯৯)

অপারেশন রাধানগর (ঢাকা, ১৯৯৯)

অপারেশন বাহাদুরাবাদ ঘাট (ঢাকা, ২০০১)

অপারেশন সালুটিকর (ঢাকা, ২০০০)।

একই ধরনের ৬টি বইয়ের সিরিজ লিখেছেন ডা, মাহফুজুর রহমান,

বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ নামে (চট্টগ্রাম, ১৯৯৫)

কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান লিখেছেন *মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমান্ডো অভিযান* (ঢাকা, ১৯৯৭);

হুমায়ুন হাসান, মুক্তিযুদ্ধের জলসীমায় (ঢাকা, ১৯৯৪)।

এর বিপরীতে লিখেছেন যারা সেনাবাহিনী থেকে যাননি, বেসামরিক নাগরিক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, গেরিলা যুদ্ধ করেছিলেন। প্রাক্তন গেরিলারা যে বেশি বই লিখেছেন তা নয়। তবে, উল্লেখযোগ্য কিছু বইয়ের তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

হোসেন তারেক বীর বিক্রম, *জলছবি, '৭১* (ঢাকা, ২০০০);

মাহবুব আলম, *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে* (দুই খন্ড, ঢাকা, ১৯৯২, ১৯৯৩)

কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, *স্বাধীনতা '৭১* (দুই খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৫)
লে, কর্ণেল এসআইএম নূরুন্নবী খান, *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী*
আখতারুজ্জামান মণ্ডল, *১৯৭১ : উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়*।

রণাঙ্গন নিয়ে লেখা বইগুলোর ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন, রণাঙ্গন বিশেষজ্ঞরা। তবে, কিছু বইয়ের পাতা উল্টে মনে হচ্ছে, যে কোনো রণাঙ্গন সম্পর্কে সবক'টি বিবরণ একসঙ্গে নিয়ে ক্রস রেফারেন্সের মাধ্যমে সঠিক তথ্য নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, রণাঙ্গন সংক্রান্ত তথ্যে গরমিলের পরিমাণ বেশি।

২০০৬

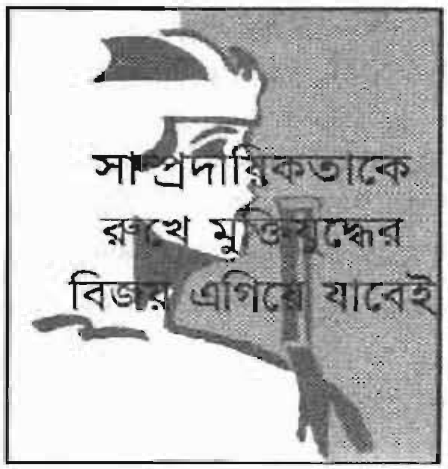

সকালে দেখি একটি মাদ্রাসার ব্যানার হাতে শ-দুয়েক তরুণ শ্লোগান দিয়ে মিছিল করছে। পরনে তাদের পায়জামা-পাঞ্জাবি ও মাথায় টুপি। কিন্তু হাতে তসবিহ্‌র বদলে লোহার রড ও লাঠি। মিছিলটিতে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। বাবরি মসজিদ ভাঙার মতো জঘন্যতম কাজ এবং মসজিদটি রক্ষায় ভারত সরকারের ব্যর্থতার জোরালো প্রতিবাদ অবশ্যই হওয়া উচিত। যে কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় ভাঙারই প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু হাতে লোহার রড বা লাঠি কেন? লাঠি ও লোহার রড থাকার কারণ বোঝা গেল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বেছে বেছে দোকান লুট হতে লাগল। এদের সঙ্গে যোগ দিল লুটের অপেক্ষায় থাকা দুষ্কৃতিকারীরা। মন্দিরে মন্দিরে চলল হামলা। পরদিন জানা গেল সারাদেশ জুড়ে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে, মন্দির ভাঙা হয়েছে। এবং সবখানে হামলাকারীদের চরিত্র ছিল এক।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে কি এ ধরনের ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয় যে ছাত্ররা রড হাতে অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ভাঙবে, লুট করবে বা রাজনৈতিক দলের অফিসে আগুন জ্বালাবে? শুধু তা-ই নয়, ধার্মিক মুসলমানদের পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি ও টুপির তারা অবমূল্যায়ন করছে। এ পোশাক পরে তারা ১৯৭১ সালে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তাদেরই দেশের মুসলমানদের ওপর এবং এখনো চালাচ্ছে। আমরা তো আগে দেখেছি ও জানি, পাজামা-পাঞ্জাবি ও টুপি পরিহিত মানুষ মানবিক ধর্মের প্রতীক এবং তার হাতে যদি কিছু থাকে তাহলে তা হয় তসবিহ্‌?

বাংলাদেশে মুসলমানত্ব ও ইসলাম রক্ষার একচেটিয়া ইজারা এসব মাদ্রাসার ছাত্র, জামায়াতে ইসলাম, ফ্রিডম পার্টি ও তাদের অনুসারী ছোট ছোট দল বা আল-বদরীয় মুখপত্র 'ইনকিলাব'কে দেওয়া হয়নি। তাদের ভাবটা এই এবং তাদের দলীয় মুখপত্র সব দৈনিক পত্রিকা পড়লে মনে হয় তারা ছাড়া বাংলাদেশে ইসলাম সম্পর্কে সবাই অজ্ঞ। মুসলমান আমরাও এবং ধর্মকর্ম আমরাও কিছুটা জানি। ধর্মের নামে হানাহানি বা বিকৃতায়ন বাংলাদেশে হওয়ার কথা ছিল না। হয়েছে সামরিক শাসনজাত কারণে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী সংগঠনের পুনরুজ্জীবনে এবং আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতাদের দায়িত্বহীনতার কারণে। মাদ্রাসায় যদি ধর্মের নামে এই শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে হয় মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করতে হবে; না হয় এ ধরনের মাদ্রাসা চলবে কি না তা সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। ইসলাম ধর্মের একজন অনুসারী এবং রাষ্ট্রের একজন করদাতা হিসেবে এ দাবি আমি করতে পারি। কারণ, আমার বাবা-দাদা ধর্মভীরু মুসলমান। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন ইসলাম মানবতার ধর্ম, হানাহানির নয়। যারা ইসলামকে হানাহানির ধর্ম হিসেবে তুলে ধরে তারা ইসলামদ্রোহী, মুরতাদ। যুক্তিতর্ক দিয়ে ইসলাম শিক্ষা বা বোঝা মুরতাদ হওয়া নয়। ধর্মদ্রোহী তারাও যারা ভেঙেছে বাবরি মসজিদ।

বাবরি মসজিদ নিয়ে গত কয়েক বছর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে এবং এর জের হিসেবে, আশ্চর্য, পাকিস্তানে নয়, বাংলাদেশে দাঙ্গা হচ্ছে। অনেক ভারতীয় শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি এ ঘটনায় তারা বিরক্ত। তারা ভারতীয় জনতা পার্টি তো বটেই, কংগ্রেস ও অনেক বামপন্থীর ওপর বিরক্ত। কারণ, এদের প্রশ্রয়ে আজ এ অবস্থা।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সবসময়ই কোনো-না-কোনোভাবে বিরাজ করেছে উপমহাদেশে। কিন্তু ১৯৪৭ সাল ছাড়া কখনো তা এত তীব্র ও সংঘাতময় হয়ে ওঠেনি যা হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা ভেবেছিলাম এ সাম্প্রদায়িকতা আর কোনো সমস্যা নয়। ভারতের ঘন ঘন দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের একধরনের আত্মতৃপ্তিও ছিল মনে। আমাদের এ-কথা কখনো মনে হয়নি যে, মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা যে ভুল করেছি তাতে সমস্যা চাপা পড়েছিল মাত্র। প্রথম যে ভুলটি হল তা হল শেখ মুজিব কর্তৃক রাজাকার-আলবদরদের ক্ষমা ঘোষণা। এতসব খুনির ক্ষমাপ্রদর্শনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তারপর এল সামরিক শাসন। সামরিক শাসকরা নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে বেছে বেছে রাজাকার-আলবদরদের পুনর্বাসন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী শক্তি হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করলেন জামায়াতে ইসলামীকে। বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তা পূরণ করতে কতদিন লাগবে কে জানে। এখন এসেছে বিএনপি। তারা জামায়াতের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। বিএনপির কিছু কিছু এম. পি. প্রায়ই বলে থাকেন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দল। ভাগ্যের পরিহাস মুক্তিযুদ্ধের এই নতুন তাত্ত্বিক ফ্রেমের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা ও বিরোধীদের মিশ্রণ—এ-কথা শুনে যেতে হল। তাঁদের ধারণা, তারা ছাড়া দেশের অধিকাংশ মানুষ ছাগল। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার কে তা বোঝে না। যা হোক, এভাবে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চাষ শুরু হয়েছে এবং বেগম খালেদা জিয়া তাদের ফসল তুলতে সাহায্য করছেন যার প্রমাণ গত কয়েকদিনের ঘটনাবলি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের যে ব্যাপার থাকে সেটির অপব্যবহার এর কারণ। ভোটের সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষীরা অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ সমাজে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে, যাতে তারা ভোট টানতে পারে। ভারতে একসময় কংগ্রেস ও বামপন্থী দলসমূহ ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এখন এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কীভাবে তাদের গ্রাস করলো তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখলাম। পাকিস্তানে একই ব্যাপার হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও এই রক্ষাকবচ থাকা উচিত যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি বা উস্কানির সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড। কারণ, ধর্মপ্রাণ একজন হিন্দু বা মুসলমান পরস্পরের গলা কাটতে উদ্যত হন না। কারণ, সত্যিকারের ধর্ম তা বলে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের কথা ধরুন। সেখানে কি জাতিবিদ্বেষী নাৎসি বা ফ্যাসিস্টদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল? হয়নি। এবং তাই তারা অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছে সভ্যতা বিধ্বংসী এসব শক্তির হামলা থেকে। বিএনপি ভারতের ক্ষমতাসীনদের মতো একই কাজটি করতে যাচ্ছে। তবে, আগে

বিএনপি বললে জামায়াত করত। এখন জামায়াত বলে বিএনপি তা পালন করে। একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র—সবখানে বিএনপিপন্থীরা জামায়াতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে। এ প্রশ্রয়দান কী বিপদ ডেকে আনবে অচিরেই তাঁরা তা বুঝবেন।

বহুদিন পর নির্মূল কমিটি জামায়াতের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়ছে। মাসখানেক আগে সমন্বয় কমিটি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ ও গোলাম আযমের ফাঁসি সংক্রান্ত চার দফা দাবি আদায়ে হরতাল ডেকেছিল। শেষ মুহূর্তে তারা বাবরি মসজিদের ঘটনার প্রতিবাদও এর সঙ্গে যুক্ত করে। বেগম খালেদা জিয়া তা প্রতিরোধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। হরতাল হতই। জামায়াত তা জেনে পুরনো কৌশলে একই দিনে হরতালের ডাক দিয়েছিল। খালেদা জিয়া ভেবেছিলেন তাঁর জনসভা দেখে যে, জনগণকে তিনি যা বলবেন তা-ই হবে। এরশাদও তা-ই ভাবতেন।

কিন্তু প্রসঙ্গ সেটি নয়। আমরা লক্ষ্য করছি সমন্বয় কমিটির চার দফা দাবির প্রতি জনসমর্থন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতে ইসলাম-শিবির-ফ্রিডম পার্টির তৎপরতা অসম্ভব বেড়ে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। আহমদিয়া মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, কোরআন পোড়ানো হয়েছে, শিয়া-সুন্নি, আহমদিয়া, হিন্দু-খ্রিস্টান দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এ সবই করা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য। সরকার তাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—এসব অপরাধের জন্য সন্ত্রাস দমন আইনে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, বেছে বেছে তারা বাংলাদেশের পরিচিত প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার অধিকারী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় প্রচার চালাচ্ছে। বাবরি মসজিদের ঘটনা তাদের বড়রকমের সুযোগ এনে দিয়েছে। গত সাত-আট তারিখে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল, গত বাইশ বছরে তা হয়নি। লক্ষণীয় এই যে, আবুধাবীতে উটের পিঠে বাংলাদেশী শিশুকে যখন শেখরা ব্যবহার করে, পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যে বাঙালি তরুণীদের দিয়ে যখন পতিতাপাড়া খোলা হয়, তখন তারা নিশ্চুপ থাকে। অথচ মানুষ আশরাফুল মখলুকাত। উপাসনালয় থেকেও তার স্থান উঁচু। তার অবমাননা তো ধর্মকেই অবমাননা। হরতালের দিনও তারা হিংস্র জন্তুর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রশ্ন হল, বাবরি মসজিদের ঘটনায় তাদের পিতৃভূমি মধ্যপ্রাচ্যে বা আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে বা তুরস্কে কেন মানুষজন অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের ওপর হামলা করেনি বা মানুষ হত্যা করেনি—এ বিষয়গুলো ভেবে দেখলেই জামায়াত-ফ্রিডম পার্টির রাজনীতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

জামায়াত-ফ্রীডম পার্টির ব্যাপারে আমাদের ধারণা পরিষ্কার। কিন্তু পরিষ্কার ধারণা নেই আমাদের দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের সম্পর্কে। নব্বইর অভিজ্ঞতার পরও তাঁরা ত্বরিত ব্যবস্থা নেননি সংখ্যালঘুদের রক্ষায়। ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বা কবি শামসুর রাহমানকে যখন কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা হয় তখন তাঁরা তার প্রতিবাদ করেননি। জামায়াত যখন কোরআন পুড়িয়ে দেয়

তখনও তারা জামায়াতের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার করে তোলেনি। এ অভিযোগ নির্মূল বা সমন্বয় কমিটি সম্পর্কেও, যারা আমাদের এখন নতুন ভরসা। তাহলে ব্যাপারটা কি এই যে, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ বা অসাম্প্রদায়িকতা বা প্রগতিশীলতার কথা ততটাই বলবেন যতটায় তাঁদের কাজ হয়ে যায়?

উপসংহারে বলতে পারি, দেশে এখন দুটি পক্ষ। মুক্তিযোদ্ধা পক্ষ ও রাজাকার পক্ষ। ৮ (ডিসেম্বর, ১৯৯২) তারিখে হরতাল প্রমাণ করেছে যে মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে জনসমর্থন বেশি। সমন্বয় কমিটির দাবি এখন জনদাবি। ভারত অনেক মাশুল দিয়ে বুঝেছে যে, সাম্প্রদায়িক দল তোষণের অর্থ নিজেদের বুকে ছুরি মারা। তা-ই তারা এখন সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ করার কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছে। আশা করি, সরকারপক্ষ অনুধাবন করবেন যে, মানুষ আজ কী চায়। অনুধাবন করতে না পারলে তাদেরই ক্ষতি। কারণ, এ বিজয় দিবসে মানুষ আবার শপথ নেবে আরেকটি বিজয় ছিনিয়ে আনার।

১১-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২

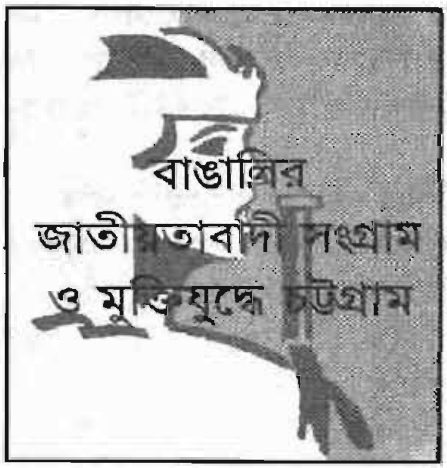

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা বিষয়ে গত দু-দশকে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আবার এসব উদ্যোগ নিয়ে কম বিতর্ক বা সমালোচনাও হয়নি। এক কথায় গত এক-দশকে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছে বিতর্কের বিষয়। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। এর একটি কারণ হয়তো এই যে, মুক্তিযুদ্ধ এখনো এক বিশেষ ধরনের পুঁজি। মুক্তিযুদ্ধ পছন্দ না করলেও একে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবং এখানে একটি বিষয় আবার লক্ষণীয়, সাধারণ মানুষ যাঁরা ছিলেন যুদ্ধের প্রধান উপাদান তাঁরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চুপ। শহরবাসী এবং স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতাত্তোরকালে যাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তাঁরাই বেশি মাতম করছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। কারণ স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারলে কলঙ্ক মোচন তো বটেই, হয়তো সুবিধাও খানিকটা পাওয়া যেতে পারে। এই অসুস্থ দিকের বিপরীতে সুস্থ দিকও আছে। তা হল, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছোট ছোট চর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এ সুস্থ দিকের প্রসারণই যে কাম্য তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমেই 'মুক্তিযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' প্রত্যয় দুটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকে দুটি প্রত্যয়কে আলাদাভাবে বিচার করতে আগ্রহী। এবং এতে যুক্তিও আছে। 'মুক্তিযুদ্ধ' প্রত্যয়টির পরিধি ব্যাপক, অন্যদিকে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' প্রত্যয়টির পরিসর সঙ্কীর্ণ। কিন্তু এগুলো অ্যাকাডেমিক আলোচনা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয়। আমিও সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের এতবছর পরও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, জাতীয় অভিলেখাগার, বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিস্তারিত কোনো প্রবন্ধপঞ্জি প্রকাশিত হয়নি। এটি শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। আমাদের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মুক্তিযুদ্ধ বা সামগ্রিকভাবে দেশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী তার খানিকটা বিচার করা যাবে এ প্রেক্ষিতে।

এটা ঠিক আছে, গত দু-দশকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতটা লেখা উচিত ছিল, ইতিহাসবিদ, গবেষক বা অংশগ্রহণকারীরা ততটা লেখেননি, তবে প্রতিবছরই কিছু-না-কিছু লেখা হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন তথ্য, জড়ো হচ্ছে ইতিহাসের উপাদান। মুক্তিযুদ্ধের বই গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে গত দু'দশকে, তার অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা। অর্থাৎ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন যুদ্ধে বা প্রবাসী সরকারের সঙ্গে বা তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, যাঁরা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেঁচে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যাঁরা পেশাগতভাবে ইতিহাস রচনার সঙ্গে যুক্ত, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তাঁদের রচনার সংখ্যা খুবই কম।

যে বইটির কথা এখানে আলোচনা করছি সেটিও পেশাদার কোনো ঐতিহাসিকের লেখা নয়, লেখা একজন ডাক্তারের—ডা. মাহফুজুর রহমান। বইয়ের নাম 'বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম : মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম'। ৫১২ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ বইটি দেখলেই সমীহ জাগে। আমি গত ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম বিজয় মেলায় এসে বইটির কথা শুনি এবং তখন থেকেই আগ্রহী হয়ে উঠি বইটি সম্পর্কে; কারণ আঞ্চলিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হলে অন্তিমে তা সহায়ক হবে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াসে। ডা. মাহফুজুর রহমান অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমে তাঁর কাজটি সম্পন্ন করেছেন, সে-জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
ডাঃ রহমান কেন এই সুবৃহৎ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে—

১. 'এ দেশের গুটি কয়েক হাজার আলবদর, আলশামস, খুনি রাজাকার ও পাক অনুচর ছাড়া গোটা বাঙালি জনগোষ্ঠী যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছে তার প্রতিফলন সাহিত্যেও নেই।'
২. 'মুক্তিযুদ্ধ ১৯৪৭ সাল হতে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত ফসল ...,' কিন্তু মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত বইগুলোতে 'আন্দোলনের ধারা, আন্দোলনের কৌশলগত দিক, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি।'
৩. 'যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে লেখা বইগুলোও প্রায় একপেশে ... অথচ আমাদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী যত প্রাধান্য পাচ্ছে, আমাদের বীরত্বের কাহিনী ততটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে না।'
৪. 'মুক্তিযুদ্ধের লেখা বইগুলোতে ব্যক্তি প্রাধান্য আসছে।'

এসব কারণে, ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি কাজ শুরু করেন এবং দীর্ঘ আটবছর পর একক চেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন করেন। পেশাদারী ঐতিহাসিক না হয়ে এতগুলো লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করা এবং তার সমন্বয় সাধন করে ধারাবাহিক বৃত্তান্ত তৈরি করা নিতান্ত দুরূহ কাজ। এবং সেই দুরূহ লক্ষ্য সম্পন্ন করতে তিনি যে সবসময় সফল হয়েছেন তা নয় এবং সে আশা করাও সমীচীন নয়।
বইটি মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব ১৮৭ পৃষ্ঠার ১২টি অধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বে আছে ১৯টি অধ্যায়। প্রথম পর্বের নাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্ব। এ পর্বটিতে লেখক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তুলে ধরেছেন। অনেকটা রান্নার আগে সব জোগাড়যন্ত্রের মতো। শুরু ১৯৪৭-এর আগে ভারতীয় রাজনীতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিয়ে, তারপর তুলে ধরতে চেয়েছেন ৪৭-৭১-এর জাতীয়তাবাদী উত্থানের ধারা।
জাতীয়তাবাদ নিয়ে কথা বলা এখন বিপজ্জনক। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বললে, আওয়ামী লীগ না-করেও আওয়ামী লীগার হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বললে, বিএনপি না-করলেও বিএনপি হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। যেমন এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বললে বা গোলাম আযমের বিচার চাইলে আওয়ামী লীগ, বিচার না চাইলে জামায়াত বা বিএনপি। তবে এ কথা বলাও প্রয়োজন যে, একটা পর্যায় পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ ভালো, তারপর নয়, বা উগ্র জাতীয়তাবাদ কোনোক্রমেই কাম্য নয়।

ডা. রহমান বাঙালির জাতীয়তার উৎস ও বিকাশের ধারা সন্ধান করেছেন ধারাবাহিকভাবে এবং দেখিয়েছেন কীভাবে তার ফলে বাঙালি বাধ্য হল মুক্তিযুদ্ধ করতে। লেখক যা বলেছেন তাতে রূপরেখাটি খানিকটা অস্পষ্ট। অতি সংক্ষেপে বরং ব্যাপারটি এভাবে বলা যায় কি না তা বিবেচনা করুন। প্রাচীন আমলেই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কৌম-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আঞ্চলিক স্মৃতি এবং চেতনার। বঙ্গ, রাঢ়া, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদগুলো পাল (আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১১৭৪) ও সেন রাজারা (আনুমানিক ১০৯৫ থেকে ১২৪৫ খ্রি.) ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক চেতনা তবু লুপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

আসলে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ আলোচনা করার আগে আরও পিছিয়ে গিয়ে সর্বভারতীয় পটভূমিকার জাতীয়, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক চেতনার কথা বলা দরকার। জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে এবং এর পেছনে কাজ করেছিল পুঁজিবাদী শক্তি। এর কারণ, বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী চেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বেড়াজাল ভেঙে নতুন বাজারের সৃষ্টি করতে বা 'Co-existensive with a definite culturally-polistence with popular support.' ভাষা ছিল এ চেতনার একটি প্রধান মাধ্যম। বুর্জোয়ারা নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে তখন সচেতন করে তুলেছিল জনগণকে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সত্ত্বা সম্পর্কে এবং এজন্যে প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করা হয়েছিল বিভিন্ন মিথ। এটিই হল জাতীয়তাবাদ এবং তা সাহায্য করেছিল বুর্জোয়াদের জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয় আন্দোলন ছিল প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে যাতে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এবং নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের উৎস শুধু হৃদয়াবেগ বা দেশের প্রতি ভালোবাসাই নয়, অন্যকিছুও।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেখা গেছে, নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যার সঙ্গে যোগ ছিল মেট্রোপলিটনের। ওই সময় বিভিন্ন অঞ্চলের অসংহত বুর্জোয়াদের উৎসাহিত করা হয়েছিল বিদেশী পুঁজি ও ব্যবসার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক বা সর্বভারতীয় পর্যায়ে উঠতি ভারতীয় বাঙালি বুর্জোয়াদের স্থান ছিল অধস্তন। কিন্তু তারা চায়নি নিজেদের বাজারের ওপর বিদেশীদের আধিপত্য। নিজেদের বিকাশের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল ওই বাজারের। কিন্তু এ বিরোধী ভূমিকা কখনো ছিল না বিপ্লবাত্মক, বরং তা হল সমঝোতাপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, ওই সময়ে বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছিল এবং গুরুত্ব আরোপ করেছিল এর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে জাতীয়-চেতনা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। উনিশ শতকে জাতীয়-চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর দুটি ধারা ছিল বহমান—একটি সর্বভারতীয়, অপরটি আঞ্চলিক। প্রথমটির ভিত্তি ছিল সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য, দ্বিতীয়টির ভিত্তি ছিল স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য এবং নিজ অঞ্চলের লোকসমষ্টির ওই অঞ্চলের বাজার ও

সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ। জাতীয় চেতনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার এই অবস্থানের ভিত্তিতে আবার অনুপ্রবেশ করেছে প্রাচীন বাংলার অতীত এবং ঐতিহ্য।

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, 'ভূমিনির্ভর কৃষি জীবনের কারণে' কৌম ও আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। আঞ্চলিক চেতনার মধ্যে ভূমিনির্ভরতার এই অনুপ্রবেশ ক্রিয়াশীল ছিল বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে। ওই সময় একই সঙ্গে সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক (বাংলা) ও উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ) এই চেতনাত্রয় কাজ করেছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য সর্বভারতীয় পরিসরে সুবিধা ছিল বেশি। সে জন্য সে চেয়েছিল সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আবার আঞ্চলিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল সে—যেমন বঙ্গভঙ্গের সময়। কলকাতার বিরুদ্ধে আবার পূর্ববঙ্গের কাঠামোগত দুর্বল মধ্যশ্রেণীর উপ-আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। এই মধ্যশ্রেণীর মতে তাদের অঞ্চলের উৎপাদিত কাঁচামাল চলে যাচ্ছিল কলকাতায়, কিন্তু পাচ্ছিল না ন্যায্যমূল্য। পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অবহেলিত। এই চেতনায় সহায়তা করেছিল আবার ভূমিনির্ভর জীবন, শিল্পের অভাব। ওই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গবাসীদের মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনো। সে চেতনা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে সহায়তা করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে। জাতীয় বা আঞ্চলিকতার উৎস ও বিকাশ নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ডা. মাহফুজের সঙ্গে একটি বিষয়ে ঐকমত্য ঘোষণা করা যেতে পারে যে, জাতীয়তাবাদ স্পষ্ট অবয়ব পেয়েছিল বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের পরই। এবং ক্রমশ তা বেগবান হয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানুষকে অন্তিম জয় ছিনিয়ে আনতে।

চট্টগ্রাম পর্বের রচনায় পরিকল্পনাও একই রকম, তবে আলোচনা একেবারে চট্টগ্রাম জেলাতেই সীমাবদ্ধ। এ পর্বে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামবাসীদের মুক্তিযুদ্ধের গাথা।

যে কোনো রচনা নির্মাণে একটি পদ্ধতি প্রয়োজন। পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে রচনাটি কী হবে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি যেরকম আঁটোসাটো কাঠামো আশা করব স্বাভাবিকভাবে ডা. মাহফুজুর রহমানের কাছে তা আশা করা যায় না। তাঁর সুবৃহৎ বইটি দেখে মনে হয়েছে, একই সঙ্গে তিনি বিস্তারিত উপাদান জড়ো করতে চেয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। এখানেই পদ্ধতিগত হেরফের হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ বইটি তিনটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, তাতে বিষয়বস্তুর ওপর অধিশ্রয়টা স্পষ্ট হত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্ব আলাদা একটি বই হতে পারত। এই পর্বটিকে দ্বিতীয় পর্বের পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব মনে হয়েছে। এবং এ পর্বে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ইতোমধ্যে তা বারংবার আলোচিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। এ পর্বে নতুন তথ্যই নেই তেমন। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট তথ্যপঞ্জির উল্লেখও হ্রাস করেছে এর মূল্যমান। তবে হ্যাঁ, এ পর্বটি আলাদা হলে সাধারণ পাঠক সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির রূপরেখা হিসেবে পাঠ করে আনন্দ পেতে পারেন। এছাড়া এ পর্বটিকে সাজানো হয়েছে সময়ের ক্রম মানে, যার ফলে 'রেডি রেফারেন্স' হিসেবেও পর্বটি উপযোগি।

চট্টগ্রাম পর্বকেও নির্দিষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামে জাতীয়তাবাদী ধারার বিকাশ, আরেকটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম। এক্ষেত্রেও দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই হলে অধিশ্রয় ঠিক হত। তবুও আলাদাভাবে একটি বই হিসেবেও এটিকে বিবেচনা করা যায়, যদিও তাতে পদ্ধতিগত ও ধারাবাহিকতায় খানিকটা ত্রুটি আছে।

আমার মনে হয়েছে ডা. মাহফুজুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব চট্টগ্রাম পর্বটি রচনায়। বিশেষ করে '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত সময়কালের অধ্যায়গুলো। এত বিস্তারিতভাবে কোনো অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখার বিবরণ আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এটি ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস নয় বটে, তবে উপাদান আছে প্রচুর। ভবিষ্যতের যে-কোনো ঐতিহাসিক, যিনি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করবেন, সেক্ষেত্রে তিনি ডা. মাহফুজুর রহমানকে পথিকৃতের মর্যাদা দিতে বাধ্য হবেন।

একটি মন্তব্য প্রযোজ্য প্রতিরোধ যুদ্ধে চট্টগ্রাম পর্ব সম্পর্কে। এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন মাহবুবুল আলম তাঁর 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত'-এ। ডাঃ রহমান, তা থেকেও বিস্তারিত আকারে, খুঁটিনাটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শহীদদের একটি তালিকাও তিনি প্রস্তুত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় আর কী হতে পারে? তবে এ প্রসঙ্গ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত যদি জেলাওয়ারি রাজাকারদের আরও বিস্তারিত তালিকা থাকত। তালিকা যে লেখক প্রস্তুত করেননি তা নয়, কিন্তু তা অতি সংক্ষিপ্ত। রাজাকারদের বর্তমান অবস্থা কী সে বিবরণ থাকাও আবশ্যক। রাজাকার চিহ্নিত হয়নি দেখে, রাজাকারদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হয়নি দেখে আজ এ অবস্থা। তার ওপর জিয়াউর রহমানের সময়ে অনুসৃত রাজনীতি এখন বাংলাদেশের অস্তিত্বই করে তুলেছে সঙ্কটাপন্ন। এর আরেকটি কারণ, আমাদের সামাজিক মেলবন্ধন অতি শক্তিশালী, এ কারণে সুষ্ঠু মেরুকরণও সম্ভব হয় না সব সময়। এ প্রসঙ্গে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও দু-একটি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ কেন হয়েছিল? ১৯৭১ সালের সংবিধানের চারটি মূলনীতিতেই তা বিধৃত। মুজিব-পরবর্তী দু'জন সে মূলনীতিগুলোই উৎপাটন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করেই তারা এগিয়েছেন এবং ঢাকাকেন্দ্রিক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নামে সংগঠনটি তাদের অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন যুগিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের সিংহভাগ ছিলেন গ্রামের অধিবাসী, সাধারণ মানুষ। তারা যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধশেষে অস্ত্র জমা দিয়ে লাঙল ধরেছেন। 'সোনার বাংলা' 'নতুন বাংলা' নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। শহরাঞ্চলের যাঁরা পয়সা করতে চেয়েছেন তাঁরাই সংসদ নিয়ে এরশাদ ও জিয়ার পেছনে গেছেন। এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নতুন প্রজন্মকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তুলেছেন।

আমাদের 'সোনার বাংলা' বা 'সিভিল সমাজ' দিতে পারতেন রাজনীতিবিদরা। আমরাও তাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কখনো তাঁদের পরিত্যাগ করিনি। অথচ প্রতিটি সময় তাঁরা আমাদের বিশ্বাস, মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার, মুক্তিযুদ্ধ যে ঐক্যবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক জাতি সৃষ্টি করেছিল তা আজ বিভক্ত ও সাম্প্রদায়িক। খুনি হিসেবে স্বীকৃত জামায়াত ও অন্যরা সম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসিত। মুক্তিযোদ্ধারা এখন আবার রাস্তায়। শুধু তা-ই নয়, একটি প্রজন্ম যাদের বয়স বিশ থেকে পঁচিশের কোঠায়, তাদের অধিকাংশই বেড়ে উঠছে ঐতিহ্যহীন, স্মৃতিহীন, শেকড়হীন হিসেবে। এর ফলাফল যে কত ভয়াবহ হতে পারে তার আলামত নিশ্চয় ইতোমধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে। তা-ই এদেশে ঘুষখোর, লুটেরা আসন গ্রহণ করে প্রধান অতিথির, যিনি বজায় রাখেন সনাতন অর্থাৎ দু-দশক আগের মূল্যবোধ (যেমন সততা, সৌজন্য), তিনি থাকেন অনাহারে।

এ বেদনাবোধ আমার, আমার বন্ধু ও আমার প্রজন্মের অনেকের। ডা. মাহফুজুর রহমানেরও। সে বেদনাবোধ এত তীব্র দেখেই তিনি রচনা করতে পেরেছেন এ গ্রন্থ। অসম্ভব বৈপরীত্যে ভরা এদেশে এগুলোই হচ্ছে ইতিবাচক উপাদান।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের দলিলে যেমন তেমনি অন্যান্য বইতেও রণাঙ্গন গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। শুরু থেকেই সচেতন বা অসচেতনভাবে এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গন বা সশস্ত্র যুদ্ধ থাকবে, কিন্তু তার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ বলতে অন্যকিছু বুঝবে। এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলামের 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিতে পারি। সামরিক অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিপরীত দিকটি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা-ই লিখতে পেরেছিলেন—

'স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনো সামরিক অভিযান নয়—স্বাধীনতা যুদ্ধ জনগণের। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো বিজয় সূচিত হয় না। জনগণ ব্যতীত কোনো স্বাধীনতা আসতে পারে না।'

মুক্তিযুদ্ধ দলিল সংগ্রহ প্রকল্প সংগৃহীত দলিল বা অন্যান্য বইতে এই সাধারণ মানুষ যাঁরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ধারা তাঁরা অবহেলিত। অন্য কথায় যে ব্যাপক জনগোষ্ঠির আত্মত্যাগের ফলে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা তাঁরাই উপেক্ষিত হয়েছেন ইতিহাসে। কোনো-কোনো বইয়ে বা দলিলে যে তাঁদের চিত্র আমরা একেবারে পাই না তা নয়, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোথাও তাঁদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পরপরই। বীরশ্রেষ্ঠ থেকে বীর প্রতীক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাগ্যে এসব পদক প্রায় জোটেনি। অথচ মূল যোদ্ধা ছিলেন তাঁরাই। সুতরাং এই জনগণ উপেক্ষিত হলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হবে খণ্ডিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রয়োজন।

মাহফুজুর রহমানের কৃতিত্ব, মুক্তিযুদ্ধই যে ছিল বাংলাদেশের একমাত্র জনযুদ্ধ তা তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন। এটি সামরিক বাহিনীত্যাগীদের নেতৃত্বে কোনো যুদ্ধ ছিল না। এই কারণ এবং এই বোধের জন্যও বইটি নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এ ধরনের বইতে তথ্যপঞ্জি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থের পেছনে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি আছে তাতে কিছুই বোঝার উপায় নেই। এ ধরনের বইয়ে সূত্রের ধারাবাহিক উল্লেখ না থাকলে বইয়ের মান কিছুটা হ্রাস পায়। আর্থিক কারণে নির্ঘণ্ট না-করার কথা উল্লেখ

করেছেন লেখক, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব এ ধরনের গ্রন্থে নির্ঘণ্টের প্রয়োজন তীব্র। বর্তমান গ্রন্থের চিত্রাংশ একটি মূল্যবান সংযোজন। কিন্তু কোন্ চিত্র কোন্খান থেকে নেয়া হয়েছে বা আলোকচিত্র শিল্পীর নাম অনুপস্থিত। ঢাকা নগর জাদুঘরের সংগ্রহ ও সম্পাদিত সঙ্কলন থেকে সিংহভাগ ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি ছবির নিচে সে স্বীকৃতি না-থাকার দৃষ্টিকটু লেগেছে। যিনি এত সুন্দর একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি তৈরি করেছেন মুক্তিযুদ্ধের তার পক্ষে এ কার্পণ্য বেমানান।

সবশেষে বলব, 'চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধ', মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অমানুষিক পরিশ্রমে ডা. মাহফুজুর রহমান একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাবার ভাষা আমার নেই।

এটা ঠিক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি। এত দ্রুত সমকালীন ইতিহাস লেখা হয়তো সম্ভবও নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, ধারাবাহিক ইতিহাসের একটি খসড়া প্রণয়নের জন্য এখন পর্যাপ্ত পরিমাণ উপাদান আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ ও বিদ্যমান উপাদানের সাহায্যে যে-কোনো একজনের পক্ষে এ বিশাল দায়িত্ব পালন প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন একটি সংস্থার। বর্তমান সরকার প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার দাবি করেন। সত্যিকারভাবে তা চাইলে এখনই বাংলা একাডেমীর মতো স্বশাসিত একটি 'স্বাধীনতা যুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর' স্থাপন করা উচিত। এ দাবি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যদি আমরা সবাই সোচ্চার হই। ন্যায্য দাবি আদায়ে সোচ্চার হওয়া ভয়ের কিছু নয়।

কিন্তু এটা হল সদিচ্ছা বা ইচ্ছাপূরণের কথা। আগে যে সংশয়ের কথা বলেছিলাম সে সংশয়ের কথাই বলি। বর্তমানের জাতীয় নেতা, জাতীয় পতাকা ও আরও যেসব বিষয় নিয়ে বিজাতীয় তর্ক হচ্ছে তাতে এ ধরনের সরকারি প্রচেষ্টায় মানুষ আস্থাশীল নাও হতে পারে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণায় বাংলাদেশের কোনো সরকারই আগ্রহী ছিল না। তবে, যদি প্রস্তাবিত সংস্থা করা হয় এবং যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি যাঁদের ওপর সমাজ আস্থাবান তাঁদের ওপর তা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সরকারের সদিচ্ছার।

কিন্তু হয়তো তা হবে না। তবে বিকল্প কী? বিকল্প কয়েকটি আছে—

১. থানাপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বা অন্য-কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের ইতিবৃত্ত, হানাদারবাহিনীর সহযোগীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধের কাহিনী অর্থাৎ এক কথায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ। যেমনটি করেছেন ডা. মাহফুজুর রহমান এবং শহীদ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ। এক্ষেত্রে সুনামগঞ্জের মুক্তি সংগ্রাম স্মৃতি ট্রাস্টের মডেল গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ট্রাস্ট মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, শহীদদের গোরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও সাহায্য এবং ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে রেখেছে। এর জন্য তেমন কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই। স্থানীয় এম.পি., স্কুল-শিক্ষক, সহানুভূতিশীল নির্বাহী অফিসারের উদ্যোগেই এ কাজ হতে পারে।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে যাঁরা যে পর্যায়েই জড়িত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিকথা রচনা যা ব্যবহৃত হবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে। এখনো সময় আছে। কারণ স্মৃতি বড়ই প্রতারক।
৩. বেসরকারি উদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ। যেমনটি করেছে বর্তমান গ্রন্থের উদ্যোক্তা 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।'

বর্তমানে দেশে রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন চলছে তা রুখতে হলে এগুলোই হবে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কোনোকিছুই করব না, শুধু সমালোচনা করে যাব, তা হয় না। এসব প্রকল্প কার্যকর হলে, প্রজন্মের-পর-প্রজন্মের কাছে, প্রতিটি অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের অমর গাথা সবুজ শস্যের মতো বেড়ে উঠবে, ঢেউয়ের মতো ধ্বনিত হবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ের কথা।

উপসংহারে বলব মুক্তিযুদ্ধ এখন কীর্তিনাশায় হারিয়ে যাওয়া সমৃদ্ধ এক জনপদের মতো, যার কথা মনে হলে এখনো মন ভরে ওঠে কানায় কানায়। মুক্তিযুদ্ধ এখন আমাদের অনেকের হারানো পিতামাতার মতো, যার স্মৃতি বেদনাবিধুর। যে অগণিত মানুষ একাত্তরে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁরা এখনো বেঁচে। তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও বেঁচে। সমৃদ্ধ জনপদ, পিতামাতার স্মৃতি সহজে মোছে না মন থেকে। তা আবার রক্তে জাগিয়ে তোলে তীব্র উন্মাদনা। এ-কথা বর্তমানে অনেক আত্মবিক্রয়কারী ভুলে যেতে পারেন, আমরা পারি না। আর ইতিহাস কখনো আত্মবিক্রয়কারীদের পক্ষে ছিল না।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০

পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচের সময় চাঁটগায় খুব হৈ চৈ। মুক্তিযুদ্ধের বই সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে আমাকে বলছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ঘটনাটি অবশ্য বেশ আগের। রিকশায় যাচ্ছি। রিকশাঅলা বলল, 'পাকিস্তানিগো লয়ে এত হৈ চৈ। তারা কি অত্যাচার করেছে তা আমাগো গ্রামের গাছের পাতাও সাক্ষী দিব।' স্বাধীনতার পর দৃষ্টিকটু লেগেছে, আমরা যাদের অশিক্ষিত বলি, সে রিকশাঅলার।

যে পেরিয়েছে ঐ সময় এবং এখনো তীব্রভাবে অনুভব করে সে সময়, তার পক্ষেই এ ধরনের মন্তব্য সম্ভব। এটি বোধের ব্যাপার। অসউইৎজের কথা এখনও বলা হয়। সারা বিশ্বের লাখ লাখ লোক এখনও স্মরণ করে সেই গণহত্যার কথা। অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু অসউইৎজ বা এ ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক নেই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আছে। আছে বললে বোধ হয় ঠিক হবে না, একে সুকৌশলে বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে। আমরা জোরালো প্রতিবাদ জানাইনি। ফলে একটি প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের পুরো বিষয়টিই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। কীভাবে, তা পরে আলোচনা করছি। শুধু বলি, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যখন পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন আমরা এর প্রতিবাদ করি নি, কিন্তু 'মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ' করে মুখে ফেনা তুলেছি। অথচ, ঐ যে রিকশাঅলা যার গ্রামের গাছের পাতাও সাক্ষী দেবে হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের, সে কিন্তু বিস্মিত হয়েছে পাকিস্তানিদের নিয়ে মাতামাতি করায়। তাই প্রশ্ন করেছে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, শহীদদের রক্তের দাগ শুকোতে না শুকোতে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকা শহরের মানুষজন হর্ষোৎফুল্লভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে রাস্তার দু পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই হল বাঙালির বোধ!

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেন এমনটি হল? এ নিয়ে অনেক কারণ দেখানো যাবে। সম্প্রতি একটি বই পড়ে মনে হল মুক্তিযুদ্ধে কার অবস্থান কোথায় ছিল এবং যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তারা কীভাবে ব্যবহার করেছে মুক্তিযুদ্ধ, এটি বিশ্লেষণ করলেও হয়তো কিছু কারণ জানা যাবে। নতুন প্রকাশিত বইটির লেখক এ.এস.এম. শামছুল আরেফিন। বইয়ের নাম 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান' (ইউপিএল)।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা বিষয়ে গত দু'দশকে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেগুলো যে খুব সফল হয়েছে এমন বলা যায় না। আবার কোনো কোনো উদ্যোগ নিয়ে কম বিতর্ক বা সমালোচনাও হয় নি। এই দিকের বিপরীতে সুস্থ দিকও আছে। তা হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বাধীনতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা—যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছোট ছোট চর্চা কেন্দ্রও স্থাপিত হচ্ছে। এ সুস্থ দিকের প্রসারণই কাম্য, বলাই বাহুল্য।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, জাতীয় অভিলেখাগার—বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিস্তারিত

কোনো প্রবন্ধ গ্রন্থপঞ্জি [আ. মোঃ দেলোয়ার হোসেনের এ বিষয়ে একটি বই আছে] প্রকাশিত হয় নি। এটি শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। আমাদের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মুক্তিযুদ্ধ বা সামগ্রিকভাবে দেশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী তার খানিকটা বিচার করা যাবে এ পরিপ্রেক্ষিতে।

এটা ঠিক যে, গত দু'দশকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতটা লেখা উচিত ছিল, ইতিহাসবিদ, গবেষক বা অংশগ্রহণকারীরা ততটা লেখেন নি, তবে প্রতি বছরই কিছু না কিছু লেখা হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন তথ্য, জড়ো হচ্ছে ইতিহাসের উপাদান। মুক্তিযুদ্ধের বই গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যে।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে গত দু'দশকে তার অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা। অর্থাৎ যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন যুদ্ধে বা প্রবাসী সরকারের সঙ্গে বা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যারা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেঁচে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে যারা পেশাগতভাবে ইতিহাস রচনার সঙ্গে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তাদের রচনার সংখ্যা খুবই কম।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বইগুলোকে আলোচনার সুবিধার জন্যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, এ বিভাজন খুব একটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রকাশিত বইগুলোকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

১. মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন।
২. অবরুদ্ধ দেশ
৩. প্রবাসী সরকার, সংগঠন প্রভৃতি
৪. রণাঙ্গন এবং
৫. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ।

উপরোক্ত বিভাজন নির্দিষ্টভাবে মেনে চলা দুষ্কর। কারণ, রণাঙ্গন সম্পর্কিত গ্রন্থেও বর্ণনা আছে প্রবাসী সরকারের, আবার অবরুদ্ধ দেশ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় উল্লিখিত হয়েছে রণাঙ্গন সম্পর্কিত আলোচনা। তবে, অধিকাংশ বইয়ে লেখকের কোনো না কোনো সময়ের স্মৃতিচারণ সংযোজিত হয়েছে। শামছুল আরেফিনের বইটিকে শেষ পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

শামছুল আরেফিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে, কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। নয় নম্বর সেক্টরের খুলনা সাব-সেক্টরে কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ছিলেন সেনাবাহিনীতে। তারপর অবসর গ্রহণ করে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, ব্যবসায়ে যার জীবন কেটে যাচ্ছে তার আবার এসব বইপত্র লেখার বাসনা জাগল কেন?

জনাব আরেফিনের [উল্লেখ্য যে, আরো অনেক মেজরের মতো নিজের নামের আগে মেজর শব্দটি ব্যবহার করেন নি] সঙ্গে আমার সামান্য ব্যক্তিগত আলাপ আছে। তার যে

বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল, তিনি বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। এর অর্থটি কী? যাতে দেশে সিভিল সমাজ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং যার সঙ্গে যুক্ত গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। যাতে দেশে আর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়। এর অর্থ সামরিক বাহিনীর প্রথাগত চিন্তা-চেতনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহে যে কারণে ১৩৭টি সারণিসহ ৬৩০ পৃষ্ঠার বইটি অশেষ ধৈর্য্য ও পরিশ্রম করে তাঁর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

অনেকে বলবেন এটাতো স্বাভাবিক। যিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তিনি তো মুক্তিযোদ্ধাই থাকবেন। আমি বলবো, না। যদি তাই হয় তাহলে, জেনারেল জিয়াউর রহমান কেন আলবদর রাজাকারদের সসম্মানে মন্ত্রী করে প্রতিষ্ঠিত করবেন? কেন তিনি স্বাধীনতার পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বিরোধী নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামীকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিবেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনকে সমর্থন করে দল করবেন, তারা তো যুদ্ধ করেছিলেন সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে। আবার প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ না নিয়েও অনেকে মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেন। যেমন, জাহানারা ইমাম বা তাঁর সঙ্গে যারা লড়াই করেছেন এবং এখনও করছেন।

শামছুল আরেফিন তাঁর গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন—'এই গ্রন্থে মূলত ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নেতৃস্থানীয় প্রায় ৩,৫০০ জন ব্যক্তির অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁরা কে কোথায় এবং কী কাজে জড়িত ছিলেন তা এই গ্রন্থের বিভিন্ন তালিকায় বিধৃত হয়েছে। এই তালিকা গ্রন্থটি প্রকাশের লক্ষ্য একটিই—আর সেটি হল এই যে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষক ও ঐতিহাসিকদের তথ্যসূত্র দিয়ে সাহায্য করা।'

চারটি পর্বে বিভক্ত গ্রন্থটি। প্রথম পর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধকালীন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর অবস্থান, সেনাবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বাঙালি কর্মকর্তাদের অবস্থান, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কাঠামোর বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। ... দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিচয়, তৃতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্মরত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ও কর্মক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে।

'চতুর্থ পর্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি একত্র করা হয়েছে।'

কিন্তু এটি কি শুধু একটি তালিকাগ্রন্থ বা ডিরেকটরিই? লেখক অবশ্য তাই বলেছেন। কিন্তু এই তালিকা বিশ্লেষণ করলেও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক আলোকিত হয়ে উঠবে, লেখক তা করেননি। যদি করতেন, তা হলে তা নিছক তালিকাগ্রন্থ না হয়ে ভিন্ন মাত্রা পেত। আমি দু'একটি উদাহরণ দেব।

প্রথমে সারণি ১০৮ দেখা যাক। এখানে, নাগরিকত্ব অর্জনে ব্যর্থ ব্যক্তিবর্গের তালিকা সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ এরা ঘোর বাংলাদেশ বিরোধী ও ঘোর পাকিস্তানি ছিলেন। এদের অনেকে পাকিস্তানে রয়ে গেছেন, একটি বড় অংশ নাগরিকত্ব পেয়ে মহা আনন্দে

জামায়াতে ইসলামে যোগ দিয়ে রাজনীতি করছেন। বাকি কয়েকজন কোথায় গেছেন? বিএনপিতে। জুলমত আলী খান। দেখা যাচ্ছে, তাঁর সর্বশেষ অবস্থান ছিল বিএনপির সহসভাপতি হিসেবে। বর্তমানে তিনি ভুটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। আরেকজন হুমায়ুন খান পন্নী স্বাধীনতার পরও দীর্ঘদিন ছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। এখন বিএনপির সংসদ সদস্য ও সংসদের ডেপুটি স্পীকার।

১০৭ নাম্বার সারণি বেছে নেয়া যাক। পাকিস্তান সরকারের সহযোগী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সারণিটি। এ তালিকার ব্যক্তিবর্গ তখন প্রধানত যুক্ত ছিলেন জামায়াত ও মুসলিম লীগের সাথে। স্বাধীনতার পরও তার হেরফের হয়নি। না সামান্য খানিকটা হেরফের হয়েছিল সেটাই উল্লেখ করছি। সারণিভুক্ত কয়েকটি নাম দেখা যাক। মাওলানা হিসেবে পরিচিত আবদুল মান্নান, শাহ আজিজুর রহমান, মশিয়ুর রহমান, মাহবুবুর রহমান, আবদুল আলীম প্রমুখ। জেনারেল জিয়াউর রহমান এদের সবাইকে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী করেছিলেন। অনেকে আবার বিএনপি আমল থেকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যেমন প্রফেসর আব্দুল বারী। গত এক যুগ তিনি মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে জীবন কাটাচ্ছেন। এরপর যখন বিএনপির নীতি নির্ধারকরা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন তখন দু'টি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়। এক, তারা মুক্তিযুদ্ধ বা এর চেতনা কথাটার অনুধাবন করতে পারেননি; দুই, হয়ত পেরেছেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করছেন স্বল্প মেয়াদী নিজ স্বার্থে অথবা তারা মিথ্যা বলছেন।

এ দুটি সারণিতে আরো নাম আছে যেমন, নুরুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মাহবুবুল হক দোলন, ফয়জুল হক, আনোয়ার জাহিদ, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) প্রমুখ। এরা সবাই আবার জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যাপারে জাতীয় পার্টিও উচ্চকিত। এক্ষেত্রে বিএনপির বক্তব্যের মতো তাদের বক্তব্যও একই ধরনের। সুতরাং কেউ যদি এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

১. প্রথমে বিএনপি এবং তারপর জাতীয় পার্টি বেছে বেছে একাত্তরের ঘাতক ও দালাল হিসেবে যাদের কণ্ঠ ও কর্ম ছিল সোচ্চার তাদের পুনর্বাসিত করেছে।
২. দুটি দলের প্রধানই ছিলেন সামরিক বাহিনীর জেনারেল এবং দুইজনই ক্ষমতায় এসেছিলেন বেসামরিক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করে।
৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এ কারণেই সৃষ্টি এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা থাকবেই।
৪. যে কারণে পরিপূর্ণ সিভিল সমাজ বা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থায়ী রূপ দিতে তারা অনাগ্রহী।

উপসংহার এভাবে টানা যায় যে, দুটি দলই মৌলিকভাবে এক এবং সামরিক বাহিনীর একাংশ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে। যার পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। আরো লক্ষণীয়, বিএনপির প্রধান এখন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না হলেও তাদের মূল লক্ষ্য বদলায়নি। কারণ, যেসব

শক্তির ওপর তাদের ভিত করা হয়েছিল এখনও সে ভিতের বদল হয়নি। যে কারণে, আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট এবং হুমায়ুন খান পন্নী ডেপুটি স্পীকার।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। এ তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ক্যারিয়ারগত দিক থেকে তাদের সিংহভাগেরই জাগতিক ক্ষতি হয়নি। সবাই উচ্চপদ পেয়েছেন এবং খুবই তাড়াতাড়ি, বিশেষ করে সিএসপি ও সামরিক বাহিনীর অফিসাররা (ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য আমি মনে করি, আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি কোনো না কোনোভাবে)। তা হলে যারা তাদের বর্তমান বিসর্জন দিয়েছিলেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে বা যিনি ছিলেন এ যুদ্ধের মহানায়ক—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—নিজ স্বার্থের কথা ভেবেও কি তাঁদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হওয়া যায় না? বা দেখানো যায় না খানিকটা শ্রদ্ধা? অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা আছে! যে যে দলই করুন বা মতই পোষণ করুন। জামাত ছাড়া তারা এটুকু করলেও বলা যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে একটি ধাপ এগোনো গেছে।

এ তালিকা গ্রন্থে মতিউর রহমান নিজামী, কামারুজ্জামান বা গোলাম আযম বা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ধরনের নাম দেখে বর্তমান প্রজন্মের অনেকে হয়তো অবাক হতে পারে। কারণ তাদের অনেকে এখন সংসদ সদস্য, পরিচিত রাজনৈতিক নেতা। মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান, যে বাহিনী গঠন করা হয়েছিল মানুষ হত্যার জন্য। আমাদের দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের তারাই হত্যা করেছিল। গোলাম আযমতো অতি খ্যাত ঘাতক হিসেবে। বর্তমান প্রজন্ম হয়তো এ ভেবে অবাক হতে পারে যে, এখনও এরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে, জনসভা করে কী করে? বা সংসদে যায়? এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তারা যদি মুক্ত থাকে তা হলে সাধারণ খুনীকে কেন অভিযুক্ত করা হয়? তারা কি মুক্ত এ কারণে যে তারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বা এখনও আছে? তা হলে খুন করে বা অপকর্মের সঙ্গে থেকে রাজনীতি করলেই সব মাফ হয়ে যাবে? এভাবে বিভ্রান্তি আরো বৃদ্ধি পায় তখন, যখন দেখা যায় রাষ্ট্রের নৈতিক অস্তিত্ব না-মেনেও সে দেশে রাজনীতি করার অধিকার রাখে। কারণ, জামায়াত এখনও স্বীকার করেনি যে, ১৯৭১ সালের খুন, হত্যার জন্য তারা অন্তত অনুতপ্ত। এ কারণে, এদেশে রাষ্ট্রদ্রোহীর সংজ্ঞাও বদল হওয়া উচিত।

মুক্তিযুদ্ধে যারা বিশ্বাসী, যারা আওয়ামী লীগের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থক তারাও বিভ্রান্তিতে ভুগতে পারে যেহেতু সাম্প্রতিককালে প্রশ্ন উঠেছে জামায়াতের প্রতি আওয়ামী লীগের নমনীয়তাকে নিয়ে। রাজনীতিতে শেষ কথা নেই এ উক্তিতে আত্মতৃপ্তি বা গৌরবের কিছু নেই, সুবিধাবাদের ব্যাপার ছাড়া। জামায়াত বা ঘাতকের প্রতি যে কোন ধরনের নমনীয়তা ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আঘাতস্বরূপ। আরো আছে, যেসব মুক্তিযোদ্ধা বিএনপি বা জাপার আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের কাছে এ প্রশ্নও রাখা যেতে পারে, যে কারণে তারা যুদ্ধ করেছিলেন, সে কারণে যে দল নস্যাৎ করেছে তাকে সমর্থন করার পেছনে যুক্তি কী? এভাবে সমাজে রাষ্ট্রে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, ছড়ানো হচ্ছে।

আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এসব সারণি থেকে। যেমন, বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ চাকরিচ্যুত বা অবসর গ্রহণের পর তেমন কিছু করতে পারেননি। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সিংহভাগ ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন। এর অর্থ কি ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে সুহৃদ সম্পর্ক? ১৯৭৫ সালের পর থেকে এমনটি ঘটেছে।

আরেফিন শুধু তালিকা প্রস্তুত করেছেন। বিশ্লেষণ করেননি। তবে, তিনি জানিয়েছেন, বইটির আরো দুখণ্ড বেরুবে। হয়তো শেষ খণ্ডটিতে তাঁর বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ থাকবে।

এ বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিতে যে যতই মিশে যাক না কেন বা হোক না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার—এই তালিকা ওল্টালেই প্রতিষ্ঠিত অনেক ব্যক্তির আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে। এবং বলা যেতে পারে, যে যত উচ্চপদ বা ক্ষমতারই অধিকারী হোক না কেন জামায়াতের অন্ধ অনুসারী ছাড়া কেউ তাদের সন্তানের নাম মতিউর রহমান নিজামী বা গোলাম আযম রাখবেন না। নীরব মানুষদের এটিই ক্রোধ বা ক্ষোভের প্রকাশ বিভ্রান্তিকারীদের বিরুদ্ধে।

জনাব আরেফিন একটি বড় ধরনের কাজ করেছেন, যা সব সময় মুক্তিযুদ্ধের গবেষকদের ব্যবহার করতে হবে। গবেষকদের পরিশ্রমও অর্ধেক লাঘব করে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি এখনও এভাবেই লড়াই করে চলছেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা বলে শেষ করি। এটা ঠিক যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। এত দ্রুত সমকালীন ইতিহাস লেখা সম্ভবও নয়। তবে, খসড়া প্রণয়নের জন্যে এখন পর্যাপ্ত পরিমাণ উপাদান আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ ও বিদ্যমান উপাদানের সাহায্যে যে কোনো একজনের পক্ষে এ বিশাল দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এ জন্যে প্রয়োজন একটি সংস্থার। এ কারণে আমরা বহুদিন ধরে একটি মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ও যাদুঘর স্থাপনের দাবি করে আসছি। সামরিক যাদুঘরের আগেই অথবা সামরিক যাদুঘরকে এর অঙ্গীভূত করা হোক। কারণ, সামরিক বাহিনী তাদের বীরত্ব, শৌর্য, দেশের প্রতি ভালোবাসা একবারই অকুণ্ঠচিত্তে করেছিল—তা হল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। এ দাবিতে সবার সোচ্চার হতে ভয়ের কিছু নেই, কারণ এটি ন্যায্য ও অবিতর্কিত দাবি। এ ধরনের একটি সংস্থা হলে, প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে নদীর ঢেউয়ের মতো ধ্বনিত হবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ের গাথা।

২৫ মার্চ, ১৯৯৬

তারেক মাসুদ নামের নিরীহ দর্শন, একহারা তরুণটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পড়তে এসেছিল দেড় যুগ আগে। আমার সঙ্গে তার টিউটোরিয়াল ছিল। পড়াশোনায় খুব একটা মনোযোগী ছিল এমন কথা বলব না। এ নিয়ে বকাবকি করলে মুখে বিনয়ী হাসি নিয়ে মাথা চুলকানো ছাড়া আর কোনো জবাব সে দিত বলে মনে পড়ে না। একসময় সে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। দীর্ঘদিন পর আমার সঙ্গে তার ফের দেখা হয় কয়েক বছর আগে। তখন সে মার্কিন প্রবাসী। বিবাহিত। এখানে শিল্পী সুলতানের ওপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করছে। নাম 'আদম সুরত'। তাঁর প্রথম প্রয়াস প্রশংসিত হয়েছিল।

ঐ সময় আমরা কয়েকজন (হাশেম খান, রবিউল হুসাইন, আক্কু চৌধুরী প্রমুখ) মিলে করেছি '৭১-এর যাত্রী'। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য দেশে-বিদেশে দলিল দস্তাবেজ খুঁজছি। এ সময় তারেক জানালো লিয়ার লেভিনের কথা। মার্কিন এ ভদ্রলোক মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে চলে এসেছিলেন সীমান্তে। অনেক ঘুরেফিরে একটি সাংস্কৃতিক গ্রুপকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। এবং এদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রায় বিশ ঘণ্টার ছবি তুলে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন হয়ত কোনো ছবি করবেন। করেন নি বা করতে পারেন নি। দীর্ঘ দু'যুগ পর তারেক তাঁকে খুঁজে বের করে। ঐদিন তারেক লেভিনের তোলা কিছু ফুটেজ আমাদের দেখিয়েছিল। তা দিয়ে একটি ছবি নির্মাণ করা যায় কি না তা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। আমরা উৎসাহিত হই, সাহায্যের কথা বলি এবং সাহায্য করতে ব্যর্থ হই।

এ ধরনের উৎসাহ তারেক অনেক জনের কাছে নিশ্চয় পেয়েছে। সাহায্য পায় নি। সে দমে যায় নি। ফিরে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। আদাজল খেয়ে লেভিন-এর কাছ থেকে ফুটেজ উদ্ধার করেছে। তারপর আনুষঙ্গিক ফুটেজ যোগাড় করে প্রায় দেড় ঘণ্টার একটি "ন্যারেটিভ ডকুমেন্টারি" নির্মাণ করেছে। তারেক ও তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন পরিচালিত এই 'মুক্তির গান' পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত দেখানো হচ্ছে। প্রায় চার বছর না খেয়ে না দেয়ে তারেক দম্পতি এটি নির্মাণ করেছে। প্রেক্ষাগৃহসমূহ এ ছবি দেখাবে না, যদিও অনেক প্রেক্ষাগৃহ মালিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে আগ্রহী। সেন্সর বোর্ড চার মাস এটিকে ছাড়পত্র দেয় নি। খুবই স্বাভাবিক সরকারের ধামাধরা ব্যক্তিরা সরকারের কাশিকেও ভয় পায়। এটুকু বলতে পারি, মাত্র কুড়ি টাকা খরচ করে 'মুক্তির গান' দেখা একটি অভিজ্ঞতা। অন্তত যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আমাকে তাই বলেছেন।

মুক্তির গানের বিষয়বস্তু খুবই সাদামাটা, যুদ্ধের সময় সীমান্তের ওপারে "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা" নামে ছোট একটি সাংস্কৃতিক দল গড়ে ওঠে। আজকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী মাহমুদুর রহমান বেনু, শাহীন সামাদ, স্বপন চৌধুরী, লায়লা জামান, লুবনা মরিয়ম, প্রমুখ ছিলেন এ দলে। একটি ট্রাক যোগাড় করেছিলেন তাঁরা।

লালসালুর একটি ব্যানার থাকতো সামনে। ছড়ের ওপর উড়ত মানচিত্র আঁকা বাংলাদেশের পতাকা। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাঁরা গান গেয়ে আনন্দ আর সাহায্য যোগাতেন, বাস্তুহারা ও মুক্তিযোদ্ধাদের। যেমন গাইতেন (১১টি গান আছে এ চিত্রে)—"এই না সোনার বাংলারে আজ রক্তে রক্তে ভরা/মানুষের এই দুঃখ দেইখা কান্দে চন্দ্র তারারে দয়াল" বা "আমার সোনার বাংলা"। এ তথ্যচিত্রের উপজীব্য এদের কর্মকাণ্ড, দৈনন্দিন জীবন। অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে যুদ্ধ। এটুকুই কাহিনী।
তারেক দম্পতি লেভিনের এই মূল ফুটেজের সঙ্গে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত আরো কিছু ফুটেজ জুড়েছেন। এবং মুক্তিযুদ্ধের একটি কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এটিই তাঁদের কৃতিত্ব। বাড়তি কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, সামান্য এই কাহিনী দিয়ে অস্থিরমতি দর্শকদের আশি মিনিট ধরে রেখেছেন। তারেক দম্পতি এ ছবি নির্মাণে সবার সাহায্য-সহযোগিতার কথা স্মরণ করেছেন। তবে আমার মনে হয় ওয়াহিদুল হক ও প্রয়াত দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা একটু বললে ভালো হতো। শুনেছি, এ ধরনের সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠনে তখন এ দু'জনের প্রচুর অবদান ছিল।

দুই

প্রথমে সাদামাটা কয়েকটা কথা বলি। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় প্রতিটি গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রায় প্রতিটি গণআন্দোলনের সূত্রপাতের (বা প্রতিবাদ) সঙ্গে তারা জড়িত। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা প্রবল ভূমিকা রেখেছেন। '৯০-এর আন্দোলনের শেষ মুহূর্তে যখন রাজনীতির কুশীলবরা উধাও তখন এই সাংস্কৃতিক কর্মীরাই মাঠে ছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকার বা কোনো রাজনৈতিক দল তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করে নি, সম্মানিতও করে নি, ব্যবহার করা ছাড়া। তারেকই প্রথম তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেই সংস্কৃতি কর্মীদের (কর্মের প্রতি) প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। এ কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন সামান্য কর্মী হিসেবে এদেশের সংস্কৃতিসেবীদের পক্ষ থেকে আমি এই দম্পতিকে ধন্যবাদ জানাই।
গত পঁচিশ বছরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যসংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র প্রায় বিনষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। এটাও কি বড় ধরনের ট্র্যাজেডি নয় যে, মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত কোনো কিছু করতে হলেও আমাদের বিদেশী সাহায্য লাগে? তাও বিদেশের কোথায় কী আছে তা আমরা জানি না। তারেক দম্পতির কৃতিত্ব এ ধরনের ফুটেজের অবস্থান খুঁজে বের করেছেন এবং তা থেকে একটি প্রামাণ্য দলিল নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে ক্যাথরিনের সম্পাদনার প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। ছবি দেখলে বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই আমাদের অনেকেও অবাক হয়ে দেখবেন কিছুদিন আগেও আমরা 'জয়বাংলা' বলে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলতাম। দেখবেন স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক ভদ্রলোক যাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা নৃশংসভাবে সপরিবারে পরে হত্যা করেছিল। আরো দেখবেন (বা শুনবেন) স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠক ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি "বঙ্গবন্ধু"র পক্ষে ঘোষণা পাঠ

করেছিলেন ইনিই পরে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হন এবং রাজাকার-আলবদরদের শুধু পুনর্বাসন নয়, রাষ্ট্রীয় পদে অভিষিক্ত করেন। আরো দেখবেন মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন শেখ মুজিবের নামে (নেতৃত্বে)। শুধু তাই নয়, যুদ্ধটি সত্যিই রক্তক্ষয়ী ছিল, এবং হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে যুদ্ধ করেছিল এবং যে ভারতকে কয়েকদিন আগেও বেগম জিয়া বাংলাদেশকে "গোলামীর জিঞ্জির" পরানোর জন্য অভিযুক্ত করেছেন, সেই ভারতীয়রা শুধু বিপুল সংখ্যক বাঙালিকে নয়, মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথে উল্লসিত জনতাকে দেখা গেছে তাদের আলিঙ্গন করতে। হয়ত, এসব দেখে, এ প্রজন্মের অনেকেই অবাক হবে। আজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলার জন্য দশটি মিছিল, বিশটি বক্তৃতা, ত্রিশটি বিবৃতি থেকে এ ধরনের একটি ছবি অনেক বেশি শক্তিশালী। স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলোর উচিত এ ধরনের ছবি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া। মিছিল-বক্তৃতার খরচ দিয়ে এ ধরনের তথ্যচিত্র নির্মাণে সহায়তা করা। তবে, তারা তা করবেন না। তাদের ক্ষমতা অনেক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তবে বোধ নিয়ে যে সন্দেহ আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

এ ছবি আরো বলে দেয়, যারা শুধু প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছিলেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা নয়, দেশে যাঁরা ছিলেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা; যারা গান গেয়েছিলেন, ছবি এঁকেছিলেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা। সে হিসেবে একজন কামরুল হাসান বা আলতাফ মাহমুদও বীরোত্তম; যদিও সে ধরনের কোনো স্বীকৃতি তাঁরা পান নি। আমার তো মনে হয়, মনে হয় কেন, প্রস্তাব যে, রজতজয়ন্তী উপলক্ষে, যেসব বিদেশী ব্যক্তিবর্গ ও শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের সময় জনমত গঠনে ও সাহায্য প্রদানে বিশেষভাবে কাজ করেছেন তাঁদের স্বাধীনতা পদক দেয়া হোক। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে লেভিনকেও এ পদকে ভূষিত করা যায়। কেননা, এ ধরনের কাজ যা লেভিন করেছেন, তা শুধু পেশাগত কারণেই সম্ভব নয়, ভালোবাসাও প্রয়োজন।

তিন

'মুক্তির গান'-এর শুরুটা লক্ষণীয়। আকস্মিকভাবে সারা স্ক্রিন জুড়ে থাকে লোকে-লোকারণ্য রেসকোর্স আর শেখ মুজিব। দেখে মনে হয়, এত মানুষ ছিল রেসকোর্সে! যেন পুরো ঢাকা এঁটে গেছে সেখানে। বলছেন বঙ্গবন্ধু, 'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি ...।" আরে আমিও তো সে সময় ছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে রেসকোর্সের ধার ঘেঁষে। স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়ে প্রকাশিত লেখকদের কাগজ বিক্রি করছিলাম। আমরা বঙ্গবন্ধুর মুখ দেখি নি। এখন ক্লোজ আপে দেখি তা জ্বলজ্বল করছে। আবেগে থরথর মুখ আর কণ্ঠস্বর। হুঙ্কার তাঁর—"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ..." আমিও আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ি যেমনটি হয়েছিলাম ২৫ বছর আগে। তারপর মেশিনগানের শব্দ, মৃতের স্তূপ, আর ছুটে পালানো মানুষ সব। আমার জীবন থেকে ২৫টি বছর খসে যায় আর এভাবেই আমি ঢুকে পড়ি ছবির ভেতর। যুদ্ধ চলছে, উদ্ধাস্তু আসছে, গঠিত হয়েছে ছোট্ট শিল্পী সংস্থা। ট্রাকে করে তারা পাড়ি দিচ্ছে একেকটি অঞ্চল। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই লোকজন তাদের ঘিরে ধরছে। মনে হতে পারে একি সত্যি যে, এত

রক্তক্ষয়ের মধ্যেও মানুষ গানের জন্য এমন পাগল হতো? হ্যাঁ, হতো। ঐ সময় শুধু যুদ্ধাঞ্চলই নয়, অবরুদ্ধ বাংলাদেশেও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল মুক্তিযুদ্ধের গান। মনে কি পড়ে আপনাদের সেই সব গান—'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' বা 'জনতার সংগ্রাম চলবে চলবে' বা 'শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে'। অংশুমান রায়ের গাওয়া শেষোক্ত গানের রেকর্ডটি যেদিন যোগাড় করেছিলাম, মনে আছে কিভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তা শুনেছিলাম এবং আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেছিলাম। 'জয়বাংলা' 'বাংলার জয়!' মনে পড়ে না আপনাদের? ভেবে অবাক হই এসব শিল্পী কেন পান নি যুদ্ধের কোনো উপাধি। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' শুনে কি চোখ ভরে ওঠে নি পানিতে?' ওমা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি'—আক্ষরিক অর্থে কি তা অনুভব করে অনেকে যুদ্ধে যান নি!

'শিল্পী সংস্থার শিল্পীরা যাচ্ছেন মুক্তাঞ্চলে।' শ্লোগান উঠছে, 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। তারপর—'জয়বাংলা'। হঠাৎ সারা প্রেক্ষাগৃহ থেকে উঠে আসে শ্লোগান 'জয়বাংলা'। বোঝা যায়, বাংলাদেশ ঘিরে রেখেছে বটে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কিন্তু তা দমাতে পারে নি 'জয়বাংলা'। তাই ফাঁকফোঁকর দিয়ে আচমকা বেরিয়ে আসে এ দুটি শব্দ যা জড়িত মুক্তির সঙ্গে, বুক ভরে যায়, চোখে আসে জল। না, শুধু আমি নই, এভাবে দর্শকরাও ঢুকে যান ছবিতে, এভাবে পুরো প্রেক্ষাগৃহ যেন হয়ে ওঠে ১৯৭১-এর জীবন-মুক্তিযুদ্ধ।

এভাবে আমরা সেই আশি মিনিটে আমাদের জীবন খুঁজে পাই। ১৯৭১ সালে একবারই তো আমরা হয়েছিলাম শুদ্ধ মানব। মুক্তিযুদ্ধ ছিল নির্ভয়ে পথ চলা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অন্যায় আপোসকে বিসর্জন দেয়া। অন্য কথায় নির্ভয়ের সংস্কৃতি। তা ছিল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়। ভ্রাতৃত্ববোধের সময় যা এই ছবির ফ্রেমে ফ্রেমে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু তারপর আমরা কিভাবে বদলে যাই। আমরা বার বার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। লুটে অংশ নিতে শুরু করি। সমঝোতা শুরু করি, ভয় করতে শুরু করি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ি। ফলে রাজনীতি হয়ে ওঠে আপোসের রাজনীতি। পরাজিতের রাজনীতি, ভয় পাওয়া মানুষের রাজনীতি। মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি চর্চা রুদ্ধ হতে থাকে। শুরু হয় আপোস, সহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা, আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতি এবং এই প্রতিটি উপাদান আজকের রাজনীতিতে হয়ে উঠছে মহীরুহ। সে কারণে মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধ করাটা যত সহজ, মুক্তিযোদ্ধা থাকাটা তত কঠিন।

সবশেষে দেখি, ট্রাকে বসা তরুণীটির লাল আঁচল উড়ছে, পথটি চলে গেছে স্বাধীন বাংলাদেশের দিকে। ছবি শেষ হয়। প্রেক্ষাগৃহ স্তব্ধ। আমরা নিশ্চুপ বসে থাকি, হয়ত এই লজ্জায় যে 'জিন্দাবাদের' সঙ্গে কিভাবে আপোস করেছি; আবার গোপন আবেগে অনেকের চোখ সিক্তও, কিন্তু মুখে স্মিত হাসিও। কারণ, আমরা একবার হলেও আশি মিনিটের জন্য শুদ্ধ মানুষে পরিণত হয়েছিলাম।

তারেক, আমার শিক্ষকদের ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর যখন মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে আলবদররা খুন করে তখন তুমি ছোট। আজ নিশ্চয় দেখছো রাজনৈতিক

দলগুলো তাকে কী সম্মান দেয়। ঐদিন ১৪ তারিখ শুধু আমার নয়, আমাদের চোখে ছিল জল। ১৬ ডিসেম্বর মুক্ত হলাম। সেদিন মুখে হাসিও ছিল কারণ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। স্বাধীন দেশে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাপারটা অনুভব করতে পারবে না। চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে আমরা বরণ করেছিলাম স্বাধীনতা। আজ তোমার ও তোমার স্ত্রীর নির্মিত ছবি দেখে আমার চোখও মাঝে মাঝে পানিতে ভরে উঠেছে কারণ তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে সেই অসাধারণ সময়ে—জীবনে যা একবারই আসে। আমার মুখে হাসি এবং তা গর্বের। কারণ, আমরা অনেকে যা পারি নি তুমি তা পেরেছো, ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে (১৯৭১) সংরক্ষণ করেছো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কি হতে পারে? একজন শিক্ষকের জন্য এটিও ছাত্রের এক বড় উপহার। তারেক তোমাকে অভিবাদন। তোমার স্ত্রীকেও।

১৯৯৫

মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্র এবং মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাষ্ট্র—বনাম এবং এতে তফাত একটা আছে নিশ্চয়। ১৯৭৫ সাল থেকে কিছুদিন আগ পর্যন্ত হলেও অনায়াসে বলা যেত মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাষ্ট্র। কারণ এ সময়টা রাষ্ট্রের শত্রু বা অপরপক্ষ বলে পরিগণিত হতো মুক্তিযোদ্ধারা। ১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে মুক্তিযোদ্ধার অন্তর্নিহিত শব্দই বদলে দিতে থাকেন, পরিবর্তিত হয়ে যায় রাষ্ট্রের আদর্শ। মুক্তিযোদ্ধারা যে রাষ্ট্রের স্রষ্টা সে রাষ্ট্র থেকে তিনি উৎখাত করতে চাইলেন মুক্তিযোদ্ধাকে, মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটকে কিন্তু কাজটা ছিল দুরূহ। কারণ যাঁরা শুধু অস্ত্র হাতে লড়াই করেছেন তাঁরাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা নন। যাঁরা এই স্পিরিটকে ধারণ করেছেন, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন তাঁরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। প্রথমোক্ত ঐ সঙ্কীর্ণ অর্থ ধরলে বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন আহমদকে আমরা কোন্ ক্যাটাগরিতে ফেলবো? এ কারণেই সাধারণ মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের ধারণাটা উপড়ে ফেলা ছিল কঠিন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্র উৎখাত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বন্দনা না করে উপায় ছিল না। এ কারণে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হিংস্র শক্তিসমূহ যেমন আলবদর, রাজাকার বা জামায়াতীদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিষ্ঠার সঙ্গে জেনারেল এরশাদ এবং আরও পরে বেগম জিয়া এই ধারণাটিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জেনারেল এরশাদ সাভার স্মৃতিসৌধ সম্প্রসারণ করছেন, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান বদল করে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছেন। বেগম জিয়ার আমলে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ডাক টিকিট প্রকাশ শুরু হলো, আবার একই সঙ্গে গোলাম আযম নাগরিকত্ব পেলেন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করায় ২৪ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আদালতের কাঠগড়ায় তুললেন।

এতবড় ভূমিকাটি দিতে হলো একটি কারণে। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি নির্দেশ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের (যাঁরা লড়াই করেছেন অস্ত্র হাতে) রাষ্ট্রীয় সম্মানে সমাহিত করতে হবে। সংবাদটি ছোট এবং কাগজে যে ফলাও করে ছাপা হয়েছে তাও নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে এটি একটি অসামান্য কাজ। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিলেন গ্রামের সাধারণ বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধ শ্রেণীভেদ লুপ্ত করেছিল, মসজিদে যেমন শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের পর যদি লাভবান হয়ে থাকেন তাহলে হয়েছেন শহরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা। গ্রামের মানুষ, গ্রামে ফিরে নিজ নিজ কাজে মন দিয়েছেন। গত দু'দশক উপেক্ষার বছরগুলোতে তাঁরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা বিরোধীদের হাতে, দারিদ্র্য বরণ করেছেন, অনেককে ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাষ্ট্র কখনও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। শ্রেণীর বিষয়টি আবারও এসে গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতো দূরের কথা।

রাষ্ট্রের স্বীকৃতিটি কী? তাঁদের কাজের মর্যাদা দান। তাঁদের বেঁচে থাকার সহায়তা প্রদান। ১৯৭২ সালের পর এ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারপর

আর কিছুই হয়নি। কিন্তু যে রাষ্ট্র যাঁরা গড়েছে সে রাষ্ট্রে তাঁরা উপেক্ষিত হলে সমাজে শান্তি আসে না, দাঙ্গা, ক্ষোভ বিরাজ করে। বাংলাদেশের সমাজেও তাই হয়েছিল।

বর্তমান সরকার সব সময় নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে স্বীকার করেছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির কারণে দোদুল্যমানতা দেখিয়েছে বটে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের সঙ্গে জোট বাঁধেনি। বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। রায়েরবাজারে সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের নির্মাণ কাজ চলছে, পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি যতটা সম্ভব সংশোধন করেছে, বাজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরেকটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বধ্যভূমি সংরক্ষণ। এর জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটি কমিটি করেছিল। কমিটির কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। আরেকটি প্রস্তাব আছে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে থোক বরাদ্দ করা হয়েছে তার সঙ্গে আরও কিছু টাকা যোগ করে একটি 'মুক্তিযোদ্ধা ব্যাংক' গঠন করা যায় কিনা। এ ব্যাংক থেকে গরিব মুক্তিযোদ্ধারা স্বল্প হারে ঋণ নিয়ে যেন কিছু করে স্বাবলম্বী হতে পারেন; তাঁদের যেন ভাতার জন্য আন্দোলন করতে না হয়। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা এমন কারও হাতে দেয়া দরকার যিনি ব্যবস্থাপনা বোঝেন। রুটিন মাফিক নিছক আমলা বসাবার জন্য এটি একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাহিত করার নির্দেশে আবার লুপ্ত হলো মুক্তিযোদ্ধার শ্রেণীভেদ। আজ যখন গ্রামের একজন নিঃস্ব মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাহিত করা হবে তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাসী গর্ববোধ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত, সঞ্চারিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এসব কাজ ইতোমধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলা শুরু করেছে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা জোট বেঁধেছে। গতকাল, জোটবদ্ধভাবে তারা চট্টগ্রামে খুন করেছে আটজনকে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এই হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, যে কোনো মূল্যে তারা চাইবে মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রকে আবার তাদের মতো করে নিতে যাতে লেখা যায়, বলা যায়—মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাষ্ট্র। মুক্তিযোদ্ধার রাষ্ট্রকে আবার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার, যা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং সে কারণে কোনো ক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাবিরোধী বা মৌলবাদীদের প্রতি দোদুল্যমানতা দেখাবার আর কোন অবকাশ নেই।

বাঙালি কুণ্ঠাবোধ করেন আত্মজীবনী রচনায়। আত্মজীবনী রচনার বিষয়টি হয়তো জড়িত নগরায়ন, আধুনিক মননের সঙ্গে। বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়া এখনও অসম্পূর্ণ, তাই এ অঞ্চলের বাঙালির এ বিষয়ে সংকোচ আরও বেশি। ইদানীং অবশ্য আত্মজীবনী রচনায় অনেকে এগিয়ে আসছেন। তবে এখানে এখনও আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনীর মতো বড় মাপের আত্মজীবনী লেখা হয়নি।

সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য উপাদান হিসেবেও আত্মজীবনী গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই আত্মজীবনীই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেখানে 'আমি'র সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজ। কারণ, 'আমি' প্রবল হলে পরিবেশ, সমাজ সব আড়ালে পড়ে যায়। হয়ে ওঠে তা গুরুত্বহীন। আত্মজীবনীর অন্য একটি দিক অবশ্য বিবেচ্য। তা হল এই ধরনের রচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য। জানতে পারি লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং ওই অবস্থান নির্ধারণ করতে পারলেই একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক চালচলন, মূল্যবোধ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী। কিন্তু এটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। ভাগ্যচক্রে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন বাংলাদেশের এমন এক পরিবারের সঙ্গে, যে পরিবারের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় অবদান স্বীকৃত এবং এখনও সে পরিবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে পালন করছে বড় ভূমিকা। ড. মিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় জামাতা এবং বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্ত্রী। ফলে তাঁর রচিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' স্বাভাবিকভাবেই অনেককে আগ্রহী করে তুলেছে। প্রচলিত অর্থে এটি আত্মজীবনী নয়, যদিও ড. মিয়া রচনা করতে চেয়েছেন তা। আবার প্রচলিত অর্থে এটি রাজনৈতিক ইতিহাসও নয়, যদিও তিনি রচনা করতে চেয়েছেন ইতিহাস। দুটি বিষয়েরই যে নিজস্ব পদ্ধতি আছে তা তিনি ব্যবহার করেননি। তা সত্ত্বেও বলতে পারি, গ্রন্থটি একই সঙ্গে ড. মিয়ার স্মৃতিকথা ও বাংলাদেশের গত তিন দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের কালপঞ্জি।

দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক বইটি রচনা করেছেন। এক. অনেকে তাঁর পরিচয় পেয়ে আগ্রহভরে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন এবং তাঁর কাছে "বিভিন্ন তথ্য জানা তরুণ সমাজের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে মনে হয়েছে।" দুই. "ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের গোটা রাজনৈতিক ইতিহাস এবং পরবর্তীকালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ও তাঁর জীবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তা-ই জাতির ইতিহাস, তথা জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় রেখে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবগতির

জন্য ... অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

এ দুটি উদ্দেশ্য মনে রেখে তিনি বিধৃত করেছেন ১৯৬১ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা। বছরভিত্তিকভাবে ঘটনাগুলোকে ভাগ করেছেন তিনি এবং তারপর বিবরণ দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার, সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব অথবা তাঁর নিজের সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরেছেন। এ কারণে তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজন সম্পর্কে বিবরণ খুবই কম এবং যা-ও আছে তা-ও খুব সংক্ষিপ্ত। এমনকি মুজিব-পরিবার সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু নেই। আসলে, গ্রন্থের শিরোনামের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বই থেকে খানিকটা অনুধাবন করা যায় একটি বিশেষ সময়কে এবং জানা যায় ড. মিয়ার জীবনের মোড় ফেরানো ঘটনাবলি।

যেহেতু ডা. ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞানী এবং পরমাণু-বিজ্ঞানী, তাই দেখি তাঁর সময়ের বর্ণনায়ও সেই পরমাণু-বিজ্ঞানীর মন, শৃঙ্খলা কাজ করেছে। প্রতিটি ঘটনা তা স্মৃতিকাহিনী বা কালপঞ্জিই হোক, খুব যথাযথ ও আবেগবর্জিত। সাধারণ পাঠকের জন্য বিষয়টি খুব সুখকর না হলেও এর অন্য মূল্য আছে। এটা খুব স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁর গ্রন্থটি রচনার সময় তাঁর মনে কাজ করবে পূর্ব ধারণা। কিন্তু বইটি পড়ে পাঠকের তা মনে হবে না। বা কথাটি অন্যভাবে বলি। বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত তাঁর কাছে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা ছাড়া বাকি সবকিছু কালো, যিনি বিএনপির সঙ্গে যুক্ত তার কাছে খালেদা জিয়া ও বিএনপি ছাড়া বাকি সব বর্জ্য। ডা. মিয়া শেখ মুজিবের জামাতা, শেখ হাসিনা তাঁর স্ত্রী, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলা দুরূহ যে, তিনি আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনা বা বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কিছু চোখে দেখেননি। এ বাধা অতিক্রম করে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

গ্রন্থটি পড়ে আমার মনে হয়েছে ড. ওয়াজেদ মিয়া ক্রমেই মুজিব-পরিবারের হয়ে উঠেছিলেন দ্বাদশ ব্যক্তির মতো। সত্তর দশকের পূর্বপর্যন্ত যখন শেখ মুজিব হয়ে ওঠেননি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তখন তাঁর সংশ্লিষ্টতা বেশি, আবেগের অনুরণন অনুধাবন করা যায় ওই সংক্ষিপ্ত বিবরণেও। তা-ই ওই সময়ের বর্ণনায় দেখি শেখ হাসিনার পরিচয় আছে সলজ্জ কিশোরী হাসু হিসেবে, তন্বী-তরুণী হাসিনা, বর্ণনা আছে তাঁর দীঘল চুলের, তাঁর অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার। সত্তর দশক থেকে দেখা যাচ্ছে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠেন শেখ মুজিব, কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন একচ্ছত্র ক্ষমতার, তখন দেখি তাঁর জামাতা ডা. ওয়াজেদ হয়ে উঠছেন পর্যবেক্ষক, কমে যাচ্ছে পরিবার-সংশ্লিষ্টতা, এমনকি শেখ হাসিনাও অনেক কথোপকথনের বিবরণ দেন না আর তাঁকে। আরও পরে দেখি শেখ হাসিনাও যখন হয়ে উঠছেন একধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তখন মনে হচ্ছে ওই পরিবারে ড. মিয়া থেকেও যেন নেই। যে কারণে বর্ণনায়, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা হয়ে উঠছেন এক সময় হাসিনা থেকে ম্যাডাম হাসিনা।

ড. ওয়াজেদ মিয়া যে সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে চেয়েছেন, সে সময়টি আমাদেরও; আমাদের বেড়ে ওঠার সময়। ওই সময় এত দ্রুত এত ঘটনা ঘটেছে যে তার অনেক কিছুই আজ আমাদের মনে নেই। যার ফলে বর্তমানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

অনেক ঘটনার নতুন বিন্যাস, বিকৃতায়ন এবং যেহেতু আমরা অনেকেই বিস্মৃত সেসব ঘটনা সম্পর্কে বা বর্ণিত হয়নি সেসব তেমনভাবে কোনো গ্রন্থে, তাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের বহু তথ্য, অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে বর্তমান গ্রন্থে যা খুবই তাৎপর্যবহ। এবং তা পর্যালোচনা করলে অনেক রাজনীতিবিদের আচরণ, ঘটনা বা রাজনীতি বোঝা সহজ হবে। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শেখ মুজিব প্রথম ঘোষণা করেন যে, এ অঞ্চলের নাম হবে বাংলাদেশ।

২. ১৯৭১ সালের, একদিন রাতে সপরিবারে রাতের খাবার খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—"দেশটা যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তাহলে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করো।"

৩. খন্দকার মোশতাক যিনি এখন আমাদের ইতিহাসে খলনায়ক হিসেবে পরিচিত, তার ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধের আগ থেকেই। যেমন পঁচিশে মার্চ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা এসে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন সাবধানে থাকতে। সেদিন একমাত্র খোন্দকার মোশতাককে সেখানে দেখা যায়নি। স্বাধীনতার পর ড. মিয়াকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যেন জ্যেষ্ঠতাসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয় সে তদবির করতে। আরও পরে ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসে একদিন ড. ওয়াজেদ মিয়া খোন্দকার মোশতাকের বাসায় গিয়ে দেখেন রশীদ নামে এক মেজর তাঁর সঙ্গে গোপন আলাপ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

৪. ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে জনাব হান্নান কর্তৃক প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। ড. ওয়াজেদ লিখেছেন—"বঙ্গবন্ধুর ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ওই টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর-এর ওই বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর-এর ওই সদস্যটিকে সম্প্রচার-যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।"

তথ্যটি ভ্রান্ত কি ভ্রান্ত নয় সে বিতর্কে না গিয়ে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি একটি ব্যক্তিগত মন্তব্য করব। ২৬ মার্চ ওই বার্তা প্রচারিত হয়েছিল কি হয়নি, বা ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কি করেননি এগুলো নিয়ে বিতর্ক বালখিল্যতা। কারণ ইতিহাস যখন লেখা হবে, পঞ্চাশ কি একশ বছর পর, তখন স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিবের নামই আসবে, বাকিরা ফুটনোটে থাকলেও থাকতে পারেন। এ নিয়ে তর্ক সময়ের অপচয় মাত্র।

৫. বেগম জিয়া ১৯৭২ মাঝামাঝি শেখ হাসিনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। "১৯৭১-এর মে মাসে বেগম খালেদা জিয়াকে জিয়াউর রহমান

সাহেব লোক মারফত চিঠি লিখে ভারতে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও খালেদা জিয়া ভারতে যাননি বলে জিয়া সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ... এসব ঘটনার কারণে ওই সময় কর্নেল জিয়াউর রহমান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। হাসিনা আমাকে আরও জানায় যে, এই পারিবারিক মনোমালিন্যের সমস্যা নিরসনে সাহায্য করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ওই সময় অনেক অনুরোধ করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। খুশির বিষয় এর অল্পকাল পর বেগম জিয়ার পারিবারিক সমস্যার অবসান হয়েছিল।"

৬. শেখ মুজিবের হত্যার একটি কারণ হিসেবে রক্ষীবাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়। রক্ষীবাহিনী অত্যাচার করেনি এ কথা কেউ বলবে না। কয়েকদিন আগে নৌবাহিনীর কিছু সদস্যও চট্টগ্রামের একটি অঞ্চল বিরান করে দিয়েছে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের ওপর সিভিল কর্তৃপক্ষ শৈথিল্য দেখালে এ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বলা হয় শেখ সাহেব রক্ষীবাহিনী করেছিলেন সেনাবাহিনীর বিপরীত শক্তি হিসেবে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য। ড. ওয়াজেদ জানাচ্ছেন, ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। "মস্কো থেকে এসে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীকে একীভূত করার। কারণ এই দুই বাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব প্রায় একই ধরনের। কিন্তু ওই ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে এই দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয় পিলখানার চত্বরে। এদের সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ওদের গোলাগুলি বন্ধ করানোর জন্য বঙ্গবন্ধু স্বয়ং পিলখানায় যেতে বাধ্য হন।" 'এই তিক্ত অভিজ্ঞতার' পর দুটি বাহিনীকে আলাদা করে দেয়া হয়।

৭. বাংলাদেশের টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের গোয়েবলসীয় প্রচারণায় এ ধারণা সবার বদ্ধমূল যে, জেনারেল এরশাদই যমুনা সেতুর স্বপ্ন দেখে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আসল ঘটনা হল, শেখ মুজিবের আমলেই যমুনা সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, নির্বাচন করা হয়েছিল স্থান এবং ১৯৭৪ সালে জাপান আশ্বাস দিয়েছিল সাহায্যের।

৮. রাজাকার, রাজাকারবাদ ও রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও এর বিরোধিতা, বর্তমানে রাজনীতির অন্যতম বিষয়। বলা হচ্ছে, মুজিব আমলে দালালদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৩৪,৬০০ পাকিস্তানপন্থী দালাল বা স্বাধীনতাবিরোধীদের মুক্তি দেয়া হয়েছিল। ড. মিয়া লিখেছেন—"সে সময়ে যে সমস্ত রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী দালাল এবং ঘাতকদের বিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাওলানা ভাসানী, ড. আলীম আল-রাজী, অধ্যাপক আবুল ফজলসহ সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকাগোষ্ঠী। উপরন্তু মাওলানা ভাসানী এক পর্যায়ে ১৯৭৩ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দালাল আইন বাতিল করার দাবি

জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আলটিমেটামও দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ছিল বিদেশী চাপ এবং এত লোকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথাযথ সাক্ষ্য-সাবুদ জোগাড়ের ক্ষেত্রে নানান দুরূহ অসুবিধা ও সমস্যা এবং প্রশাসনিক নিরতিশয় দুর্বলতা। সে যাই হোক, বঙ্গবন্ধুর সরকারের ওই সাধারণ ক্ষমার আওতায় সকল রাজাকার ও ঘাতক অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ... খুন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন, অপহরণ প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কোনো ব্যক্তিকে আর কখনও বিচার করা যাবে না এতদমর্মে সংবিধানগত কোনো বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা ইনডেমনিটি বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেনি বঙ্গবন্ধু সরকারের এই সাধারণ ক্ষমা-ঘোষণা।"

এরপর বর্ণিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ঘটনা। এখানে ড. ওয়াজেদ শিশু রাসেল হত্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার খানিকটা উল্লেখ করব। বাসন্তী গুহঠাকুরতার মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থ ছাড়া আর কারো লেখায় এত নিরাসক্তভাবে নিষ্ঠুর বর্ণনা আর দেখিনি। "... রাসেল দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকজনের কাছে আশ্রয় নেয়। তাকে দীর্ঘকাল যাবৎ দেখাশোনার ছেলে আবদুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিল। একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর জন্য রমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেয়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, "আল্লাহর দোহাই, আমাকে জানে মেরে ফেলবেন না। বড় হয়ে আমি আপনাদের বাসায় কাজের ছেলে হিসেবে থাকব। আমার হাসু আপা দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানিতে আছেন। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আপনারা আমাকে জার্মানিতে হাসু আপা ও দুলাভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিন।' তখন উক্ত সৈন্যটি রাসেলকে বাড়ির গেটস্থ সেন্ট্রি-বক্সে লুকিয়ে রাখে। এর প্রায় আধঘণ্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে তার মাথায় রিভলবারের গুলিতে।"
আপনাদের যাদের রাসেলের মতো শিশুপুত্র আছে বা ভাই বা নাতি আছে তাকে রাসেলের জায়গায় বসান, তারপর চোখ তুলে দেখুন আপনার সামনে খুনিরা হেসে হেসে বেড়াচ্ছে। আশা করি তখন অনেকেই অনুধাবন করতে পারবেন কেন দেশের মানুষ ইনডেমনিটি বিল বাতিল চায়, কেন গোলাম আযমের বিচার দাবি করে।
এরকম অনেক বিষয় আছে উল্লেখ করার মতো। এ গ্রন্থে মানুষ মুজিবের পরিচয় পাওয়া যায়, যার হৃদয়টি ছিল বিশাল; আবার এ পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি কীভাবে প্রেসিডেন্ট মুজিব হয়ে উঠছেন এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায় স্পর্শ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষের। বাংলাদেশে অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি আগেও ছিল, কিন্তু তখন দেখা গেল যে তা ব্যক্তি, প্রশাসন, সমাজ, রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন দেখি শেখ মুজিব নিজেকেই জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা নিষ্প্রয়োজন। সেটি যে এখনও বিদ্যমান নয় তা নয়, বরং তা তুঙ্গে। তবে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি, এখনও 'বঙ্গবন্ধু' না বললে আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু এতে ক্রুদ্ধ হওয়ার কী আছে? বঙ্গবন্ধু না বললে কি প্রমাণিত হবে যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়নি?

অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতির রেশ ধরে তখন বেশকিছু ঘটনা ঘটে। তাজউদ্দীন আহমদকে একরকম নির্বাসিত করা হয় যা অনেকেই পছন্দ করেননি, কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল। এরই মধ্যে আবার যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক টানাপড়েন, বিশেষ করে শেখ মনির উত্থান এবং ভায়োলেন্সে তাঁর আস্থা যা তিনি ওই সময় উল্লেখ করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে এবং যা চকিত করেছিল অনেককে। এখানে আরেকটি বিষয় ফুটে ওঠে; তা হল, আমাদের সমাজে জাতিগোষ্ঠী সম্পর্ক এত প্রবল যে সবকিছু ছাপিয়ে তা প্রভাব ফেলে।

এসব পরিস্থিতিতে বেগম মুজিবের ভূমিকা জেনে বিস্মিত হতে হয়। ডা. ওয়াজেদ উল্লেখ না করলে তা অনুদ্‌ঘাটিত থাকত। কয়েকদিন আগে ফজলুল বারীর নেয়া এক ভারতীয় সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার দেখলাম। তিনি উল্লেখ করেছেন, বেগম মুজিব ছিলেন বলেই শেখ মুজিব শেখ মুজিব হয়েছিলেন। আগরতলা মামলা চলাকালীন প্যারোলে শেখ মুজিবের মুক্তির বিরোধিতা, পাকিস্তান গমনে মানা করা বা তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা—এসব বিবেচনা করলে দেখা যায় তাঁর একধরনের 'আর্থলি ইনসটিংকট' ছিল। মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হবে কোন বিষয়ে তা যেন তিনি অনুধাবন করতে পারতেন। অথচ ওই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধেও অপপ্রচার কম হয়নি।

ড. ওয়াজেদ বর্তমান গ্রন্থে যেসব উৎসের উল্লেখ করেছেন তা খুব একটা প্রামাণিক নয়। খুব সম্ভব কালপঞ্জিটি তৈরি করার জন্য তিনি দৈনিক পত্রিকা ব্যবহার করেছেন যদিও তার উল্লেখ নেই। শুধু এক ধরনের উৎস বা শুধু পত্রিকা দেখে এ ধরনের কাজ করলে খানিকটা অসুবিধা হয়। যেমন আজ যদি কেউ গত দশ বছরের পত্রিকা ঘেঁটে এরশাদ আমলের একটি কালপঞ্জি তৈরি করেন তাহলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছিল। কারণ ওই সময় অধিকাংশ পত্রিকা ছিল এরশাদের পক্ষে। শেখ মুজিবের আমলে শেখ মুজিবের পক্ষে, এখন আবার খালেদা জিয়ার পক্ষে। এর পাশাপাশি অন্যান্য উৎসের গুরুত্ব পাওয়া উচিত। না হলে কী হয় তার দুএকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১ জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে মুজিব আমলে প্রথম গুলিবর্ষণ করা হয়। ডা. মিয়া তাঁর বইতে ১ তারিখের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ২ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা জুড়ে যে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা উল্লেখ করেননি। আমি ওই সময় ডাকসুতে ছিলাম। আমি জানি ছাত্রলীগ তখন কী করেছিল।

বাকশালের কথা উল্লেখ করেছেন ড. ওয়াজেদ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ ছিল এবং অনেকে যোগ দিয়েছিলেন অনিচ্ছায় তার কিন্তু উল্লেখ নেই। একমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখি, কবি জসিম উদ্‌দীনের বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রত্যাখ্যান। সাধারণ ক্ষমারও প্রতিবাদ হয়েছিল, তারও উল্লেখ নেই। ব্যাপারটি এ কারণেও হতে পারে যে, ড. ওয়াজেদ মিয়া যতই পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকুন না কেন, তিনিও ছিলেন ক্ষমতার কাছাকাছি। ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি করেননি, কিন্তু ক্ষমতার কাছাকাছি থাকলে মানুষের কষ্ট অনুধাবন করা দুরূহ। এ কারণে গ্রন্থটিকে অনেকের একরৈখিক মনে হতে পারে। এ ছাড়া তিনি একটির পর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা-

যোগসূত্র নেই, ফলে ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা পড়ছি, কিন্তু সংহত কোনো চিত্র তো পাই না। এভাবেই ইতিহাস রচনা কিন্তু কষ্টকর।

তা ছাড়া নির্বাসনের পর শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরাতে বইটি শেষ হলেই যুক্তিযুক্ত হত। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা ঢাকা এসে যে বিশাল অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা দেখে ড. মিয়া তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন—"এখন থেকে তোমাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজকর্ম চালাতে হবে। অন্যের তোষামোদিতে তোমার মাথা যেন মোটা না হয়ে যায় তার জন্য তোমাকে এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে নিরন্তর।" সাধারণ কিন্তু মূল্যবান কথা যা আমরাও প্রায় সময় বলি। কিন্তু জানি এবং দেখছি এ কথা কেউ মনে রাখে না, রাখেনি।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ বইটিকে আমি বছরের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা বলে মনে করি। কারণ, বইটিতে বাংলাদেশের ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ঘটনার কালপঞ্জি পাই যা ত্বরিত রেফারেন্সের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এ বইটি হয়তো তৈরি করা উচিত ছিল আমাদের, কিন্তু লজ্জার বিষয় আমরা তা পারিনি। একজন পরমাণু বিজ্ঞানী তা পেরেছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে দুটি বিষয় বলতে চাই, যদিও ড. ওয়াজেদ তা উল্লেখ করেননি। অবশ্য তাঁর রচনাপদ্ধতির মধ্যে সে সুযোগও ছিল সীমিত। তাঁর ত্রিশ বছরের কালপঞ্জি পড়ে আমার মনে হয়েছে—

এক. গত ত্রিশ বছর ঢাকা শহরে ছিল মিছিল আর মিছিল। আর লাশ। যদি গত তিন দশকের শহীদ আর নিহতদের স্মৃতিচিহ্ন নির্মিত হয় তাহলে উড়োজাহাজ থেকে ঢাকাকে মনে হবে স্মৃতিচিহ্নে ভরা এক শহর। সবাই জানেন যে, যে যায় সে চলে যায়। লাশের মর্যাদা, মানুষের মর্যাদা দেয় না এদেশের রাজনীতিবিদরা, তবুও তাদের ডাকেই আবার সবাই মিছিলে যায়।

দুই. রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবধরনের সশস্ত্র ব্যক্তির প্রভাব। এদের একদল ইউনিফর্ম পরিহিত, আরেক দল ইউনিফর্মহীন। একটি দেশের মানুষ তখনই মানুষ বলে বিবেচিত হন, সভ্য বলে পরিচিত হন, যখন ইউনিফর্ম পরিহিত সশস্ত্ররা নিরস্ত্র বা সিভিল কর্তৃত্বের অধীনে থাকেন এবং ইউনিফর্মহীনরা কঠোরভাবে শাসিত হন। যারা এ দুধরনের সশস্ত্রদের নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন বা দমনে শৈথিল্য প্রকাশ করেছেন তাদেরই কাল হয়েছে। যেমন এখনও আবার দেখছি রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে সবধরনের সশস্ত্রদের। নিরস্ত্র আমরা বসে আছি হাঁটু গেড়ে। বিনিয়োগ ক্রমেই কমছে আর নিরস্ত্র মানুষ ছোট থেকে ছোট হচ্ছে সম্পদে, আত্মমর্যাদায়। পৃথিবীর মানুষ সেই নেতা বা সেই সরকারকেই সম্মান করে, বাহবা দেয়, যখন তিনি বা সেই সরকার সশস্ত্রদের হটিয়ে নিরস্ত্রদের মর্যাদার আসনে বসান বা মানুষকে নিয়ে যান বড় করার পথে।

২৮ মাঘ, ১৩৯৯

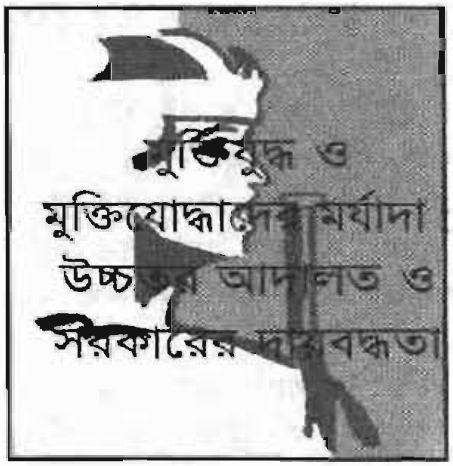

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত 'মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস' আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করে এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

উচ্চতর আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, 'একজন মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৩০০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ১০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদানকে 'ভাতা' না বলে 'ভিক্ষা' বলাই যুক্তিযুক্ত।' বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ প্রদত্ত এ রায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলা হয়, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে এতো স্বল্প পরিমাণ ভাতা প্রদান জাতি হিসেবে আমাদের মানসিক দেউলিয়াত্বই প্রমাণ করে, যা কোনো গৌরব বহন করে না।

রায়ে ২০০২ সালে ১৬৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তকে 'বেআইনী' ঘোষণা করে আগের সিদ্ধান্ত সঠিক সাব্যস্ত করে তা পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া হয়। (ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০৭)

উচ্চতর আদালতের এই রায়কে যুগান্তকারী বলছি এই কারণে যে, ইতোপূর্বে বহুবার আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী বৃদ্ধি এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছি, কিন্তু অতীতে কোনো সরকারই আমাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। বরং '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধী অধ্যুষিত খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের জামানায় আমরা দেখেছি মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাবিনাশী বহুমাত্রিক কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি দূরে থাক, সেই সময় বহু মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারদের বরাদ্দকৃত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার বহু ঘটনাও ঘটেছে, পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ভয়ঙ্কর বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং '৭১-এর চিহ্নিত ঘাতক, দালাল ও যুদ্ধাপরাধীরা ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তাদের গাড়িতে-বাড়িতে উড়িয়েছে। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি সনাক্তকরণ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের কমপ্লেক্স নির্মাণ, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরির কোটা প্রভৃতি চালু হয়েছিল—খালেদা-নিজামীরা যথারীতি সেসব বাতিল করে দিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাবিনাশী কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশাসনের তালেবানিকরণ, জঙ্গি মৌলবাদের রেকর্ড উৎপাদন, সংখ্যালঘু অমুসলিম নির্যাতন এবং রাজনীতির নামে ইসলামধর্ষণ আমরা খালেদা-নিজামীদের জামানায় প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছি।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের

অঙ্গীকার করেছেন, শিক্ষা উপদেষ্টা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের কথা বলেছেন, সেনাপ্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলেছেন—দুর্ভাগ্যের বিষয় ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এসব বিষয়ে কোন প্রাথমিক পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে এমন তথ্য আমাদের জানা নেই।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানকে আমাদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। তবে সরকারের সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান মূলত দেশের প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ায় এবং জামায়াতে ইসলামীর কোনো শীর্ষ নেতাকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার না করায় এই প্রশ্ন সরকার সমর্থকদের মনেও জেগেছে—তাবৎ দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী শুধু বিএনপি ও আওয়ামী লীগে, জামায়াতের সবাই ফেরেশতা, সরকার কেন এ ধরনের সংকেত পাঠাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে, এমনকি দেশের বাইরেও? জামায়াতের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিসম্পৃক্তি সম্পর্কে বহু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরও '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীর প্রতি সরকারের সদয় মনোভাব তাদের ইতিবাচক কার্যক্রমকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আমরা এখনও জানি না জামায়াত সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদয় মনোভাবের রহস্য কী। একই অভিযোগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ অভিযুক্ত হলেও হাসিনাকে দেশের বাইরে যেতে দেয়া হবে না, তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবেন না, তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা হবে অথচ মুজাহিদরা বগল বাজিয়ে দেশের বাইরে যাবেন, দেশের ভেতরে অবাধে ঘুরে বেড়াবেন, দাওয়াতের নামে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবেন—এর শানে নযুল সরকারের নীতিনির্ধারকরা ভাল বলতে পারবেন, তবে আমরা যারা ঘরপোড়া গরু তারা যারপরনাই উদ্বেগ বোধ করছি।

এ হেন সরকারের জামানায় উচ্চতর আদালত মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শন এবং পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের নির্দেশ প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী চৌদ্দ কোটি বাঙালিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আদালতের উক্ত রায়ে বলা হয়েছে—'মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জাতি হিসেবে আমাদের যে অনীহা ও অবহেলা, তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও নির্লিপ্ততাই দায়ী। কিন্তু জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব এই মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন।'

তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করার জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গত বারো বছর ধরে যে পাঠাগার আন্দোলন পরিচালনা করছে—শত বাধাবিপত্তি ও হামলা সত্ত্বেও পাঠাগারের গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোট সরকারের জামানায়ও অব্যাহত ছিল। বর্তমান সরকারের জরুরি অবস্থা সেই সব কার্যক্রম কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ কয়েকটি

জায়গায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মাসে দু মাসে এক আধটি আলোচনা সবার অনুমতি পাওয়া গেলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেছে। কখন কাকে কোন অজুহাতে গ্রেফতার করা হবে সেই ভয়ে মফস্বলের অধিকাংশ পাঠাগার বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও জামায়াতিদের দাওয়াতি কর্মসূচি এবং ফেরদৌস কোরেশীদের দল গঠনের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলছে।

আমরা কেউ চাই না বর্তমান সরকার এ দেশের ইতিহাসে জামায়াত তোষণকারী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও মানবাধিকারলংঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত হোক। আমরা এই সরকারকে প্রকৃত অর্থেই দলনিরপেক্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার হিসেবে দেখতে চাই। এ কারণে আমরা বর্তমান সরকারের নিকট দাবি করছি—

১. উচ্চতর আদালত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধির যে সুপারিশ করেছেন— অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ৩০০ টাকা থেকে অন্ততপক্ষে ৬০০০ টাকায় উন্নীত করা হোক। সম্মানীর এই অঙ্ক মোটেই অস্বাভাবিক মনে হবে না যদি আমরা প্রতিবেশী ভারতের দিকে তাকাই। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি মাসে তিন থেকে চার হাজার ভারতীয় টাকা (বাংলাদেশের টাকার বর্তমান মানের প্রায় দ্বিগুণ) দেয়া হয়। প্রবাসী মুক্তিসংগ্রামীদেরও মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা সম্মানী দেয়া হয়। এর সঙ্গে মাগ্‌গি ভাতা রয়েছে মূল সম্মানীর ২৪%। অর্থাৎ যাঁর মূল ভাতা মাসে চার হাজার টাকা তিনি এর সঙ্গে অতিরিক্ত পাবেন নয়শ ষাট টাকা, যা বাংলাদেশী টাকায় নয় হাজারেরও বেশি। মুক্তিযোদ্ধার অবিবাহিত তিন কন্যা (যদি থাকে) পাবেন জ্যেষ্ঠজন ছয়শ টাকা, কনিষ্ঠ দুই জন মাথা প্রতি সাড়ে তিনশ টাকা। মুক্তিযোদ্ধার বাবা-মা জীবিত থাকলে প্রত্যেকে পাবেন মাসে এক হাজার টাকা। মুক্তিযোদ্ধা মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রী আমৃত্যু পাবেন মাসে তিন হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রত্যেক মুক্তিসংগ্রামী একজন সঙ্গীসহ ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের 'ফ্রি পাস' পাবেন, সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা, অর্ধেক খরচে টেলিফোন (স্থাপনা বিনামূল্যে) এবং যাঁদের দেখার কেউ নেই তারা নির্দিষ্ট সরকারি বাড়িতে বিনাভাড়ায় থাকতে পারবেন। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের শতকরা ২ ভাগ ডিলারশিপ/পরিবেশনা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত। আন্দামানে যারা বন্দি ছিলেন প্রতিবছর সেখানে যাওয়ার জন্য তারা জাহাজ বা বিমানে বিনামূল্যে টিকেট পাবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত ভাতা দেয় মুক্তিসংগ্রামীদের। পশ্চিমবঙ্গে এই ভাতার পরিমাণ বর্তমানে মাসিক সাড়ে বারোশ' টাকা। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ভাতাপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংখ্যা ২২,৪৪৭ জন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাতাও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান মোটেও অযৌক্তিক হবে না। তারেক, বাবর, ফালু আর গিয়াস মামুনদের কাছ থেকে অবৈধভাবে উপার্জিত যে হাজার হাজার কোটি টাকা জব্দ করার

কথা শুনছি তার সামান্য অংশ নিয়ে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। সরকারের এই বিশেষ খাত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও পুনর্বাসনের অর্থ ব্যয় করা হলে জামায়াত এবং তাদের দোসর ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

২. হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবিলম্বে স্কুল ও মাদ্রাসাসহ বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখানে একটি কথা বলা দরকার। ইংরেজি স্কুলগুলোতে কিছু ইংরেজ তৈরি হচ্ছে। অভিভাবকরা দেশের সম্পদ খরচ করে বিদেশে বসবাসের জন্য কিছু নাগরিক তৈরি করছেন, যাদের দেশ সম্পর্কে ধারণা অপ্রতুল। জাতির জন্য তা শুভ নয়। একই সঙ্গে শুভ নয় মাদ্রাসায় মধ্যযুগীয় পাঠ্য বিষয়ে পাঠ দান। সেখানকার ছাত্ররা জামায়াত ও জেহাদ সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছু জানে কিন্তু নিশ্চিত যে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানে না। ফলে, স্বদেশপ্রেমে ছাত্রদের খানিকটা যে গোলযোগ থাকবে তা স্বাভাবিক। এ কারণে হাইকোর্টের রায়টিকে আমলে নেয়া আরও বেশি জরুরি বলে আমরা মনে করি। খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের আমলের মিথ্যা কদর্য ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে বিষয়েও সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

৩. সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জাতির জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের যে আশ্বাস দেশবাসীকে দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান সরকারের এবং এ কাজেও জামায়াত ও তাদের দোসর ছাড়া অন্য কেউ অখুশি হবে না। বরং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

৪. জঙ্গি মৌলবাদীদের গডফাদারদের বহাল তবিয়তে রেখে জঙ্গি নির্মূল অভিযান কখনও সফল হবে না। আমাদের দাবি—জঙ্গি মৌলবাদীদের গডফাদার জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং জিজ্ঞাসাবাদের বিবরণ জলিল-বাবরদের জবানবন্দির মতো পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক। একই সঙ্গে ইতোপূর্বে গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা জামায়াতের সঙ্গে এবং প্রশাসনের জামায়াত কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তি সম্পর্কে যা বলেছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক।

৫. যে সব ব্যাংক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও জঙ্গি মৌলবাদীদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেছে এবং এখনও করছে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

৬. জোট সরকারের আমলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের উপর নজিরবিহীন নির্যাতনের জন্য যারা দায়ী অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার ও বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যারা সংখ্যালঘুদের জমি, বসতবাটি ও

মন্দির দখল করেছে তাদের কাছ থেকে তা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দিতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যেসব মসজিদ জামায়াতিদের সহযোগী সংগঠনগুলো দখল করেছে সেগুলো অবিলম্বে দখল মুক্ত করতে হবে।

৭. প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে জামায়াত ও তাদের সহযোগীদের বিতাড়ন করতে হবে, অন্যথায় আগামী নির্বাচন কখনও শান্তিপূর্ণ অথবা নিরপেক্ষ হবে না।

আশার বিষয়, সরকার এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করেনি। এটি সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ এর আগে ২০০১ সালে বিচারপতি রাব্বানীর দেয়া ফতোয়া নিষিদ্ধকরণ এবং ২০০৫ সালে বিচারপতি খায়রুল হক প্রদত্ত ৫ম সংশোধনী সংক্রান্ত দুটি যুগান্তকারী রায় সরকারের আপিলের কারণে স্থগিত হয়ে যায়। সরকার এ বিষয়ে আপিল করলে বর্তমান রায়টি যে স্থগিত হবে সে সম্পর্কে আমরা প্রায় নিশ্চিত। সরকার এ বিষয়ে আপিল না করলে এটি প্রমাণিত হবে যে, তারা কারো প্রতি দুর্বল নয়। এখন সরকারি একটি বিজ্ঞাপন দেখি যার শিরোনাম 'এখনই সময়'। আমরা মনে করি হাইকোর্টের এ রায় কার্যকর করার এখনই সময়। এটি কার্যকর করা হলে জেনারেল মঈনকে মুক্তিযুদ্ধ প্রেমীরা যে দীর্ঘদিন মনে রাখবে তা বলাই বাহুল্য।

সরকার যদি জামায়াতের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল না হয়, তাদের যদি গোপন কোন এজেন্ডা না থাকে তাহলে এ সব দাবি পূরণ করা তাদের পক্ষে মোটেও কঠিন বা সময়সাপেক্ষ হবে না।

১১.৭.২০০৭

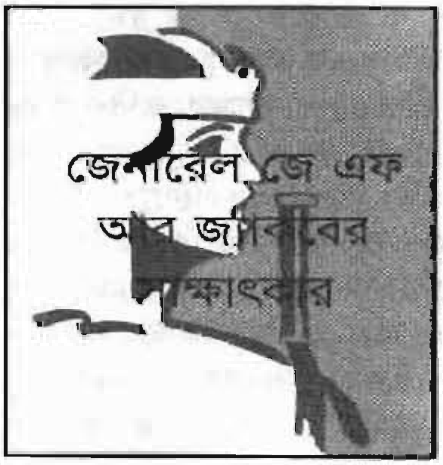

[আই সি সি আর-এর আমন্ত্রণে পৌঁছেছি দিল্লী। দু'দিনে দেখা করার কথা অনেকের সঙ্গে। আমার বিশেষ অনুরোধে কর্তৃপক্ষ লে. জেনারেল জ্যাকবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করেছিল। যৌথ বাহিনীর যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকে আর বেঁচে নেই, অনেকে অশক্ত। জেনারেল জ্যাকব এখনও কর্মচঞ্চল, থাকেন দিল্লীতে। সাক্ষাৎকারের কথা ছিল বিকেলে। অন্য কর্মসূচি শেষ করে, দিল্লীর ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে দু'ঘন্টা লেটে পৌঁছালাম এক বহুতল ভবনের সামনে। ইতোমধ্যে গাড়ি থেকে সেল ফোনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। লজ্জিত আমি যখন তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম তখন নিজেই বেজায় ক্লান্ত।

জেনারেল জ্যাকব এখন একা বসবাস করেন। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে নানা দেশের স্মৃতিচিহ্ন সাজানো। কিছুদিন আগেও তিনি গভর্ণর ছিলেন গোয়া এবং পাঞ্জাবের। এখন সম্পূর্ণ অবসর। ১৯৪১ সালে সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন। ১৯৭৮ সালে অবসর নিয়েছেন। তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবনে শ্রেষ্ঠ অধ্যায় হলো, বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করে বিজয়ী হতে সাহায্য করা। এ নিয়ে তিনি বই লিখেছেন। নাম 'বার্থ অব এ নেশন' (১৯৯৭)। এখনও দেখা হলে আবেগভরে একাত্তরের দিনগুলি স্মরণ করেন। অক্টোবরের ২৫ ও ২৬ তারিখে আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। একদিন ছিল নির্ধারিত, অন্যদিন অনির্ধারিত, নৈশভোজে স্মৃতিচারণ।

আলোচনাকালে জ্যাকব নতুন কিছু বলেননি যা তাঁর বইতে নেই। বইটি ইংরেজিতে প্রকাশিত তাই হয়ত অনেক বাঙালি পাঠকের নাগালের বাইরে। তবে, জ্যাকব এমন কিছু কথাও বলেছেন যা এখন আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। আমি কখনও কখনও তাঁকে প্রশ্ন করেছি, কখনও তিনি নিজেই অনেক কিছু বলেছেন। সেই সব মিলিয়ে এই সাক্ষাৎকার]

প্র: আপনিতো তখন পূর্বাঞ্চল কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ [অরোরা ছিলেন প্রধান]। সেই এপ্রিলে কি আপনার সঙ্গে বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?

উ: মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশের গণ্ডগোলের খবর পাচ্ছিলাম। তারপর তো লোকজন সীমানা পেরুতে শুরু করল। নেতারাও এলেন। সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। সরকারের কয়েকজন আমাকে একটা ড্রাফট ডিক্লারেশন করে দিতে বললেন। ড্রাফট করে তাজউদ্দীন আহমদকে দিলাম। তিনি কলকাতার কয়েকজন বিখ্যাত আইনজীবীকে দিলেন ভুলটুল আছে কী না দেখে দেয়ার জন্য। তারা দেখেটেখে পলিশ করে দিলেন। সেই ঘোষণাই পড়া হলো মুজিবনগরে। [এ দাবিটি বোধহয় ঠিক নয়। কারণ, আমিরুল ইসলাম তাঁর বইতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন, যেখানে জ্যাকবের কোনও উল্লেখ নেই। অন্যান্য বিবরণেও নেই। হয়ত জ্যাকব কিছু লিখে দিয়েছিলেন নিজ উৎসাহে যা কোনও গুরুত্ব পায় নি]

প্র: তারপর?
উ: এপ্রিলে আমি আমাদের গোয়েন্দা দফতরের কর্ণেল খার-কে বললাম, কলকাতায় পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতো যাদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি। খারকে বলেছিলাম, বাংলাদেশ সরকারে যেন তারা যোগ দেন সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতে। তারা রাজি হলো এ শর্তে যে, তাদের চাকরির শর্তাবলী, বেতন ভাতা ঠিক থাকলে তাদের আপত্তি নেই। আমি দেখা করলাম তাজউদ্দীন ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে। বিএসএফের রুস্তমজীও ছিলেন আমার সঙ্গে। তাজউদ্দীন রাজি হলেন, ১৮ এপ্রিল অনেকে যোগ দিলেন বাংলাদেশ সরকারে। কয়েকদিন পর এর পটভূমিকা জানার পর প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মানেকশ'কে প্রশংসা জানালেন। মানেকশ তো এর কিছুই জানতেন না। তিনি আমাকে ফোনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন এর ব্যাখ্যা করতে। অরোরাও রুষ্ট হয়েছিলেন। আমি তাঁদের জানালাম যে, ব্যাপারটি এতো সেনসিটিভ ছিল যে, সবাইকে জানানোর উপায় ছিল না।
প্র: এপ্রিলের দিকে সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
উ: এপ্রিলের গোড়ার দিকে মানেকশ আমাকে ফোন করলেন। জানালেন, সরকার চায়, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড যেন এখনই পূর্ব পাকিস্তানে মুভ করে। হয়ত তিনিই এ ধারণা দিয়েছিলেন সরকারকে, জানি না। আমি বললাম, এটা অবাস্তব। আমাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তখনও বাংলাদেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না।
মানেকশ আমাকে ফের জিজ্ঞেস করলেন, কবে নাগাদ আমরা তৈরি হতে পারব? আমি জানালাম, নবেম্বর পর্যন্ত সময় লাগবে। বোঝা গেল তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। ফোন রেখে দিলেন। পরদিন আবার ফোন করলেন। বললেন, দিল্লীর আমলারা আমাদের ঠিক কাপুরুষ বলছে না তবে যা বলছে তা এর সমার্থকই। সুতরাং, বিষয়টি ভাবা দরকার।
আমি ফের আমার অপারগতার কথা জানালাম। মহাবিরক্ত হলেন তিনি। কিন্তু, আমি বলতে বাধ্য যে, সরকারের একাংশের এ ধরনের ঝোঁক প্রতিরোধ করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। ব্যাপারটি ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝাতে পেরেছিলেন। আমার বইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। এপ্রিলের শেষে আমাদের অনুমতি দেয়া হলো বাঙালি যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য এবং সীমান্তের বিএসএফকে আমাদের অধীনে ন্যস্ত করা হলো।
প্র: তা হলে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে শুরু থেকেই আপনার একটা যোগাযোগ ছিল? বা কীভাবে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত রূপ পেল সে সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার?
উ: মুক্তিবাহিনী গঠনের উদ্যোগ আমিই নিয়েছিলাম। সে সময় সেনাবাহিনী, পুলিশ ছেড়ে এর সদস্যরা, যুবকরা আসছে। এদের জড়ো করে মুক্তিবাহিনী গড়ার উদ্যোগ নিলাম। মানেকশ, এদের তখন তখনই অপারেশনে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আমি চেয়েছিলাম, প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠাতে। মানেকশ বললেন, ঐ রকম ট্রেনিং দিতে গেলে একশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমি বললাম, কমপক্ষে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দরকার। মানেকশ বললেন, তিন সপ্তাহই যথেষ্ট। যা হোক এ ব্যাপারে আমি বাংলাদেশ

সরকারের সঙ্গে আলাপ করলাম। ওসমানীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। ওসমানী সাধাসিধে মানুষ কিন্তু আর্মির রীতিনীতি মানতে পছন্দ করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, পাকিস্তানি মডেলে সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। মুক্তিবাহিনীর ব্যাপারে তাঁর তেমন একটা উৎসাহ ছিল না। অবশ্য, এ ব্যাপারে অরাজী কেউ-ই ছিলেন না। আমি মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। তবে, আমি এ. আর. খন্দকারের কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। তিনি ছিলেন চৌকশ ও বাস্তববাদী অফিসার। যে কোনও সমস্যা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

প্র: আপনার বইতে যুদ্ধ ও এর কলাকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আছে, আমি সে বিষয়ে যাব না। আপনি পাঠকদের জন্য সংক্ষেপে যুদ্ধের সার কথাটি বলবেন কী?

উ: আগেই মানেকশ, ডিরেক্টর মিলিটারি ইনটিলিজেন্স মে. জেনারেল কে সিং-কে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে এলেন অভিযানের খসড়া করতে। বৈঠকে তাঁরা দুই জন ছাড়া উপস্থিত ছিলাম আমি আর অরোরা। ডিএমও-এর মূল কথা ছিল- খুলনা ও চট্টগ্রাম দখল করা। পরিকল্পনাটি মানেকশ'রই ছিল। আমি বললাম, তাতে লাভ নেই। ঢাকা আক্রমণ করাই শ্রেয়। ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড। সেটি দখল করলে বাকি সব অসার হয়ে যাবে। অরোরাও মানেকশ'র পরিকল্পনায় সায় দিচ্ছিলেন। মানেকশ আমাকে থামিয়ে বললেন, তুমি কি বুঝতে পারছ না, খুলনা আর চাটগাঁ দখল করলে, ঢাকা এমনিতেই পড়ে যাবে। বললাম, না, আমি সে তত্ত্ব মানতে রাজি নই। মানেকশ আর ডিএমও জানালেন, ঢাকা অগ্রাধিকার পাবে না এবং তার জন্য কোনও বাড়তি ট্রুপসও দেয়া যাবে না। তারপর অরোরার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী অরোরা আমি ঠিক বলিনি! অরোরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক ঠিক। মিটিং শেষ।

প্র: তারপর?

উ: নভেম্বর থেকেই সীমান্ত সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল যা এক ধরনের যুদ্ধ বলা যায়। এর মধ্যে আমরা প্রস্তুত হলাম। ৩ ডিসেম্বর মানেকশ আমাকে ফোন করে বললেন, পশ্চিমে পাকিস্তানীরা বোমা ফেলছে। আমি যেন কলকাতায় অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাপারটি জানাই। আমি অরোরাকে মানেকশ'র বার্তা পৌঁছে দিয়ে বললাম, কাজটা তাঁকেই প্রটোকল অনুযায়ী করতে হবে।

যুদ্ধ শুরু হলো। খবর পেলাম, ১৩ ডিসেম্বরের পর রাশিয়া নিরাপত্তা কাউন্সিলে আর কোনও ভিটো দেবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ বিরতি তখন কার্যকর হতে হবে। এর আগে, ঢাকা দখল না হলে উপায় নেই। মানেকশ ১০ ডিসেম্বর আমাকে জানালেন, শহরগুলি সব দখল করতে, ঢাকার কোনো উল্লেখই তিনি করলেন না। ইতোমধ্যে আমাদের সেনারাতো অনেক শহর পাশ কাটিয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে। আমরা শুধু কুমিল্লা আর যশোর দখল করেছিলাম। আবার পিছে ফিরে শুরু করা সম্ভব ছিল না। মানেকশ তাঁর অর্ডার সব ট্রুপস কমান্ডারকেও পাঠিয়েছিলেন। আমি তাদের জানালাম, সদর দফতরের নির্দেশে কান দেয়ার দরকার নেই। এটি বিতরণ করা হয়েছে তাদের অবহিত করার জন্য। কমান্ড হেডকোয়ার্টার যা পাঠাবে তাই যথেষ্ট। অরোরা বিষয়টি জেনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন।

আমি সিগন্যালকে বললাম, নিয়াজিকে ধরতে। অনেক চেষ্টার পর তাকে ধরা গেল। আমরা একই সঙ্গে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, পরস্পরের যথেষ্ট পরিচিত। তাকে জানালাম, ঢাকার বাইরের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। তারা যদি আত্মসমর্পণ করে তা'হলে সম্মানের সঙ্গে তাদের গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে আত্মসমর্পণের কথা বারবার রেডিওতে প্রচার করা হচ্ছিল। আমি আত্মসমর্পণের একটি খসড়াও তৈরি করছিলাম। নিয়াজি জানালেন, ঢাকায় এলে তার সঙ্গে যেন লাঞ্চ করি।

এদিকে গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেলাম, ১৪ তারিখে ঢাকায় গভর্ণমেন্ট হাউসে বৈঠক হবে। নির্দেশ দিলাম, সেখানে বোমা ফেলতে। গভর্ণমেন্ট হাউসে বোমার পর তাদের আর মানসিক স্থিরতা রইল না। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পদত্যাগ করল।

১৬ তারিখে ভোরে মানেকশ ফোন করে বললেন, ঢাকা যেতে হবে আত্মসমর্পণের আয়োজন করতে। আমি আত্মসমর্পণের খসড়া পাঠিয়েছিলাম যার জন্য অনুমোদনের দরকার ছিল। জানালাম বিষয়টি তাকে। তিনি বললেন, তুমি জান কী করতে হবে। বললাম, নিয়াজিতো আমাকে লাঞ্চেরও দাওয়াত দিয়েছে। কী করব? মানেকশ বললেন, আমাকে জানাবেন। ঢাকা রওয়ান হলাম টাইপ করা সেই খসড়া নিয়ে।

যশোর হেলিপ্যাডে নেমে শুনলাম, নিয়াজির সঙ্গে আমার লাঞ্চ খাওয়া অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু আত্মসমর্পণের দলিলের ব্যাপারে কোনও খবর নেই। ইতোমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম ওসমানী ও খন্দকারকে আনতে।

প্র: আপনারা নাকি ওসমানীকে ইচ্ছে করেই নেন নি?

উ: এটি মিথ্যা প্রচারণা। ওসমানী তখন সিলেটে। পরে জেনেছিলাম তার হেলিকপ্টারে গুলি লেগেছিল। উই ডিড নট কিপ হিম আউট। তিনি সিলেটে থাকতে চেয়েছিলেন। হি লাভ্‌ড টু বি দেয়ার।

প্র: তারপর?

উ: ঢাকা পৌঁছলাম। নিয়াজীর দফতরে যাওয়ার পথে মুক্তিবাহিনী পথ আটকালো। চোখেমুখে হেস্তনেস্ত করার প্রতিজ্ঞা। তারা হয়ত ভেবেছিল সঙ্গে নিয়াজী আছে। তারা জানালো, নিয়াজীর দফতরে হামলা চালাবে। বোঝালাম, যুদ্ধ শেষ, এসব কিছু করা যাবে না। রেসকোর্সে সারেন্ডার হবে।

জেনারেল নিয়াজীর দফতরে অনেকে ছিল। লাঞ্চের আয়োজনও করেছিল জাঁকালোভাবে। এত বড় একটা কাণ্ড হচ্ছে তার কোনো ছাপ নেই সেই ব্যবস্থায়। খাওয়ার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। যতটুকু না খেলে নয় তাই খেলাম এক কোণে দাঁড়িয়ে। নাগরাকে পাঠালাম, সব বন্দোবস্ত করতে। তারপর নিয়াজীকে দিলাম টাইপ করা আত্মসমর্পণের দলিল। নিয়াজী তা পড়ে কোনও কথা না বলে আরেকজনকে দিল পড়তে। মেজর জেনারেল ফরমান দলিলটি পড়ে বলল, যৌথবাহিনীর কাছে বা জয়েন্ট কমান্ডের অধীনে আত্মসমর্পণ করবে না। আমি বললাম, একটা কথাও বদলান যাবে না। এসব আলাপ যখন চলছিল তখন নিয়াজীর চোখে দেখি পানি। তাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলাম, সব ঠিক আছে? তিনবারই সে কোনও কথা বলল না। তখন বললাম, আই টেক ইট অ্যাকসেপটেড।

নিয়াজী জানতেন না, কোথায় আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। যখন জানলেন, তখন বললেন, সেখানে যাবেন না। অফিসে আত্মসমর্পণ করবেন। আমি রাজি হলাম না। আমি চাচ্ছিলাম বাঙালিরা প্রকাশ্যে এদের আত্মসমর্পণ দেখুক। এদিকে অরোরা আসবেন। তাই এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হলাম নিয়াজীকে নিয়ে। পথে আবার মুক্তিবাহিনী ঘিরে ধরল। অনেক কষ্টে পথ করলাম। এয়ারপোর্টে পৌছলাম। তখন দেখলাম, রানওয়ের ওপাশে একটি গাড়ি। সেখান থেকে একজন নেমে আমাদের দিকে আসতে লাগল। কাছে এলে দেখলাম, মেজর জেনারেলের র‍্যাংক পরা কাদের সিদ্দিকী। অনুমান করলাম, ঝামেলা হবে। সিদ্দিকীকে অনুরোধ জানালাম, ঐ এলাকা ত্যাগ করতে। সে রাজি নয়। পরে আদেশের সুরে বললাম, চলে যেতে হবে। সিদ্দিকী রিলাকটেন্টলি জায়গা ত্যাগ করল। সিদ্দিকীর সঙ্গে কথা ছিল, টাঙ্গাইলে তার লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে যাতে পাকিস্তানীদের ইন্টারাপ্ট করতে পারি। তাকে সেখানে পাওয়া যায় নি। আর তখন সেখানে রহস্যময়ভাবে উপস্থিত। কয়েকদিন পর সে সাংবাদিক ডেকে তাদের সামনে কয়েকজনকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করেছিল।

প্র: যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ: ঢাকায় যেসব হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার জন্য ফরমান আলী দায়ী। সাংবাদিক ব্লেয়ার হোলিং অর্থ-এর সঙ্গে ঢাকায় এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। তাঁকেও বলেছিলাম, ফরমান এর জন্য দায়ী। ব্লেয়ার বলল, না, ফরমান অনেককে ছেড়ে দিয়েছে। আমি বললাম, যে বলা মাত্র ছেড়ে দিতে পারে সে খুনও করতে পারে।

প্র: ঠিক আছে, আবার আত্মসমর্পণ পর্বে ফিরে যাই।

উ: অরোরা এলেন, আমি আর নিয়াজী তাকে অভ্যর্থনা জানালাম। তারপর রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তানীরা। বাঙালিদের জন্য আবেগে আমার মন উথলে উঠছিল। নয় মাস কী অবর্ণনীয় অত্যাচার তারা সয়েছে। তাই চেয়েছিলাম, নিয়াজী ও পাকিস্তানী বাহিনীর হিউমিনিশন তারা দেখুক। এবং আত্মসমর্পণ পর্ব দেখতে দেখতে মনে হলো, এবার ন্যায্য বিচার হয়েছে।

প্র: যুদ্ধের কুশীলবদের সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করবেন?

উ: নিয়াজী ইজ টু ব্যাড। সে যুদ্ধ ও এর কলাকৌশল কিছুই বুঝত না। তাজউদ্দীন ছিলেন খুব আপরাইট ম্যান। আর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা না বললে যা অপূর্ণ থেকে যাবে। যুদ্ধের সব কৃতিত্ব তাদের। তারা এ যুদ্ধে মেজর রোল প্লে করেছিল। পাকবাহিনীর মরাল তারা ভেঙ্গে দিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী ছাড়া জয় সম্ভব ছিল না।

২০০৬